জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষ-কে

এই লেখকের :

চর কাশেম

দক্ষিণের বিল (১ম খণ্ড)

পদ্মদিঘীর বেদেনী

জোটের মহল

একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী (যন্ত্রস্থ)

দক্ষিণের বিল (২য় খণ্ড) ,,

শুধু একটুখানি নুন ,,

বে-আইনী জনতা ,,



ভাঙছে—শুধু ভাঙছে।

ভেঙে উজাড় হয়ে যাচ্ছে হাট, বাট, গঞ্জ, সহর, গ্রাম। পদ্মা কিম্বা মেঘনার ভাঙন নয়--পাহাড়ী ঢলক কখনও নেমে আসেনি এদেশে, দেখা যায় নি কখনও অগ্নিগিরির প্রলয়ংকর গলিত লাভাস্রোত, দুর্দান্ত তুষার ঝঞ্ঝাও নয় হিমালয়ের তবু বাঙলা ভাঙছে।

টলমল করছে নাকি সমগ্র পাঞ্জাবও।

মাটিতে ফাটল ধরেনি, চিড় খায়নি কোন খাড়ি নদীর পার, জগৎ জোড়া ভূমিকম্প নয়, খণ্ড প্রলয় নয় বিহারের, তবু ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে ···

ভাঙছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এক প্রাচীন সভ্যতা, হিন্দু মুসলিম মিলিত সংস্কৃতিব ঐতিহ্য-- মিলন-গ্রন্থি শিথিল হচ্ছে মন্দির ও মসজিদের।

এসেছে অবিস্মরণীয় ইংরেজের রোয়েদাদ্—ইস্পাতের করাতের শানিত বক্র দাঁতের মত। ছড়াচ্ছে অদ্ভুত দ্যুতি।

নেতারা স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর-- জনসাধারণ বলিব ছাগের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

কি আশ্চর্য, বিনা রক্তপাতে নাকি ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আসছে!

তবু কেন জানি পূর্ব বাঙলার হিন্দু কারবারীরা কারবার গুটাচ্ছে, তল্পি তলপা বাঁধছে দোকানী। অল্প-স্বল্প জমি জমার মালিক যারা তারা দর যাচাই করছে; কেউ কেউ বা ইতি মধ্যেই বেচে ফেলে দিয়েছে চৌদ্দপুরুষের ভিটা

মাটি। ছু একজন বসত ঘরের টিন খুলেছে। এক আধ জন অতি সাবধানী চাকুরেবাবু দেশে এসে পাইকারী ভাবে বেচে সাবাড় করেছে ফলন্ত গাছ-গাছালি। অনেকদিন ধরেই তারা গ্রাম ছাড়া। এখন ভাবছে : পোড়া ঘরের ছাই, কুড়িয়ে কাচিয়ে যা পাই !।

পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপার টনক নড়েছে- বিদায় বন্ধ হতে চলেছে ভাট-ব্রাহ্মণ, গণকের। সমাজের আর্থিক কাঠামো যদি ভেঙে পড়ে, কেমন করে বাঁচবে নানা শ্রেণীর জনসাধারণ। বৈরাগী আর গেরুয়াবাস নাকি পরতে পারবে না, কেউ শুনবে না মায়ের আগমনী। মানভঞ্জন, নৌকা-বিলাস, অক্রুর সংবাদ বন্ধ হবে চিরদিনের মত। নবমীর নিশি পোহালে উমা আমার যাবে চলে—খঞ্জরী বাজিয়ে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, এ গান আর নাকি গাইতে পারবে না কোন বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। দোলখোলার মঞ্চ বাগান পথ আর রাঙা হবে না হোলির আবীরে। কোন গ্রাম্য বধূ আর অতর্কিতে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না রঙের পিচকারী নিয়ে অপরিচিত পথিককে। মানুষ নেই, হিন্দু পাড়া জনশূন্য, কে খেলবে হোলি ? শোনা তো যাবে না আর কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনি। সহস্র বছরের সাজান সমাজ চূর্ণ হবে এক আঘাতেই।

ভাঙছে, আরও ভাঙবে স্তরে স্তরে······

ইস্কুল ভাঙবে, কলেজ ভাঙবে—লুপ্ত হবে ছোট বড় পাঠশালা। বিদ্যামন্দির গুলো খাঁ খাঁ করবে, যেমন ছুপুর বেলা পড়ে থাকে গৃহস্থের গোশালা।

প্রথম ভাঙন লেগেছে ব্যবসায়ী ও সহুরে বর্দ্ধিষ্ণুদের মনে, তাই সব ছোট বড় ব্যাংক কাঁপছে। চেকের চাপে কেরানী ও ক্যাশিয়ার অতিষ্ঠ। মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে ম্যানেজার। হঠাৎ লেন-দেন বন্ধ করে দিল উঁচু দরের নাম করা এক ব্যাংক। শীগগিরই লাল বাতি জ্বালাবে চুনো পুঁটিগুলো।

গেল, গেল, সব গেল······

তেজারতি, লগ্নী, লহনার, কারবার বন্ধ হলো। নিভে এলো গঞ্জে গঞ্জে সাহা ও সোনাপট্টির রোসনাই। এবার নাকি কালীপূজার মেলায় জারী, কবির পাল্লা, নট্ট কোম্পানির যাত্রা গান বন্ধ—কোন বায়না পায় নি সৌদামিনীর সখের ঢপের দল। অধিকারী চন্দ্রভূঁইমালী ভাবছে : এবার কি করে চলবে শুকনার কটা মাস।

উকিল, মোক্তার, ডাক্তারেরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তা করছে—মুখ শুখিয়ে

গেছে গয়লা মুদির। চোখ কপালে তুলে ভাবছে প্রফেসর, ইস্কুল মাষ্টার, জজ, ব্যারিষ্টার, এ হলো কি ?

বড় বড় কাগজ ও নেতার কারসাজি এবং গলাবাজিতে ভোট দিয়েছে যারা তারাই এখন আত্মহারা—এ তারা করেছে কি ? নিজের পায়ে নিজেই মেরেছে কুড়াল ! এখন হাল গরু জমি জায়গা,—কারুর কারুর যে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়েই টান !

কেটেছে কাটুক কান,

দিয়েছে দিক না নুন,

এক গালে কালি এবং অন্য গালে কেউ যদি ঠাট্টা করে দিয়েই থাকে মাখিয়ে চুণ—তা তারা মুছবে না, যাবে পশ্চিম বাঙলায়।

তারা স্বাধীন হবে—তারা সুবিধাবাদী এক শ্রেণীর মানুষ।

দরিদ্র পাড়া প্রতিবেশী, ঐ গাঁয়ে যারা পড়ে রইল গরীব আত্মীয় বন্ধু, প্রজা পাইক, এমন কি মাসী পিসী, তাদের জন্য ওরা ভাবে না—তাদের মান ইজ্জৎ ঈশ্বর রাখবে। এক শ ঘর সংখ্যা-গরিষ্ঠের ভিতর তিন ঘর সংখ্যা লঘিষ্ঠ সংঘবদ্ধ হয়ে থাকলেই সব কিছু টিকবে ! এতদিন কি শেখাল কংগ্রেস ?

হিন্দু মহাসভাই বা বলছে কি ?

সংঘশক্তি কলৌ যুগে······

কিন্তু সেই সংঘের আফিসগুলোরই অস্তিত্ব লোপ হ'ল সবার আগে—হয়ত ভাড়া বকেয়া পড়ে, নয়ত মোড়লদের উদাসীনতায়।

পনরই আগষ্ট স্মরণীয় দিন—বরণীয় বাঙালী, পাঞ্জাবী, তথা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে।

কিন্তু পূর্ব বাঙালার মানুষগুলো ভিটামাটি জোত জমি ছেড়ে সীমা লংঘন করছে। জাহাজে বোঝাই হয়ে চলেছে যেন বেবুনের দল।

কেন ?

ওপারের মুরুব্বিরা বলছে, 'আরে থামো থামো—স্বাধীন জাতি পলায় নাকি ?'

এপারের ব্যবসায়ী ও বর্দ্ধিষ্ণুরা জবাব দেয়, 'আর শুনব না তোমাদের ফাঁকি। বাকি রয়েছে স্ত্রী কন্যা, তাও টেনে নিয়ে যাবে জুলুমবাজ গুণ্ডা-ষণ্ডারা।'

চালাক যারা তারা বলে, 'আমরা ফিরে যেতে পারি দেশে, যদি তোমরা তরুণী স্ত্রী ও যুবতী মেয়ে নিয়ে এসে, মিলে মিশে এপারে থাকতে পার। নইলে পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো—এই প্রাচীন সহর কলকাতা একলার নয় কারো।'

কথাটা ঠিক। মুরুব্বিরা মাথা নাড়ায়—মাঝে মাঝে গোঁফে চাড়া দেয়।

ওদের একটা পুনর্বসতি করাতে হয়—নইলে অপযশ। ফেটে পড়বে গুরুতর এক অসন্তোষ। একগুঁয়ে মানুষ ওরা ছাড়বে না।

চাহিদা অনুযায়ী এবার সৃষ্টি হলো রিলিফ ক্যাম্পের, যাকে শয়তানেরা বলে বেবুন ব্যারাক। এককালে সেখানে ছিলও নাকি বৃটিশ মিলিটারী বাঁদরগুলোর বাসা।

খাসা দেখাচ্ছে বন্ধুত্বের নিদর্শন!

সহরের মাঝে মাঝে রাজা মহারাজার তেমহলা চৌমহলা জনশূন্য বিলাস ব্যসনের জন্য সব বাড়ী—আর তার পাশেই একটু দূরে টুটা-ফুটা হাল পাইখানার সমূহ অব্যবস্থা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিলিফ ক্যাম্পের সারি।

এর চাইতে এত তাড়াতাড়ি কি-ই-বা ব্যবস্থা করা চলে!

শিশু রাষ্ট্র, কালো কারবারীদের শুভলগ্ন—সাবধান, কেউ অকল্যাণ ডেকে আনে না যেন চোখের জলে।

এই ভারতের হিন্দু মুসলিম বিভ্রান্ত হয়েছে বহু পুণ্যের ফলে!

(এক)

পূর্ব বাঙলার সহরগুলো ভাঙতে ভাঙতেই, ভাঙন সুরু হল গ্রামে। ছড়িয়ে পড়ল মারাত্মক রোগের বীজাণুর মত বিভীষিকা।

যারা জমিদার তালুকদার কিম্বা মোটা বেতনের চাকুরে তারা এদেশে এসে, বলল—জাতি ধর্ম্ম আর কিছুই থাকবে না পাকিস্তানে। চাকরী-বাকরীও কেউ পাবে না হিন্দু হলে। পড়া-শুনা তো রসাতলে যেতে বসেছে ছেলে পুলের এ কবছর ধরে। পাঠ্য পুস্তক অপাঠ্য হয়ে উঠেছে পাঠশালার। এবার ছাড়তে হলো বহু পুরুষের বাসস্থান।

কুসুমপুর গ্রামখানা তখনও ভাঙেনি—সবে মাত্র ভাঙনের মুখে এসে ঝুঁকে পড়েছে।

মুখে যে যা বলুক, মনে মনে যে যা-ই চিন্তা করুক জন্মভূমি কি সহজে ছাড়া যায়! এই নদী, নালা, খাল, বিল, পৈতৃক ভদ্রাসনের আম, জাম, নারকেল, সুপারি গাছ শিকড়ে-বাকড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, মমতায় মেদুর হয়ে ওঠে মন।

'মাধব তুমি ন্যায়ের পণ্ডিত, বলই না, অন্য দেশে ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে কি এই পূর্ব বাঙলার লোক বাঁচবে? সকলের কথা বলছিনে, এই তোমার আমার কথা, যারা প্রাচীন হয়েছি এই জল বায়ুতে। মুসলমান রাজত্বে কি হিন্দু পণ্ডিত গ্রামে বাস করে নি?'

'করবে না কেন? মাঝে মাঝে নির্যাতন সয়েছে। কাউকে হয়ত জোর করে গোমাংসও খাওয়ান হয়েছে। আবার—'

'চুপ কর, শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু।'

'দাদা চুপ না হয় আমি করলাম—কিন্তু আমাকে আপনাকে যারা সম্মান করে না তারা বাগে পেলে একটুও চুপ করে থাকবে না। দেখলেন না ইংরাজ থাকতে থাকতেই ঐ নদীর ওপার রামগঞ্জ থানায় হল কি?'

'কিন্তু গ্রামের মুসলমানরা তো দাংগা প্রিয় নয়, অন্তত আমাদের আস-পাশে যারা আছে, যারা রোজ আসে যায়—যাদের সংগে নখে মাংসে সম্পর্ক।'

'আপনি জনসাধারণের কথা বলছেন? জনসাধারণ চিরদিনই শান্তিকামী। চায় সুখে দুঃখে সমব্যথী হয়ে আমাদের সংগে দিন কাটাতে। কিন্তু জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যে বিজ্ঞ ক'জন অসাধারণ রাজশক্তি অধিকার করে বসেছে, তারা চায় না যে হিন্দুর বিদ্যা বুদ্ধি মস্তিষ্ক এদেশে থাক, তাহলে আজ আর পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল কি?'

'তোমার কথা ঠিক নয়, তবু তুমি কি করতে বলো?'

'আপনার ঘরে যুবতী মেয়ে, যুবতী পুত্রবধূ—আপনার উচিত নয় কাব্য চর্চা করা।'

'কি বলছ মাধব?' একটু বিরক্ত ও রুষ্ট হয়ে উঠেন শশিশেখর। 'একি কাব্য চর্চা?'

'বলছি আপনি কাব্যের পণ্ডিত হলেও এখন বিশ্বপ্রেমের আলোচনা বন্ধ রাখুন—আগে হিন্দু রাজত্বে চলুন।'

শশিশেখরের মনে পড়ে জীবনের দুটি ঘটনা।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে একবার বন্যা এলো চতুর্দিক জুড়ে। বৃষ্টির ঝাপটা, বাতাসের মাতলামি কিছুতেই থামে না। লম্বা লম্বা সুপারির গাছ ভাঙছে গণ্ডায় গণ্ডায়, দু একটা নারকেল গাছেরও মাথা মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন কোন দানবে। সপ্তাহ যায় তবু লক্ষণ নেই ঝড় থামার। মেঘের সেকি

গোঙানি, বিদ্যুতের সেকি ঝিলিক! মাঝে মাঝে চৌচির হয়ে যাচ্ছে আকাশটা।

ছনের ছোট দো-চালা ঘর, কাঁচা মাটির ভিত্তি। জোয়ারের জল উঠান ছাপিয়ে এল পোতার গোড়ায়—বৃষ্টি এবং বাতাস তো হামলা দিচ্ছে একটানা। জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন উপায় ?'

শশিশেখর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, 'কিসের ?'

লজ্জায় জাহ্নবী তখন আর কিছু বলতে পারলেন না। নিজের জীবনের চাইতেও যে তাকে অধীর করেছে আর এক অব্যক্ত ব্যথায়। জাহ্নবী আসন্ন-প্রসবা।

এমন সময় একটা সুপারি গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ঘরের পূব দিকের ছাউনির ওপর।

কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচলেন স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু পেটের সন্তান বাঁচবে কি করে ? ঘর বার যে একাকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শশিশেখর বুঝলেন গৃহের চাইতেও গৃহিণীর সমস্যা বৃহত্তর। জল কাদায় ঘরের মেঝে একশা হল। বাড়ীর ওপর কোন গৃহস্থ নেই। যে দু' ঘর ছিল তারা সুবিধা মত অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

শশিশেখর উঠানে নামলেন।

দেখা হ'ল মোস্তাজের সংগে। মোস্তাজ কেরায়া বেয়ে, ডিঙি নিয়ে বাড়ী ফিরছে। ছোট খাল দিয়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে বাড়ীয়ালোর (বাগান সমেত বাড়ীর) পথ ধরে। হাটু সমান জল হয়েছে পায় চলা গ্রাম্য পথে। স্থানে স্থানে কিছু বেশীও হয়েছে। দু' এক বাড়ীর উঠান একেবারে মিশে গেছে মাঠের সংগে। উঁচু নীচুর ব্যবধান নেই এতটুকু—মনে হয় যেন সমুদ্র। তবু ভয় নেই মোস্তাজের। সে জানে যে এ জল কমে যাবে ভাটা এলে, এবং পুবের হাওয়া একটু ঠাণ্ডা হলেই।

কিন্তু কবে ঠাণ্ডা হবে এ দুরন্ত বায়ু ? সাত সাতটা দিন তো গত হতে চলেছে।

'ঠাকুর গোঁসাই দেখেন কি, নিতান্ত অরাজক। ওকি, আপানার দেখি ঘরখান ভাঙছে !' নিকটে এসে নাও ভিড়াল মোস্তাজ। সে মুহূর্তে সব পর্যবেক্ষণ করে নিল।

মোস্তাজ রকমানেরই এক চাচা, গরীব মানুষ—সম্বল ঐ নাওখানাই। সে নিজের বাড়ীর কথা না ভেবে এগিয়ে দিল নায়ের গলুই।

শশিশেখর তার স্ত্রীকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন। দাই পাওয়া গেল না। রাত্রে ঐ নৌকায়ই ভূমিষ্ঠ হল অবনীশেখর।

সারা রাত ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজল রকমানের চাচা। এগিয়ে-জুগিয়ে দিল টুকি-টাকি জিনিষ ঘর থেকে এনে। জড়িয়ে পড়ল মহাদায়িত্বে।

ভোর বেলা একটু জল ঝড় কমল। মোস্তাজ নাও ছেড়ে জলে নামল। চেয়ে নিল চালের ছোট ডালাটা। তারপর জল ভেঙে বাড়ীর দিকে চলল।

'দেখি মাঠাইন মুখখান ?'

জাহ্নবী সলজ্জ হাসি হেসে শিশুর মুখের আচ্ছাদন একটু সরালেন। অমনি মহাতৃপ্তিতে হেসে উঠল মোস্তাজ।

'দোস্ত আইছ বড় অকালে এখন সকাল সকাল চাংগা হইয়া ওঠো, বুক জুড়াও মায়ের। বাইচা থাক হাজার বচ্ছর।'

শশিশেখরের প্রায় পনর দিন কাটাল নৌকার ঘরে। কিন্তু একটি পয়সা দাবী করল না মোস্তাজ। বরঞ্চ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত পয়সার কথা তুললে।

আর একবার ঘরে লাগল আগুন। এবার শশিশেখরের নয়—প্রতিবেশী দীনদরিদ্র নবীন ধোপার। ছুটে এল চারপাশের মুসলমান গৃহস্থরা। শুধু আগুন নিবিয়েই তারা ক্ষান্ত হল না, পরদিন সবাই মিলে তাকে এমন একখানা ঘর তুলে দিল, যা নবীনের কল্পনার অতীত। বাড়ীর ওপরের বুঁচির মা তা দেখে হিংসায় জ্বলে যেত। সে উঠান ঝাড় দিত আর সপাংসপ ঝাঁটার বাড়ি মারত—জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'পোড়া কপাইলা বিধাতারে জিগাই—বলি, আমার ঘরখানা কি সে চৌক্ষে দেখে নাই ? ভাগ্যমন্ত নবীন্যার উপরই যত কোপ !'

এদের তো কোন শিক্ষা দীক্ষা ছিল না। কিন্তু কোন ঐতিহ্যের বলে এরা এমন মহাপ্রাণ পেয়েছিল ! অধিকারী হয়েছিল অতুল ঐশ্বর্যের ! এরা তো সবাই এখনও মরেনি। শশিশেখর ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে যান।

কত স্বপ্ন, কত আশা, কত নিবিড় ভালবাসা জড়ান এই বাড়ী ঘর। এর উঠানে, ঘাটে, শস্য-ফলন্ত এক একখানি ভদ্রাসন সংলগ্ন মাঠে মহাকাব্যের যে পদ-লালিত্য ছড়িয়ে আছে। ঝংকার গুঞ্জন উঠছে চারদিক ব্যেপে। প্রত্যেক গৃহস্থই এক একজন কবি। যার যেমন প্রতিভা সে তেমনি করে তার বাড়ী ঘর সাজায়। একদিনে কি এক মুহূর্তে সে তা পারে না। জীবনের সুদীর্ঘ সময় বসে ধীরে ধীরে সে এক একটি করে চারা রোপন করে, বীজ বপন

করে—ধীরে ধীরে তোলে একখানির পর একখানি ঘর। পুকুর কাটে, অবস্থায় সংকুলন হলে ঘাটলা বাঁধে, ইমারৎ গড়ে, পঞ্চরত্ন তোলে পিতামাতার শ্মশানে। সংগে সংগে আবার খরিদ করে ধানি জমি। দলিল লেখে শক্ত করে। ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য কত মায়া! এ তো শুধু বাড়ী ঘর নয়—এ যে এক কবিতা। আদিম মনের মহাকাব্য—মর্মে এর দুরাশার ইংগিত। সংগীতের মত কানে বাজে বৃদ্ধ পণ্ডিতের।

'দেখ ওপারের মুসলমানরা এবারও এসে ঠিকঠাক মত ধান দিয়ে গেছে, নিয়ম মত পান তামাক চিঁড়া মুড়ি খেয়ে গেছে, বলে গেছে—পণ্ডিত মশাই, যতদিন আমরা আছি ততদিন বাপ বেটার মতই চলব, তারপর যা হয় তা হবে। জমি আমার সামান্য তার জন্য বিশেষ ভাবিনে—ভাবি এদের ছেড়ে কি করে অন্যত্র গিয়ে থাকব? বড় মায়া মাধব, বড় মায়া।'

এমনি সময় এলো নকুল পণ্ডিত। হাতে তার একখানা খবরের কাগজ। তিন চার দিনের পুরান। কারণ নিত্য নতুন কাগজ এখানে আসে না। পোষ্টাফিস পনর মাইল দূর।

'বড় মায়া, না শশিদাদা? কিন্তু ওদের, ঐ জনসাধারণের ছায়ায় দাঁড়িয়ে যারা আলপিন চালাচ্ছে, তারাও তো ছিল কংগ্রেসে। সেখানে স্থবিধা করতে না পেরে—ধুয়ো তুলেছিল পাকিস্তানের।'

'কিসের স্থবিধা মাধব?'

'এই শোষণ এবং শাসনের। শুনেছি কাকের মাংস কাকে খায় না, কিন্তু মানুষে তা ছাড়ে না। জাত ভাইদের রক্তমাংসেই তারা পুষ্ট। প্রতিযোগিতায় যদি কংগ্রেসীদের সংগে এঁটে উঠতেই পারত তবে ওরা আর আলাদা একটা মুসলিম রাষ্ট্র চাইত না। সব শেয়ালের এক রা।'

'তবে ইংরেজেরা আমাদের খুশি মনে দিল কি? এত যে ঢাক্কা নিনাদ শুনলাম তা কি মিছে? আর যে যা-ই বলুক বাপুজী তো মিছে কথা বলার লোক নন। তিনি তো প্রাচীনও বটে।'

'তিনি তো ধরি মাছ না ছুঁই পানি। কংগ্রেসের সব দেবতারা তাঁর পরামর্শ নেন অথচ তিনি নাকি চার আনার মেম্বারও নন কংগ্রেসের। তার কথা বাদ দেন দাদা। বেনের বেসাতি পণ্ডিত গোষ্ঠীরও বুঝে আনা দায়। তবে আপাতত ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতার নামে যা দিয়েছে তা গৃহ বিবাদ।

চীনে ও প্যালেষ্টাইনেও ওরা দল বল পাকিয়ে এই চালই চেলেছে।' মাধব একটু এগিয়ে এসে শশিশেখরের কানে কানে বলে, 'আমরা সেবার কি করলাম জোটের মহলে? খাজনা বৃদ্ধি দেবে না—দিলাম ভাইয়ে ভাইয়ে আগুণ লাগিয়ে। মন্নু মিঞা আর কেরামত আলী লণ্ডভণ্ড হলো, জেল খাটল। আমাদের মুনাফাটা ঠিকই আসতে লাগল ঘরে।'

'কিন্তু মাধব শেষ পর্যন্ত তারা আবার এক হয়েও তো গিয়েছিল। বুদ্ধির চাল কদিন টেঁকে?'

'তবে সে আশা এখানে কম। ইংরেজ পুতুল নাচাতে ওস্তাদ।'

'নকুল কি বল? তুমি তো কাগজের পোকা। আমরা না হয় দেশ ছাড়লাম—বিদেশে গিয়ে কিছু যজমান শিষ্য জুটিয়ে নিলাম, তাতেও একান্ত স্থবিধা না হলে বামুনের ছেলে না হয়, ভিক্ষাই করলাম। কিন্তু দীন দরিদ্র যারা রইল—যাদের বৃত্তি এখানের মাটির সংগে জড়ান, তারা কি করবে?'

'আমরা ছাডলে গ্রাম তারাও বাধ্য হয়ে ছাড়বে। আর যারা তা না পারবে কলমা পড়বে পশ্চিম মুখো হয়ে।'

মায়াশীল শশিশেখরের চোখের স্থমুখে ফুটে উঠল অজস্র ম্লান অসহায় মুখগুলো—স্পষ্ট একটি মুখও নয় হাজারও অস্পষ্ট মুখ—যারা কামার কুমার ছুতার শানদার—হাহাকার করে উঠল যেন সমাজের অতিপ্রয়োজনীয় অথচ অপাংক্তেয় এই জীবগুলো। তিনি একটু রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'জমিদার বিধুনাথ স্বাস্থ্যের অজুহাতে অনেক আগেই দেশ ছেড়েছে—এখন তোমরাও কি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাচ্ছ?'

'মানে যার সামর্থ্য আছে সেও যাবে না?' একটু বিস্মিত হয় মাধব।

'হ্যাঁ সামর্থ আছে বলেই থাকবে। এ সামর্থ তোমরা কাদের কাছ থেকে আহরণ করেছ? কাদের খাজনার মুনাফা জমিয়ে? কাদের লগ্নী ও লহনার স্থদ খেয়ে?'

'আমি তো একজন নায়েব ছিলাম মাত্র।'

শান্ত সিংহ যেন উত্তেজিত হয়েছে বল্লমের খোঁচায়—শশিশেখরের কাছে মাথা নত করে মাধব।

'এ সময়, তোমরা দেশ ছাড়লে ভেবেছ আবার এসে বুঝি বসত করবে স্থবিধা হলে—তা হচ্ছে না। আমরাই আগে আগুন দেব তোমাদের ছাড়া ঘরে।'

'আমার তো সমাগু টিনের দোচালা—বেচে যাব।' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল মাধব।

'যারা বড় বড় ঘর মান-মর্যাদার দায় বেচতে পারবে না—তারা ফিরে এসে দেখবে শ্মশান।'

'দাদা ইংগিতটা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু আমরা তো অক্ষম।'

'ভুল বলছ—এ দাস্য মনোবৃত্তির কথা। তোমাদের এখন অনেক কিছু করার আছে পাকিস্তানে। শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানদেরও বোঝাতে হবে। নইলে লাভ হবে না দল বেঁধে দেশ ছেড়ে। আমার অনুরোধ এর বিশ্বাসঘাতকতা তোমরা কর না।'

'সে তো বুঝলাম। যদি আমরা এখন দেশ না ছাড়ি আমাদের ধনপ্রাণ ও মান মর্য্যদার জন্য জামিন হবে কে? আপনি না হয় গান্ধী পন্থী—আপনার বাপুজীকে আমরা তো আর অতখানি ভরসা করতে পারিনে, ঠকতে ঠকতে কোথায় এসে ঠেকেছি তা এখন বুঝছি হাড়ে হাড়ে।'

'না এখনও তোমাদের বুঝতে ঢের বাকি।'

মাধব মুখে কিছু না বলে এবার মনে মনে ভাবল, শশিশেখর অজ্ঞ ভাবপ্রবণ। একবার চিন্তা করেও দেখল না যে, তাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠান দুটি কি করল? একটিতে এ বিভাগ অনিবার্য বলে স্বীকার করে নিল, অপরটির গেরুয়া পতাকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হল। সকলেই সুবিধাবাদী! অতএব নৈয়ায়িক পণ্ডিত মাধব নায়েবও অসুবিধার ধার ধারবে কেন? বিশেষ কথা তার যখন উপজীবিকা নষ্ট হতে বসেছে।

নকুল পণ্ডিত এবার ধীরে ধীরে বলল, 'আদর্শবাদীর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ দাদা।'

'আদর্শের পিছনেও একটা বাস্তব প্রয়োজন রয়েছে। কোন বাদই দুঃখবর্জিত নয় নকুল।'

মাছ কোপানর জন্য কোঁচ গাঁইতি একনালা নিয়ে কয়েকজন মুসলমান এসে উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কথা শুনছিল। তাদের হাত পা গায় কাদার সর শুকিয়ে চটের মত হয়ে গিয়েছে। তারা হাসতে হাসতে বলল, 'আমরাও তার ঘরে আগুন দিমু যে যাইবে ছাশ ছাইড়া। গোসাই কেলেশ করবে ক্যান আমরাই যামু আগে লুকা (মশাল) লইয়া।'

মাধব একটু ভয় পেল, সে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা?'

'মাছ ধরতে।'

আর একজন হেসে বলল, 'না না আগুন দিতে!'

অপর একজন মন্তব্য করল, 'ও কথা কয় না হারামজাদা। মশকরা কি করে হামেশা!'

যেতে যেতে পূর্বের ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যান বাজান?'

'এখন হিন্দু গো পরান টুসটুস করে—একটু ঘা লাগলেই আণ্ডার খোলার মত ভাইঙা খান-খান হইবে।'

'ক্যান মিঞা আমরা কি তাগো কিছু কইছি নাকি?'

'কও নাই তো রামগঞ্জ লক্ষ্মীপুরায় হইল কি?'

'তিনডা থানা দিয়া ওজন করতে চাও সারা দুনিয়া?'

'তোরা যে পাঠার জাত। এক ফোঁটা গরুব চোনা দিয়া—নষ্ট করছ এক কলস দুধ। না হইলে হিন্দুরা আইজ আমাগো বদনাম করতে পারে? আমাগো কইতে পারে গোয়াব শুয়াব? নোয়াখাইলা পাঠাগুলায় জাইত মারছে সারা দুনিয়ার।'

'বিহারের কথা তুমি কি ভুইলা যাও?'

'সুইচের খোঁচা কেডা দেছে আগে—তারপরই না ধবজির (লগি) গোঁজা খাও।'

ছেলেটা একটু চিন্তা করে বুড়ো বাপের কথা অনুমোদন করে। 'যা কইছ বাজান—পাকিস্তান কায়েম হইয়াই বা আমাগো লাভ হইছে কি? সেদিন একটা কামের লাইগা গেছিলাম জেলায়, চাইল ঘুষ। কইলাম এখনও ছল্লি-বল্লি কইরা আমাগো পয়সা খাইবা? জবাব দিলে কি শোনবা? তুমি কি উজির সাহেবের শালা?'

'এখন বুইঝা গ্যাখ শালা-সম্বন্ধীরই বাদশাদারী—আমার-তোমার কিছু না। তয় যামু ক্যান পাড়া-পড়শির লগে হট-হুজ্জত করতে? হিন্দুরা গ্যাশ ছাড়া হইলে একটা ক্বযানও খাটতে পারুম না চাচা ভাইগো বাড়ী। দুরবিক্ষের বার কেও একগোডা দানা দেছে কোনও মেয়া ছাহেব? মার পয়জার ওগো কপালে।'

তার চেয়ে বরঞ্চ হিন্দুরা অনেক স্থানে দান ধ্যান করেছে, এই সব কথা আলোচনা করতে করতে ওরা চলে যায়। কিন্তু মাধব নায়েব অস্থির হয়ে থাকে অগুনের কথা শুনে। ওদের তামাসাও হামেশা সত্য হতে দেখেছে সে। পদ্ম পাতায় জলের মত ওদের মন। একটু কেউ নাড়া দিলেই হল। মাত্র এক আনার জন্য ওরা একটা মাথা কেটে আনতে পারে।

খ্যায়ের পণ্ডিত হয়ে সে বিলে অন্যায় নায়েবী করছে এই বিশ বছর ধরে একজন মুসলমান আধা জমিদারের অধীনে। মাধবকে দেখতে পারে না মহলের প্রায় পনর আনী প্রজা। যে জোট সে বারবার ভেঙেছে, এখন যদি সেই জোট পাকিয়ে, এই গাঁয়ের ওই ওদের হাত করে, তারা এসে তার ঘরে আগুন দেয় এবং অত্যাচার করে তবে উপায় হবে কি? ঘরে তার স্ত্রী পুত্র দুটি ডাগর মেয়ে এবং যুবতী বোনও আছে একটি। জমিদারীর অবস্থা যখন টলটলায়মান হয়ে উঠল তখন সে খাস করতে লাগল কেত্তার পর কেত্তা ধানি জমি। হাজার বিঘাও কি সে নিলাম করিয়ে বড় মিঞার দখলে এনে দেয়নি? তার পরিবর্তে সে কি করেছে? একখানা দালান ও যদি গড়িয়ে দিত তবে মাধব নিশ্চিন্ত মনে অন্তত রাতটা কাটাতে পারত। মাধব শঠ, কিন্তু শঠতা করেছে কার জন্য? মনিবের স্বার্থে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। দুটি চাল, ক'খানা বস্ত্র, তার অধিক সে ক্রয় করেনি বা জমায়নি এক কপর্দকও কাউর অজ্ঞাতে। তারই সঞ্চিত অর্থ অথচ উপচে পড়েছে ঢাকা লক্ষ্ণৌর সেরা সেরা বাইজী বেশ্যার পদতলে। সারা জীবন খেটে খেটে প্রাণ পাত করে মাধব করল কি?

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক ঘিরে এল। কৃষ্ণ পক্ষের রাত। মাধব ধরা গলায় বলল, 'শশিদাদা এখন উঠি। আমার দেশ না ছেড়ে কল্যাণ নেই। মহলে আর ফিরে যেতে পারব না মুসলমান রাইওতের মধ্যে। দেশে বসেই বা খাব কি? দাদা যত পণ্ডিতেরাই মূর্খ।'

শশিশেখর বললেন, 'তুমি একটু বসো নকুল—আজ তো সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি। একা একা আমার ভাল লাগছে না।'

অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে মাধব অদৃশ্য হল। নৈয়ায়িক পণ্ডিত—সে এতকাল ধরে যে ভাবে মনিবের জন্য ন্যায়ের ব্যাখ্যা করে এসেছে, তা তার দুঃসময়ে হয়ে দাঁড়াল অন্যায়।

শ্রেণী ভেদের এই তো বিচিত্র নিয়ম!

(দুই)

মাধব উঠে যাওয়ার পর শশিশেখর বললেন, 'নকুল তামাক খাবে?'

নকুল মুখে কিছু বলল না, তবে এমন একটা ভাব প্রকাশ করল যে পেলে সে খেতে রাজী।

শশিশেখর তা বুঝতে পেরে ডাকলেন, 'মাধবী, মাধবী! একটু তামাক ও একটা প্রদীপ দিয়ে যা মা।'

প্রদীপ ও তামাক নিয়ে কিছুক্ষণ বাদে যে মুক্ত বারান্দায় এসে প্রবেশ করল সে খুব রূপবতী না হলেও স্বাস্থ্যবতী। ঐ স্বাস্থ্যের আশীর্বাদেই তাকে পরমা সুন্দরী বলে ভ্রম হয়। সে তামাক ও প্রদীপ রেখে কেন যেন ঝটিতি ঘরে প্রবেশ করল। বোধ হয় ভয় পেয়েছে।

'ও কি মা?'

একটা লোক দাঁত বের করে হাসছে। লোকটার মুখে একগাল দাড়ি—জংগল জন্মেছে যেন। হাত পা গুলো শক্ত শক্ত, পেশী ও শিরা বহুল। মাটির সংগে যুদ্ধ করে কড়া পড়েছে গাঁটে গাঁটে। রংটা কালো কিন্তু বেশ চকচক করছে দেবীর সুমুখের অসুরের মত। মাথায় একটা গামছা জড়ান লাল রংয়ের। 'এট্টু তামাক খামু গোসাই বড় কেলেশ হইছে উজান বাইয়া।'

'রকমান! আমি ভেবেছিলাম কে যেন।' মাধবী আবার হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এলো, সে যে ভয় পায়নি এই কথাটাই প্রকাশ করতে। 'তুমি, রকমান দাদু!'

'হয় বুইন ঠারইন—ঐ মনের বাঘেই তো আগে খায়। শক্ত মানুষ দ্যাখলে জংগলের বাঘও ল্যাজ গুটাইয়া পলায়।'

রকমানের হাত থেকে একখানা বেসাতির ডালা হাতে নিয়ে মাধবী আবার ঘরের ভিতর চলে গেল। সে আর লজ্জায় কিছু বলল না। রকমানকে পশিশেখর একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো। আজ যে এত দেরী হলো হাট থেকে ফিরতে?' হুকো থেকে কলকীটা অতি সন্তর্পণে নামিয়ে নকুল পণ্ডিত মাটির দাওয়ায় রেখে রকমানকে ইসারা করল নিতে। 'কত করে বেচলে সুপারি?'

'হাজার, তিরিশ টাকা।' তাও কি বিক্রি করা যায়? সুপারি বেচা কেনার

নাকি একটা লাইসেন্স হয়েছে। প্রায় গৃহস্থকেই ঝামেলা পোয়াতে হয় ঐ লাইসেন্সের জন্য। অথচ সকলের ওটা অবশ্য করণীয় নয়—আইনত প্রয়োজনীয় পাইকার ও ব্যবসায়ীদের। কিন্তু পুলিশে মারপিট করে, পয়সার লোভে আটক করে রাখে সহজ সরল মানুষ দেখলে। রকমানকেও নাকি মিঞাজান কনষ্টবল ও মেহের চৌকিদার অনেক ঘুরিয়েছে। খালি ডালা কখানা পেট্রোল বোটে তুলে রেখে দু ঘা বেত বসিয়ে দিয়েছে তার পিঠে। তবে তার ওতে কিছুই হয়নি, মাত্র টাটিয়েছে অল্প সময়। দাগ? দাগ তো পিঠে পড়ে অতি সহজে বরবটি কি সীমের লকলকে লতার ঘসা লাগলেও।

শশিশেখর রকমানের পিঠটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এ যে কালশিরা পড়েছে একেবারে! তার বুকটা টাটাতে লাগল। এ মার ও হাসি মুখে হজম করল কার জন্য?

রকমানের সংগে শশিশেখরের সম্পর্ক কিছু নয়। বলতে গেলে পাড়া প্রতিবেশী মাত্র। রাইওৎ নয়, প্রজা নয়, খাতকও নয় এক পয়সার। সে হাটে যায় নিত্য গোসাইয়ের উঠানের ওপর দিয়ে। পণ্ডিত মানুষ কষ্ট করবেন! সে তাঁর বাজার হাট করে দেয়। গ্রামের সকলেই বুড়ো গোসাইকে সম্মান করে, সেও সম্মান ক'রে মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করে। ভাল লাগে মাধবী বোনঠাকুরাণীর মিষ্টি কথা শুনতে। কেমন পরিষ্কার পরিছন্ন ফিটফাট চেহারা, গোছগাছ চুল, আলতা-রাঙা পা দুখানা। এমন মেয়ে সে খুব বড় লোক জ্ঞাতি বাড়ীও দেখেনি। ছোট বোনটিও তার যেন তুলের তুল। তবে সে এখনও একটু পাগল। উঠানে এসে দাঁড়ান যায় না এর মধ্যেই হাজার গণ্ডা ফরমাস। এই চালতে পেড়ে দাও, খেজুর না হয় করমচা এনে দাও। বোন-বুখরী কি এখনও পাকে নি? তারপর সে হয়ত তার হাতের একখানা ডালা কেড়ে নিয়ে তুলে রাখে গোসাই মণ্ডপের দাওয়ায়। ইচ্ছা করলে রকমান ওটা ওখান থেকে অনায়াসে তুলে নিতে পারে। তা সে করে না। দাঁড়িয়ে থাকে বিপন্ন ভাবে। হয়ত মাধবী নয়ত তার মা এসে রকমানকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে, আর বকাবকি করে অবুঝ দুরন্ত চাঁপাকে। চাঁপা বলে যে রকমানের ভাগ্যে আরও অনেক ফ্যাসাদ আছে তার ফুটফাট জোগাড় না করে দিলে। সে কবে চেয়েছে বোন-বুখরী!

গ্রাম থেকে নায়ে ছাড়া হাটে যাওয়া যায় না। এত নদী খালের দেশে জলপথই একমাত্র পথ। এবং রথের মত দ্রুত যেতে হলে ডিঙি ডোঙাই একমাত্র

ভরসা। অনুকূল প্রবাহে চলে দুরন্ত গতিতে। তবে উজানে এমন গতিশীল নৌকাও গোযান হয়ে দাঁড়ায়। আবার হাটগুলোও এ গাঁ থেকে একেবারে কাছাকাছি নয়। যেতে হয় সাত আট বাঁক নদী বেয়ে। নিয়ে যেতে হয় কাঁচা মাল—সুপারির সময় সুপারি, নারকেলের সময় নারকেল, আবার মাঘে, ফাল্গুনে, ধান, বর্ষাকালে, ডেঙো, ওল, মান।

এসব বেচে পয়সা, তারপর গিয়ে মাছ পান বেসাতি। বুড়ো শশিশেখর এসব পারবেন কি করে? তাই রকমানের ইচ্ছা করেই বেগার দেওয়া।

শশিশেখর অনুতপ্ত হলেন। নিছক পরোপকার করতে গিয়ে আজ যে মারটা খেয়ে এল রকমান—এর জন্য যেন তিনিই দায়ী। আর ওকে পাঠাবেন না হাটে।

রকমান তামাক খেয়ে সমস্ত টাকা পয়সার হিসাব দিয়ে এমন ভাবে উঠে গেল যে তার যে কিছু হয়েছে তাই কেউ বুঝতে পারল না। বরঞ্চ সে লজ্জিত হলো দেরী করে এসেছে বলে।

'আমার বোন-বুখরী?'

'কাইল আইনা দিমু ছোটদি।'

চাঁপা এগিয়ে আসত একটা কিছু যাতনা দিতে কিন্তু ভয় পেল বাবাকে দেখে।

রকমান চলে যাওয়ার পরই শশিশেখর উঠলেন। তার পিছনে পিছনে নকুল পণ্ডিতও ঘাটে গেল। বৈদিক সন্ধ্যা বাদ দিয়ে দুজনে তান্ত্রিক সন্ধ্যা সমাপ্ত করলেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যাহ্নিকে যেন কিছুতেই মন বসতে চাইছে না শশিশেখরের।

বারান্দায় ফিরে এসে শশিশেখর বললেন, 'এইবার কাগজখানা পড় নকুল—কি লিখেছে শুনি।'

'আর শুনবেন কি দাদা—শুধু নানা সর্বনাশের কাহিনীতে ভরা—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দেব মন্দির ও ধর্ম্মস্থান অপবিত্র করার সংবাদ। নারী নির্য্যাতনও হচ্ছে স্থানে স্থানে। হিন্দু মুসলীম কাগজের একই চক্রান্ত।'

'কোন মুসলমান এর প্রতিবাদ করছে না?'

'শিক্ষিত সমাজটাই যে বিষাক্ত হয়েছে বেশী। তারা চায় ক্ষমতা অধিকার করতে। তাই নীরব থেকে প্রকারান্তরে অনুমোদন করছে এই নৃশংস বর্বরতা। ধর্মের নামে ভাগ করতে চাচ্ছে বাঙালীর মর্ম।'

বেশ একটু জোর দিয়ে শশিশেখর বললেন, 'তা পারবে না।'

'সত্যি বলছেন দাদা?' বড় উৎসাহে নকুল প্রশ্ন করল, 'এ আপনি বুঝলেন কি করে?'

'ঝড়ে অধীর হয়ো না—সংজ্ঞা হারিও না দূরে তুফান দেখে। তাহলে নৌকা ডুবতে পারে। বিপদে যত ধৈর্য ধরবে ততই দেখবে যে কেটে যাচ্ছে দুর্যোগের মেঘ।'

'একি সম্ভব?'

'নিশ্চয়।'

নকুল পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে যায় শশিশেখরের আত্মিক বল দেখে। বৃদ্ধ সংবাদপত্র সামান্যই পড়েন—মাঝে মাঝে ওদের কাছ থেকে যা কিছু শোনেন। কোন প্রত্যক্ষ গ্রাম্য রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন না, থাকেন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের করণীয় কাজ নিয়ে। তবু কি করে সঞ্চয় করলেন এত জ্ঞান? জ্ঞানের উর্বর ভূমি ছাড়া কি করে জন্মে এত মনোবল?

শশিশেখরকে কয়েকটা ঘটনা পড়ে শোনাল নকুল পণ্ডিত। সবই অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী। অথচ এর প্রতিকার নেই। একদল মারছে আর একদল মার খেয়ে দেশ ছাড়ছে। হাতে পায়ে ধরে নিষ্পত্তি করতে চাচ্ছে দূরে নিষ্কণ্টকে বসে আছেন যাঁরা। আবার মাঝে মাঝে জ্ঞাতিদের বলছেন, তোমাদেরই তো দোষ। ভাল নয় এত আক্ষেপ এবং জ্ঞাতির ওপর রোষ। আমরা করব কি, ভোট দিয়েছ সবাই।

কেউ বলছে, 'এপার চলে এসো।'

আবার কেউ প্রতিবাদ করছে, 'আরে রসো, রসো—ঠ্যাংগা দেখেছ?'

'এ সব কি শুনবেন শশিদা—সব যেন উন্মত্ত হয়েছে। যে সংবাদপত্র গঠন করবে জনমত সেই সংবাদপত্রেই ছাপছে এটা ওটা সবটা।'

'তুমি কি আশা করছ নকুল?'

'আমরা কি কেউ নই সারা ভারতের? কেউ কি এ সময় আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াবে না—দেবে না পথের নির্দেশ?'

'তোমরা তো গলিত অংশ—সবংশে নিপাত যাও, এই তো শল্য-চিকিৎসা।'

'এই গলিত অংশই একদিন অগ্রণী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে—লুঠ করেছিল ইংরেজের অস্ত্রাগার, ত্রাসে কেঁপে উঠেছিল সাগরপারের সিংহাসন।'

'চারণ কবি মুকুন্দ দাস ছড়িয়েছিল বাঁশীর স্বরে বিষের আগুন—তার এখন কি চিহ্ন আছে নকুল? শিক্ষিত অশিক্ষিত কত কবিয়াল শিষ্য যে তার মন্ত্রে শিক্ষা পেয়ে দীক্ষা দিয়েছিল অজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণকে—সে কথা আজ স্মরণ করে কে? শুনেছি নাগা কুগীরা বৃদ্ধ এবং অক্ষম পিতামাতাকে খেয়ে ফেলে। তুমি চাচ্ছ পথের নির্দেশ!'

'তবে আমরা কি করব দাদা?'

'এইখানেই থাকব।' কিছুক্ষণ বাদে শশিশেখর প্রদীপটা একটু উসকে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'দাবানল দেখেছ?'

'দেখিনি, তবে তার সর্বধ্বংসী ক্ষমতার কথা শুনেছি।'

'তাও ভুল শুনেছ—সব গাছ আর মরে না দাবানলেও। আমাদের কর্তব্য আমাদেরই স্থির করতে হবে, ফেরাতে হবে মাধকে। বোঝাতে হবে উভয় সম্প্রদায়ের সবাইকে।'

নকুল যেন নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠল।

ভেজাল দেওয়া কটু তেলের প্রদীপটা ছরছর করে নিভে গেল। এমন সময় একে একে পাঁচ সাতটি লোক এসে দাওয়ায় উঠল। তাদের সংগে একটি মেয়ে 'লোক।

'পেন্নাম গোসাই। সারাদিন কাজকম্মে ব্যস্ত থাকি, রোজই ভাবি একবার দেখা কইরা খোঁজ লমু—তা আর হইয়া ওঠে না।'

'বসো কৃষ্ণদাস—আর কে, কে?'

'এই আপনাগো চরণ গোপ, হারাণ শীল, বিষ্ণু হালদার, যদু তাঁতি আর ওপারের হারাণ কাহারের ছেইলা দুইজন!'

'আর কে?'

'আমি উরবশী।'

'তুমিও এসেছ এত রাত্রে!'

শশিশেখরের আশ্চর্য হওয়ার একটা কারণ আছে। এই উর্বশী এক পশ্চিমা মুচির মেয়ে। তার জন্ম খালপারের একখানা বাসায়। বিবাহও হয় ঐখানে, বিধবাও হয় ঐ বাসায় বসে। শ্বশুর এবং শাশুরীর মৃত্যুর পর তার ঘরজামাই স্বামী, নন্দও মারা যায় এক রাত্রে একটা মরা গরুর খাল খুলতে গিয়ে। আসলে সেটা নাকি গরু ছিল না, ভেসে যাচ্ছিল জ্যান্ত একটা কুমীর। তারপর উর্বশী বৈরাগী হয়। কিছু রূপ এবং দেহাতি স্বাস্থ্য অটুট থাকায় সে নাকি ছত্রিশ জাতির

কৃষ্ণকে ভজন করত। এসব প্রকাশ্য গোপন কথা—তাই অপ্রকাশ্য ছিল না গ্রামের বালকের কাছেও।

'জাইত ধম্ম যাইবে, আসমু না জিগাইতে? বুড়া পণ্ডিত কি বুদ্ধি দেও আপনে?'

কৃষ্ণদাস বলে 'শোনছেন সোনারপুরের খবর? হাট লুট হইয়া গেছে। হিন্দু যারা গেছিল তার একজনও নাকি ফেরে নাই।'

'শুনলে কার কাছে?'

'কও না শীলেরপো ঘটনাটা সবিস্তারে। তুমি নাকি কোন রকমে পলাইয়া আইছ গাঙ সাতরাইয়া?'

জাহ্নবী দেবী এমন সময় একটা প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যান। ওরা একে একে সবাই পায়ের ধূলো নিতে যায়।

'না না হয়েছে বাবা, থাক থাক।'

উর্বশী কেবল ওঠে না, বরঞ্চ সে একটু আলগোছ হয়ে বসে ভয়ে। এর অবশ্য যে কারণটা আছে তা জানত সবাই। দেশ-প্রচলিত রীতি তাই বিস্মিত হয় না কেউ।

পূর্বের সেই লোকটি আবার বলে, 'এখন কও না পরাণ।'

শুষ্ক মুখে পরাণ বলে, 'আমিতো নিজে যাই নাই হাটে। শুইনা আইছি ওপারের মোছলমান পাড়া থিকা।'

শশিশেখর রাশ-ভারি লোক তার সুমুখে বসে যা তা বলা পরাণের পক্ষে কেন এ গ্রামের অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

'তবে তুমি মিথ্যা গুজব এমন করে রটাচ্ছ কেন ডাক্তার?' /

'জিগান তো একটু, শুধান তো শালাকে।' বলতে বলতে দাঁতে দাঁতে ঘষে উর্বশী।

এই কদিন ধরে পরাণ নাকি উর্বশীর কাছে খুব ঘন ঘন আনাগোনা করছে। এবং নানা রাজ্যের শংকা বহুল কথা রটাচ্ছে নাকি বেশ ফলাও করে। এর আসল উদ্দেশ্যটা হঠাৎ উর্বশীর কাছে দিনের আলোর মত প্রাঞ্জল হয়ে যায়। সে ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠে এই অতি চতুর ডাক্তারের ওপর। উর্বশীর হাতের কাছে একখানা খড়ম ছিল, তাই সে চেপে ধরে।

পরাণের লক্ষ্য ছিল সব দিকে। সে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল দাওয়া

থেকে—কি জানি কি রূপ ধরে উর্বশী! পরানের মনে ভয়, সে অনেক ঠকিয়েছে ওকে—এখন আবার তুলেছে নতুন একটা হুজুগ···হিন্দুমুসলমানের বিবাদ। সে আর বারান্দায় উঠতে সাহস পায় না।

অথচ উর্বশী এখন নিশ্চুপ।

পরাণ যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেই দিক দিয়েই পালাল। সংগীরা তাকে ডেকেও আর ফেরাতে পারল না। হয়ত উর্বশী ডাকলে পরাণ ফিরলেও ফিরতে পারত, কিন্তু উর্বশী আর সে চেষ্টা করল না।

এই গণ্ডগোলে অন্যান্য যারা এসেছিল, তারা আর কিছু বলতে পারল না। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব মুশাবিদা।

একটা কথা মনে পড়ে শশিশেখরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, 'এর মধ্যে একদিন সময় করে নিজেই তোমাদের কাছে যাব, নয়ত ডেকে পাঠাব সকলকে।' এই মানুষগুলোর দূর করতে হবে যত মনের আশংকা। তবে আজ কিছু আর হল না।

শশিশেখরকে একে একে প্রণাম করে যে যার বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

ঘরে ঢুকে শশিশেখর একটু গঞ্জনার স্বরে বলেন, 'তোমাদের তো একটু খেয়াল রাখা উচিত—আমি না হয় ভুলই করেছি। স্ত্রীলোকদের এত উদাসীন হলে চলে?'

ব্যাপারটা কি জাহ্নবী বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

'কয়েকটা মাছ তো ওকে দেওয়া উচিত ছিল। ওর তো আজ হাট হয়নি।'

'এখনও বোধহয় রান্না চাপান হয়নি—কিন্তু মাছ যে কুটে-কেটে ধুয়ে নিয়েছে মাধু।' জাহ্নবী জবাব দিলেন।

'চল চল রান্না ঘরের দিকে—কোটা মাছই সবাই রাঁধে।'

হঠাৎ মার সংগে বাবাকে দেখে মাধবী ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে নিজের কাপড় চোপড় গোছাতে থাকে। সাধারণতঃ এভাবে শশিশেখর যখন তখন রান্নাঘরে আসেন না।

এঁটো করা হয়নি, সবে মাত্র নুন হলুদ মাখা হয়েছে মাছে। কৈ মাছ তাই নড়ছে এখনও থালার ওপর। গোটা চারেক বড় কৈ শশিশেখর তুলে দিতে বললেন একটা খারইতে।

মাধবী উঠতে পারছিল না। তার কোলের ভিতর একখানা রঙিন খাম। সহর থেকে হাতে হাতে পাঠিয়েছে কিরণ এক পরিচিত লোকের মারফতে। লোকটি আর কেউ নয় – রকমানের জামাই গিয়েছিল জেলায় এক মামলার তদ্বিরে।

পত্রখানা উতপ্ত—এখনও ভাঁজ খুলে পড়তে পারেনি মাধবী—আর পড়ে পড়ে জুড়িয়েও যায়নি লেখার তাপ।

'এত রাত্রে তুমি একা একা যাবে মুসলমান পাড়ায় ?'

'কোথাও কাজ কর্ম থাকলে যে এর চেয়েও গভীর রাত্রে যাই।' এদেশে জল পথ ছাড়া চলা যায় না—যে পথের একমাত্র বন্ধু মুসলমান মাঝি—নয়ত মুসলমান কৃষাণ। তুমি চিন্তা কর না কিছু, আমি যাব আর আসব বইত নয়।'

'কিন্তু যে দিন কাল পড়েছে !'

'ওরা কি আমার গলা কেটে রাখবে ? চোর ডাকাতে রাখতে পারে কিন্তু হাজারটা পাকিস্তান হলেও ভাল যারা তারা মন্দ হব না।'

'অন্ধকার পক্ষ তো।'

'একটা বরঞ্চ মশাল দেও।'

কতগুলো নারকেল পাতা সংগ্রহ করে আঁটি বেঁধে আনলেন জাহ্নবী। উঠানে নেমে মশলা জ্বালাতেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন শশিশেখর। 'তুমি এখনও যাও নি উর্বশী ! কেন ?'

'কথা আছে ?'

'তবে······' একটু ইতস্তত করতে লাগলেন শশিশেখর।

জাহ্নবী আবার বলেন, 'ভেবে দেখ যাবে কিনা—আজ আবার পা দুখানায়ও তো শোথ নেমেছে।'

'না যাব, কি আর হবে ? এক্ষুনি তো ফিরে আসব।'

'আমার হাতে মশাল দেও সাথে সাথে যামু আমি।'

শশিশেখর খুশি হলেন।

যেতে যেতে উর্বশী বলে যে পরাণের কথা বোধ হয় একেবারে মিছা নয়। একটা কিছু অঘটন ঘটবেই দেশে। সেদিন লীগের পাণ্ডা ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মন্নুসরিফ তার দলবল নিয়ে জুতো সারাতে এসেছিল খালপার ওর বাসায়। তারা বলেছে যে এপারের হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই যত ধানি জমি আছে তা জবর দখল করে নেবে এক ধাক্কায়। তারা এখন এদেশের বাদশা

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দায় ঠেকল দুজনেই। সুমুখে একটা সুগভীর খাল, খুব চওড়া নয়। কিন্তু তার বুকের ওপরে সাঁকোটা বড় নড়বড়ে।

'আমার হাত ধরেন পণ্ডিত।'

শশিশেখর ইতস্তত করতে লাগলেন। উঠানে বসে দূর থেকে উর্বশীর হাতে মশালটা আলগা ছেড়ে দিয়েছেন—এখন এই অসময় আবার ছোঁবেন এই চামারের মেয়েটাকে! শুধু চামার নয় গ্রাম্য বারবনিতা। একটু সুন্দরী হলে হবে কি, ওর পরনের শাড়ীখানা বোধ হয় সিদ্ধ করে কাঁচে নি এক সপ্তাহ।

কিন্তু প্রয়োজনের সময় যে বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে দেয় তাকে অবহেলা করা কি নীতি বিরুদ্ধ নয়? জাত কুল মান বিচারের এই কি সময়?

এখান থেকে শশিশেখর ফিরে ও যেতে পারতেন। এমন কি প্রয়োজন ছিল রকমানের বাড়ী যাওয়ার? কিন্তু শশিশেখরের তা প্রাণে চাইছিল না। বাড়ী ফিরে গেলে হয়ত ও মাছ আর তাঁর মুখে দেওয়া হবে না। আজ না হয় কাল-শিরা দুটো তাঁর নজরে পড়েছে, এমন কালশিরা হয়ত আরও গোপন করেছে রকমান। আজকাল তেল তামাক নুন কেরোসিন কি না কিনতে বা বেচতে গেলে সইতে হয় পুলিশের জুলুম! নিজের জমির ধান নিয়ে তো বেচতে হলে যেতে হয় চোরের মত। বখরা ছাড়া বাগে আনা যায় না ওদের। দর চড়ার এও একটা মস্ত কারণ।

উল্কিপরা একখানা গৌরবর্ণ হাত ধরে শশিশেখর সাঁকো পার হলেন। বড় আনন্দ হলো তার প্রাণে। উপেক্ষা করলে তিনি কোথাও পেতেন এ সুযোগ এবং এই বন্ধুর পথে সাহচর্য?

তাঁর যেন মনে হলো সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিপদ সংকুল সাঁকো পারাপার হওয়ার জন্য আজ হাতে হাত মিলাল হরিজনদের।

সাঁকো পার হয়েই ঠিক শুকনা জমিতে পা দেওয়া গেল না। অনেকটা কাদা ভেঙে উঠতে হলো ভাল রাস্তায়। একটা বড় মুসলমান বাড়ীর পথ—তাই এত উঁচু এবং সুন্দর করে বাঁধান হয়েছে মাটি কেটে, অনেক পয়সা খুইয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের পয়সা তবু বড় গৃহস্থের ইচ্ছা মতই সে পথটা তার বাড়ীর মধ্যে ইতস্তত ঘুরেছে। আর তার পাশেই যাদের শতাধিক বাড়ী তাদের পথ তো দূরের কথা—পুকুর এবং ঘরের ভিটি প্রায়ই ভেসে যায় পূর্ণিমা কি অমবস্যার

স্রোতে জল একটু ফুলে উঠলে। নিম্ন বাঙলা, বন্যার দেশ—প্রায় বার মাস পাশা-পাশি সুখ ও দুঃখের এমন সমাবেশ আর বড় একটা দেখা যায় না অন্যত্র।

মশালটা একটু ঝেড়ে নিয়ে উর্বশী জিজ্ঞাসা করল, 'বড় কষ্ট হইছে তোমার—হাঁপাও যে?'

'না মা তুমি এগিয়ে চলো।'

হঠাৎ কেমন যেন বোধ হলো উর্বশীর। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাকে মা বলে ডাকলেন! সে একটা চামারের মেয়ে বৃই আর কিছুই নয়। সে ভাবল, এখন আর ভয় কি তার? সে অনায়াসে পরামর্শ চেয়ে নেবে। লজ্জা সংকোচ আর সে করবে না এই মহাজ্ঞাণী পণ্ডিতের কাছে। ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের পথ এই পণ্ডিতই তাকে দেখিয়ে দেবেন।

তাকে নাকি পরাণ বিয়ে করতে চাচ্ছে। বলছে, 'তুই নাপিতের বৌ হইয়া চল যাবি কইলকাতায়, নইলে মরবি এখানে থাকলে।'

জবাবে উর্বশী বলেছে যে কেন সে যাবে কলকাতা? যদি পরাণ তাকে ভালবাসে তবে থাকবে ঘরজামাই হয়ে নন্দর মত। ও বাপের ভিটা ছাড়বে না—এবং নাপিত হবে না কিছুতেই। কেন, মুচি হলে দোষ কি? পেশা পছন্দ না লাগে ক্ষেত-জিরাত কর, আন গরু কিনে, জমি তো রয়েছে কত চাইলে পাওয়া যায় বর্গা। 'কি বলেন পণ্ডিত বাবা, আমি ধম্ম ছাড়ুম?'

'না মা তুমি ধর্ম্ম ছেড় না, তবে অন্যায়ও কিছু করো না।'

পশ্চিম দেশ থেকে বহু পুরুষ ধরে এখানে এসে উর্বশীরা বসবাস করছে। এই দেশের জলবায়ুতেই তাদের স্বাস্থ্য ও পরমায়ু গড়া, হিন্দু মুসলমানদের সংগে মিলে মিশে এক হয়ে কাটাল এতকাল। এখন সে ভয়ে দেশ ছাড়লে হবে অন্যায়। বরঞ্চ সে দীক্ষা নিক তাঁর কাছে। কিছুকাল পরে ওর চিত্ত শুদ্ধি হলেই, শশিশেখর উন্মুক্ত করে দেবেন সার্বজনীন সমস্ত পূজা পার্ব্বনের দুয়ার। দেশের এই দুর্দিনে তিনি সংঘবদ্ধ করবেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ নমশূদ্র মুচি চামার।

শশিশেখরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে উর্বশী। তার চোখে আসে জল। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সার্বজনীন পূজার জন্য। তারা চিরদিন পূজার সময় দূর থেকে মাকে দেখেছে—অস্পৃশ্যা বলে বামুন কায়েত বাড়ী সন্তর্পণে হেটেছে। সেই উর্বশীই নাকি বরণ করতে পারবে মাকে। দিতে পারবে হোম আরতির শিখা জ্বালিয়ে।

দিতে পারবে নৈবেদ্য ও ফুলের ডালা সাজিয়ে—এতো রীতিমত বিস্ময়। 'আমি জান দিমু বাবা।'

'এই তো চাই মা, হিন্দু ধর্ম্মকে বাঁচতে হলে, তোমাদের ডেকে নিতে হবে এক পংক্তিতে।'

থপথপে ফুলো পা দুখানা নিয়ে শশিশেখরের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল! তবু তিনি বড় বাড়ীর শেষ সীমায় এসে আবার মাঠে নামলেন। তাকে মধ্যে মধ্যে হাত ধরে সাহায্য করতে লাগল উর্বশী। কারণ এখানেও জল কাদা ছিল মাঠে।

রকমানের ঘরের সুমুখে গিয়ে দুজনে থামলেন। এ বাড়ীটাতে অন্তত পনর ঘর গৃহস্থের বাস। রাতও বেশী হয় নি। কিন্তু বাতি জ্বলছে না একখানা ঘরেও।

ডাক দিতেই রকমান বেরিয়ে এলো। আশ্চর্য হয়ে গেল মাছের কথা শুনে।

'কেমন আছিস বাপ ?'

'ভালো।' সে বিব্রত হয়ে পড়ল কিসে এবং কোথায় বসতে দেবে এই মহানৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণকে। তাদের বাড়ীতে এঁটো তো দূরের কথা হাঁস মুরগীর ময়লা না আছে কোন আসনটায়।

উঠানের মাঝখানে একটু জায়গা রেখে পাশাপাশি চারিদিকে ঘুরান ছোট ছোট সব নাড়ার ঘর। এবাড়ীতে এসেছিল এক ঘর মানুষ, এখন হয়েছে বহু ঘর। তারপরও তাদের জন্মেছে দশ পনর কি পঁচিশটি ছেলেমেয়ে—যারা ওয়ারিশ সূত্রে পাবে এই পৈত্রিক তালুক!

বাতি কোনও ঘরে জ্বলছে না, কারণ স্বাধীন হয়েছে দেশ। নিবারণের কেরোসিনের ডিলারী কেড়ে নিয়েছে ঐ বড় গৃহস্থ রমজান। সাপ্লাই অফিসারকে বলেছে, 'হুজুর আমি মোছলমান।'

জাতি তত্বের ভিত্তির ওপরই ভর করে সাপ্লাই অফিসার কাজ করলেন কিন্তু কেরাণী বলল, 'মেয়া সাহেব, ঈদের পর্ব সুমুখে।'

'আপনে দেখি হিন্দু।' রমজান জবাব দিল।

'খোদা করুণা সিন্ধু। একটা বকরী ছদগা (উৎসর্গ) দিতে হবে তাকে, নইলে নোকরী থাকবে না কাফেরের।' কেরাণী হাসল একটু চশমা তুলে।

মিঞা সাহেব পঁচিশ টাকা ব্যয় করে বাধ্য হয়ে। খোদার জন্য তার হিন্দু খাস মুন্সী কাবাব প্রস্তুত করে। চাকরী বজায় রাখতে গেলে জাত ধর্ম্মের দোহাই অচল। খানা-পিনা দহরম-মহরম রাখতে হবে ওপরওয়ালার সংগে।

এ সব কথা গাঁয়ের সকলেই জানত এবং মর্মে মর্মে বুঝত রকমানের মত গৃহস্থেরা। তাই সাঁজবাতি জালাবার সময় অভিশাপ দিত একধার থেকে সবাইকে। মাইক্রোফোন থাকলে ঢাকা করাচীতেও এ খবরটা ছড়িয়ে পড়ত বর্দ্ধিষ্ণুদের সান্ধ্য আসরে।

বাতি কিছুতেই জ্বালাতে পারল না রকমান। অন্য ঘরের বারান্দা থেকে সে একখানা নামাজের আসন এনে বসতে দিল শশিশেখরকে। 'খবর দিলেই তো যাইতে পারতাম—অসুস্থ শরীরে আসছেন ক্যান ?'

সত্যিই তো আসার মত এমন কি অজুহাত আছে ? এত সামান্যের জন্যেও যে মানুষের প্রাণ পোড়ে সে কথা কার কাছেই বা বলা চলে !

দেখতে দেখতে সব ঘর থেকে একটি দুটি করে লোক এসে জমা হয় শশিশেখরের চারদিকে। সারা বাড়ীতে তখন বড় অভাব চলছিল খোরাকীর। তাই যারা এলো তারা বড় ভাঙা-চোরা—কেউ কেউ বা বলল, কয়েকটি বালক বালিকা রয়েছে উপোসী। একে আসছে কার্তিক মাস, বলতেই বলে এ সময়ে নারকেলেও নাকি থাকে না শাঁস—তাতে আবার চালের দর বেয়াল্লিশ। এ কর্তা হলো কি ? এই কি পাকিস্তান কায়েম হলো ?

শশিশেখর জবাব দিলেন যে হিন্দুস্থানেও নাকি প্রায় এক অবস্থা। রেশনের চালে মানুষের পেট ভরে না, থাকে অর্দ্ধাহারে। হাঁড়ি চড়ে না জ্বালানির অভাবে। ঘরের অভাবে থাকতে হয় পথে, বর্ষা তো ভাল মাঘের শীতের রাত্রেও।

কে যেন মন্তব্য করে, 'হয় গরীবের দুঃখ সবখানে।'

আবার একজন জিজ্ঞাসা করে, 'তয় জাহাজ ভইরা নিত্য পালায় ক্যান মশায়রা ?'

'পালায় তোমাদের ত্রাসে।' শশিশেখর জবাব দেন।

'ছোবান আল্লা ! আমরা কিছু কইছি নাকি ?' একজন বৃদ্ধ প্রতিবাদ করে।

ওদের মধ্যেই একজন অনেকগুলো ছোট খাট নজির দেখিয়ে দেয়। নজির দেখিয়ে দেয়—ক্ষমতা প্রমত্তদের হামলার। লজ্জায় অপমানে বৃদ্ধ মুখ চুন করে উঠে যায়। নিবারণ ডিলারের কথা ওঠে—তার হাত থেকে বড় মিঞা সাহেব কারবার কেড়ে নিয়ে একেবারেই তো আলো নিভিয়ে দিল গরীব পাড়ার। একটা বিচার বিভ্রাটের কথাও যে না ওঠে তা নয়। এসব ওদের ভাল লাগে না। ওরা চায় না যে হিন্দুরা সব চলে যাক দেশ ছেড়ে। ওদের রীতিমত ত্রাস হয় যে এই

বুদ্ধিমান ও প্রাণবান সম্প্রদায় চলে গেলে ওদের জ্ঞাতি ভাইরা নিশ্চয় পিষে মেরে ফেলবে ভূমিহীন নিঃস্ব কামলা মজুর মাঝিদের। কিন্তু ওরা সাজিয়ে বলতে পারে না—তাই ওদের বোবা ভাষার কেউ খবর রাখে না। অথচ ওরাই সংখ্যায় বেশী। বড় মিঞা আর কজন!

রকমান কেন জানি কঁকিয়ে ওঠে, শশিশেখর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কিরে?'

'কিছু না।'

'কিছু যদি না-ই হবে তবে অমন করে কাতার ভাবে কেউ কঁকায় নাকি?'

একজন বলে, সে নাকি হাটে গিয়েছিল ওর সংগে। একটু বাদানুবাদ করায় পুলিশে দিয়েছে নাকি ওর পাঁজরে লাঠির গুঁতো। অনেকক্ষণ ও বেদম হয়ে পড়েও ছিল নায়ে।

এসব কথা রকমান গোপন করেছে! শশিশেখর স্তম্ভিত হয়ে থাকেন।

মশালের শিখাটা নিবে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও আগুনটা ছিল। তাই ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালালেন শশিশেখর। জ্বালিয়ে উর্বশীর মুখের দিকে সকরুণভাবে তাকালেন। উর্বশী সব যেন বুঝল। যেতে হবে ডাক্তার ডাকতে, সেই পরানকে, যে একমাত্র ডাক্তার এ তল্লাটে।

রকমান বলে, 'এসব কি?'

তার স্ত্রী বলে যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। সেরে যাবে কাল 'পানি-পান্তা' খেলে। আজ নাকি ওদের হাঁড়ি চড়ে নি চালের অভাবে। ও ব্যথা গুঁতোর নয়—না খেয়ে খিল ধরেছে পেটে।

কিন্তু 'পানি-পান্তার' ব্যবস্থা হবে কি করে? শশিশেখর উর্বশীকে আবার ডাকলেন। বলে দিলেন অন্তত আধমণ চাল নিয়ে আসতে তাঁর বাড়ী থেকে— নইলে হবে কেন এতগুলো লোকের।

উর্বশী যওনা হলো। যাওয়ার সময় সে ডেকে নিয়ে গেলে একটি ছেলেকে।

(তিন)

পরান থাকে এক কর্মকার বাড়ী। একটা ভাঙা হাত খানেক লম্বা কেরোসিন কাঠের বাক্সে থাকে তার ওষুধের শিশি বোতল এবং পোঁটলা পুঁটলি। তার বাবা ছিল কবিরাজ, নাম ছিল তার পাঁচ গ্রামে। সে দাড়িও কামাত আবার হাত দেখে ওষুধ দিয়ে দর্শনীও নিত। সময় মত করত হালুটি। তার মৃত্যুর পর পরান দেখল যে কবিরাজী করে আর নাম করা যাবে না—সে সহরে গিয়ে এক ডাক্তারের বাড়ী চাকরীতে ঢুকে পড়ল। তিন বছর ডাক্তারের স্ত্রীর রসনার রসোক্তি সয়ে শিক্ষানবিশি শেষ করে সে দেশে ফিরল। সংগে নিয়ে এলো, অবশ্য চুরি করে একটা থার্মমিটার ও ষ্টেথিসকোপ একটা। একটু লেখা পড়া জানত - সে তাই কয়েকটা প্রেসক্রিপসনও বাংলায় অনুবাদ করে নিয়ে এলো। কিছু হেক্সা মিন, কিছু ম্যাগসলফ দিয়েই সে সমস্ত রোগীকে কাবু করে রাখত। তাতেও যে তার ওষুধের তেজ সম্বন্ধে সন্দেহ করত, দিত তার হাতে একটা এ্যাড্রিন্যালীন ইনজেক্সন বসিয়ে। যত বড়ই বীর হোক—তখনই তাকে কাত হতে হতো হৃদপিণ্ডের কাঁপুনিতে। হ্যাঁ, ডাক্তার বটে পরাণ শীল!

শশিশেখরের বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে পরাণ দুঃখিত মনে অনেকক্ষণ বসেছিল দাওয়ায়। এই দুনিয়াদারী মিছে—মিছে মেয়ে মানুষকে ভালবাসা। বিশেষত উর্বশীর মত যারা বেহায়া বেপরদা। এমন আর মিথ্যা কথা সে কি বলেছে? দশটা সত্য ঘটনা তো রোজই ঘটছে। সে না হয় আর দুটো তৈরী করে রটিয়েছে। রটিয়েছে তো ওরই জন্য। এসব কথার কদর চামারনী বুঝবে কি করে? শুয়ারে চেনে কচু আর ঘেঁচু। ওকে যে দুধাপ জাতে তুলতে চেয়েছিল পরাণ। আহা, অমন চেহারা যার, তার জন্য মায়া না হয়ে পারে ডাক্তার বদ্যের? সামান্য চিকিৎসায়ই দুরন্ত ব্যাধি আরোগ্য!

সভার মধ্যে বলল কিনা শালা!

পরান একটা শিশি খুলে সবটুকু পিওর ক্লোরাফর্ম খেলো, মরার জন্য নয়—ভোলার জন্য যত সব অপ্রিয় স্মৃতি। কিন্তু ঘুমের ঘোরেও সে শুনতে পাচ্ছিল উর্বশীর কণ্ঠ 'শুধান তো শালাকে……'

সংসারে পরানের কেউ নেই। সে বাড়ী ছাড়া কৈশোরে। অনেক দিন ধরে এদেশে থেকে তার সকলের ওপর একটা গাঢ় মায়া জন্মেছিল। নন্দ মারা যাওয়ার

পর উর্বশীর ওপর ওর টানটা আর একটু প্রগাঢ় হয়। কারণ, বড়ই আপশোষ, নন্দকে খেল কুমীরে! যদি কিছু রোগ হতো তবে সাধ্য ছিল কি যমের যে পরাণ ধন্বন্তরির কাছ থেকে টেনে নিয়ে যায় নন্দকে? বিধবা হলে মুচির মেয়ের মুখখানাও শুকনা দেখায়। মনে হয় যেন রোগে ধরেছে। পরান এক একদিন তার টেথিসকোপটা দিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছে ওর হৃদযন্ত্রটা। এসেছে একা একা।

উর্বশী হেসেছে, রাজীও হয়েছে, কিন্তু আতুল করেনি বুক, পিঠ, পাঁজর।

'ওরকম করলে কি চলে?'

'তবে ক্যামন করুম? লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া কি রোগ ছাখামু?'

পরানের হাত কাঁপে, ঘন হয়ে আসে শ্বাস প্রশ্বাস। সে হাতের যন্ত্রটা ফেলে দিয়ে ওকে সবলে আঁকড়ে ধরে। একটা সংঘর্ষ হয়। পরান ধাক্কা খেয়ে উঠে যায়।

পরের দিন পরান আবার আসে। খালপারে নির্জন বাসা। খাসা লাগে পরানের কাছে। সে আবার রোগের কথা তোলে। আহা, উহুঁ করে।

রোগিনী হিঃ হিঃ করে হাসে। একখানা জুতো দিয়ে এক ঘা কষিয়ে দেয় ওর গালে। 'ওলো আমার বদ্যি!'

পরান অসম্মান বোধ করে – তার রস ভংগ হয়।

কিন্তু পরের দিনও পরান আবার না এসে পারে না। আসে ঠিক সন্ধ্যা ঠেকিয়ে। সবে প্রদীপ জেলেছে উর্বশী। বসতে বলে ডাক্তারকে দাওয়ায় উঠে। সে তুলসী তলায় প্রদীপ দেখায়। হেঁট হয়ে বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়েদের মত প্রনাম করে শ্রীকৃষ্ণজীকে।

তারপর ঘরে এসে হিঃ হিঃ করে হেসে ফেলে। 'যন্তরডা কই তোর ডাক্তার?'

পরান বলে, 'আইজ মনি ফাঁকি দিলে চলবে না—পরীক্ষা করুম সব। গুরুতর ব্যাধির কড়া ওষুধ আনছি সংগে!'

আজ সহজেই রাজী হয় উর্বশী। কিন্তু একটি অংগীকার করতে হয় পরানকে যে সে মুচি হয়ে থাকবে এখানে। অনেক সবিনয় করে বলে উর্বশী।

পরান কতবার এমন অংগীকার করেছে কিন্তু আজও তা পালন করে উঠতে পারেনি। তাই মাঝখানে ভীষণ ঝগড়া হয়েছে উর্বশীর সংগে। উর্বশী ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে আর পাঁচ জনকে ডেকে নিয়েছে ঘরে দুরন্ত গায়ের রাগে।

এখন আবার নতুন একটা সাম্প্রদায়িক গোলমালের অজুহাত তুলেছে পরান। উর্বশী পূর্বের রাগে এবং এখনকার জ্বালায় বেহুঁশ হয়ে তাই শালা বলেছিল ভর সভায়।

উর্বশী পরানকে ডাকল না। ছেলেটাকে ইসারা করল ঠেলা দিতে।

'কিরে, কারে চাও ?'

উর্বশীকে দেখে পরান চোখ নামাল। ধীরে ধীরে শুনল সব। তারপর সে গম্ভীর ভাবে যন্ত্রপাতি নিয়ে নামল। বোধ হয় ওষুধ পত্রও নিল কিছু। 'দিনের আঘাত আইছ তুফার রাত্রে! তোঁগো কাছে কি কখনও পয়সা চাইছি, কিন্তু এমন তোগো গাফিলতি যে খবরডাও দেও না সময় মত। মরবি শালারা মর, আমি করুম কি ?'

'আমার তো ব্যামো লয়।' ছেলেটা একটু রুক্ষ স্বরে জবাব দেয়।

'শালারে আনছে কে সংগে করইয়া ? আমার তো ব্যামো লয়! দেখো দেখো এক বাড়ীর উপরের চাচার লাইগা দরদ কতখানি! এমন আহাম্মক জাইতও আছে।'

'ওরে কহিস ক্যান পরান ? একটুখানেক মানুষ ও কি জানে ? ছিল তো ঘুমে।'

'কই কি সাধে ? লাগছে হাড়ে দরদ—চল দেখবি সত্য কিনা। এর পরিণাম খুবই খারাপ। গায় গোস্ত থাকলেই আর বুদ্ধিমান হয় না।' এমনি ধারা বকবক করতে করতে চলল পরান। বলতে লাগল এদের চিকিৎসা করাই ঝকমারী। অথচ ছোট বড় অক্ষম সক্ষম অন্ধ আতুর কারো মায়া কাটিয়ে সে উঠতে পারে না। তা না হলে এতদিনে সে চলে যেত কলকাতা! সেখানে জুটিয়ে ফেলত ডাক্তার মোক্তার বড় বড় সব রেগী। দাংগার জন্য সে ডরায় না। হিন্দু পাড়ায় সুবিধা না হলে বসত গিয়ে মুসলমান পাড়ায়। সে আর কেউ নয়, পরান শীল ডাক্তার!

'তয় যে ডর দেখাইলি আমারে ?'

'কিসের ?'

'ভুইলা গেলি এরই মধ্যে ?' উর্বশী মশালটা নিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায়। মশালের স্থির শিখায় চারদিকের নারকেল সুপারি বাগ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঝকমক করতে থাকে উর্বশীর মুখের ছোট ছোট বসন্তের দাগ, নাকের সোনার বেসর,

কানের রূপার বনফুল। হাতের পৈছি এবং গলার হাঁসুলিও চিকমিক করে হেসে ওঠে। রং তো না যেন আগুনের আর একটা হল্কা। ঝলকে উঠল পরাণের সুমুখে। সে থতমত খেয়ে গেল উর্বশীর প্রশ্নে। শশিশেখরের বারান্দায় বসে তো বিচার হয়ে গেছে, আবার কি ?

'পরান তুই ছাড়বি কিনা মিছা কথা ?'

পরান দ্রুত মুখ সরায়। উর্বশীকে বিশ্বাস নেই, ও এখনও চেপে ধরতে পারে ঐ জ্বলন্ত মশালটা পরাণের মুখে। যে বদ-মেজাজী মেয়ে লোক উর্বশী! চাইছে বুঝি বাজ পক্ষিনীর মত। একটু একটু পরানের নেশা ছিল তাও ছুটে গেল।

শশিশেখরের উঠানে এসে ওরা উঠতেই তিন ভিটির তিনখানা ঘর থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। একটা মর্মান্তিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে পল্লীগ্রামে।

'ভয় নাই গো আমি উরবশী।'

তবু প্রথম এক ঘর থেকে একজন বৃদ্ধ বের হলো। সে সব ভাল করে দেখে বলল, 'দোর খুলতে পার মাধবী।'

মাধবী দোর খুলেই জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা ?'

'আইবেন একটু পরে -- চিন্তা কি বুইন, আমরা আছি সংগে।' তারপর সে সব খুলে বলল। রকমানের জন্য চিন্তিত হয় মাধবী এবং তার মা। চাঁপারও ঘুম ভেঙে ছিল। সে বুঝল যে তার বন-বুখরী শীগগির আর এনে দিতে পারবে না' রকমান দাদু। না পারুক সে সেরে উঠুক তাড়াতাড়ি। এখন আর চাঁপা ছোট নয়, তাই ব্যস্ত হবে না পূর্বের মত।

চালের ডালা মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলল ছেলেটা। লম্বা লম্বা পাঁ—ল্যাংপেঙে হাটুনী। 'দেখিস্ চাউল কয়ডা আবার ফেলাইয়া দিস না কলা-বাদুড় ?'

'তুমি ভাবছ কি মুচিবুইন, যা খাইয়া গুষ্ঠী বাঁচবে তা ফেলামু জলে ?' সে সাঁকো না পেরিয়ে খাল ভেঙে ওপার ওঠে। ঐ চালের কতটা আর ও ভাগে পাবে কিন্তু কি যে মহা দায়িত্ব—এতরাত্রে চলল কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে!

'দিলেই পারতিস আমার হাতে – দিতাম সাঁকোটা পার কইরা।'

'দূর দূর! সোনা আর দানা একই বস্তু। যত মাথায় করইয়া টানবা তত দোয়া করবে আল্লা রসুল।'

কলা-বাদুড় এবার এগিয়ে যায় অনেকটা। পরান বলে, 'দেখ উর্বশী, তুই চামার আমি ডাক্তার—আমাগো কাম কিসে অত মিল মিশে ? রোগ হইলে ডাকবি তখন

গিয়া আমি যামু, আর জুতা যদি ছেঁড়ে তয় তোর খোঁজ লমু। হামেশা দেখা হইলে তুই কর বড় তুচ্ছ।'

উর্বশী জবাব দেয় যে ঈশ্বরের কৃপায় স্বাস্থ্য ওর নিটুট আছে, আর পরাণ শীলকে ও তো ধর্মের ইচ্ছায় জুতো পায় দিতে দেখেনি কোন কালে। অতএব এখানে স্থায়ী বিরহ বেশ স্বাভাবিক।

একটা গাছের পাতা পচা কেমন যেন গন্ধ আসছিল কর্দমাক্ত বাগিচা দিয়ে। তাই ঠেলে ওরা গিয়ে উঠল বাড়ীর ভিতর। কিছু কেরোসিন তেল চেয়ে এনেছিল উর্বশী। তা ভাগ করে দিল অল্প অল্প করে। সব কখানা ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠল দীপ শিখায়। কিন্তু রকমান তখন ব্যথায় অচৈতন্য হওয়ার জোগাড়।

পরাণ বলল, 'ঐ কঁকানি শুইনা অস্থির হন না যেন ঠাকুর গোসাই। ও পাঠার জাইত গোঙায় তবু বোঝে না। সময় মত ডাক্তার বদ্যি ডাকে না। আমি ওগো ভাসুর কিনা!' সে রকমানকে একটা ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে ফেলে দাওয়ায়। একটু পরীক্ষা করে বলে, 'বোঝলাম যাও ক্যান সারা রাজ্যের হাটের ফর্দ লইয়া?'

শশিশেখর এতটুকু হয়ে যান।

'আবার পুলিশের সংগে দাংগাবাজী! খাতির করলে না পাকিস্তানী বাজানেরা?' পরাণ উঠে গিয়ে আর একটা মশাল জ্বালায় এবং বলে যে সে ফিরে এলো বলে। এর মধ্যে এক ফালি ধোয়া নেকরা যেন জোগাড় করে রাখা হয় বেশ একটু লম্বা দেখে।

পরাণ নিকটের একটা জংগলে প্রবেশ করে। অমনি নিস্তব্ধ হয় সেখানের ব্যাংগ, গো-সাপ আর্জিনাগুলো পর্যন্ত। এমন দুর্দান্ত ডাক্তারকে দেখে যেন ভয়ে ডাক থামায় ঝিঁ ঝিঁ পোকারাও।

রকমানের স্ত্রী নেকরা বের করতে পারল না। নেকরার থেকেও তার নেহাৎ ঠেকা যে চালে তাই ভাগ করতে লাগল এবং মাপের মুখে দু কুনকে বেশীই ঠেলে রাখল নিজের ডোলায়। সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল চালের স্তূপটার কাছে এসে—কে আগে তার ভাগ নিয়ে বিদায় হবে। সকলেরই পেটে আচমকা যেন আগুন জ্বলে উঠল চালের জোগাড় দেখে। তার ওপর আবার জ্বলছে প্রতি ঘরে আলো। কি যেন যাদু মন্ত্রে উপোসী ছেলে মেয়ে গুলোও জাগল! জুড়ল কান্নাকাটি। একটা জীবনের স্পন্দন অনুভূত হল চারদিকে।

'কই নেকরা ?' পরাণ এসে প্রশ্ন করল।

সকলে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। স্ত্রীলোকেরা সরে দাঁড়াল একটু।

'বাড়ী শুদ্ধ এক ফালিও তেনা নাই ? মাস অন্তে তোরা, এই মাইয়া লোকেরা কর কি ?' আরও নানা অশ্লীল বাক্য ছাড়ল পরাণ। তারপর সে বলল, 'শীগগির যা ঐ বাড়ী, চাইয়া নিয়া আয় একফালি কাপড়।' পরাণ দেখিয়ে দিল বড় মিঞার চওড়া দরজাওয়ালা বাড়ী।

ছু তিন জন স্ত্রীলোক এবং পুরুষ ছুটল। অল্প বয়সী স্ত্রীলোক যারা ছিল তারা পালাল পরাণের সুমুখ থেকে।

পরাণ একটা 'বোনাজি' বন্য ওষুধ হাতে ডলে ডলে রকমানের পিঠে ও পাঁজরে লাগায় আর বলে, 'মানুষ মরে আর শালারা খায় মেজবান—ছিন্নি পাইছে জানি !'

বড় বাড়ী কাপড় পাওয়া গেল না। কণ্টোলের বাজার, থাকলেই বা কে কার মৃত্যুকালে দান করে এক ফালি নেকরা ! আরও নাকি ওদের স্বভাব ভাল নয়। ওরা নেয় খায় আবার হিংসা করে বড় মিঞার দৌলত দেখে।

শশিশেখর তার পরণের কাপড় ছিঁড়ে এক ফালি নেকরা দিতে গেলেন কিন্তু ইতিমধ্যেই কাজ সেরে ফেলেছে উর্বশী। রকমানের গোঙানি আর সহ্য হয়নি তার।

'এবেলা দেখি খুব মায়া !' পরাণ তীব্র স্বরে মন্তব্য ক'রে, কলের মত হাত চালিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রকমান যেন একটু সুস্থ হলো। ওকে শুইয়ে রেখে ওরা তিনজন উঠল। আগে পরাণ পিছনে উর্বশী মাঝখানে শশিশেখর।

বাতি জ্বলছে সব ঘরে, আলো পড়েছে গরম ভাতে। ওপরের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাষ্পের কুণ্ডলী।

একজন অতি প্রাচীন বলল, 'যা শুনি তাকি সাচ্চা হইতে পারে ? গোঁসাই, তোমরা আমরা শত্তুর না। শত্তুরেরা তো ছুয়ার খুইলা একটু তেনাও দিল না—মানুষটা মরে !'

সাঁকোর কাছে এসে শশিশেখর বলেন, 'দেখলে তো পরাণ কিসে কি হলো !'

'অমনি হয়—সামান্য একটা আগুনের ফুলকিতেই জ্বইলা যায় একটা গাঁ।'

পরাণের উত্তরটা ঠিক হলো কিনা সেদিকে লক্ষ্য করল না কেউ

সকাল বেলা আশপাশের সকলেই কথাটা শুনল। শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ল যথেষ্ট। এমন নয় যে রকমান কেবল এক পণ্ডিত বাড়ীরই উপকার করে। সামান্য মজুরীর বিনিময় একটি ছেলে ছোকরা সাক্ষীগোপাল চলনদার নিয়ে সে এ বাড়ী ও-বাড়ীর যুবতী বৌ-ঝিদের পর্যন্ত দিয়ে আসে নায়ে করে আত্মীয় কুটুম্ব কাউর বা শ্বশুর বাড়ী।

(চার)

বিচিত্র এই প্রকৃতির নিয়ম—প্রেম তো মরে না।

এত যে ভাঙন তবু তার উঁচু পারের ফাটলের মাঝে মাঝে দেখা যায় রাঙা আভা—আলোর আলপনা প্রভাতী সূর্যের। হয়ত যে ফুল কাল ঝরবে, নীচের দুরন্ত অবর্তে হারিয়ে যাবে অথবা লুপ্ত হবে যার অস্তিত্ব—সে ফুলও হাসে, গন্ধ ছড়ায়, প্রতীক্ষা করে মৌমাছির।

পত্র পড়ে মাধবী উন্মুখ হয়ে থাকে। কতদিন পরে আসছে কিরণ! প্রায় দুই কি আড়াই বছর বাদে। পরীক্ষা তার দেওয়া হয়ে গেছে। পাশও সে করেছে এবং সংগে সংগে খ্যাতিও সে অর্জন করেছে প্রচুর। সে নাকি স্বদেশী করে জেল খেটেছে কিছুদিন। গ্রামে সবাই ধন্য ধন্য করে। যার কোন আত্মীয়ও হয় না, সেও প্রসংশায় পঞ্চমুখ। 'জানো আমাদের গাঁয়ের ছেলে কিরণ।' এসব কথা মাধবী কান পেতে শোনে, মর্ম খুলে তা যেন সংগোপনে তুলে রাখে, অনেকটা দরিদ্রের রত্নের মত। মাধবী লাজুক, তবু সে ভাবুক। এবং ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে পড়ে। তবে, কি যে সব সে ভাবে, তা হয়ত জিজ্ঞাসা করলে গুছিয়ে বলতে পারে না—যেমন বলতে পারেনা সঠিক করে কেউ একটা চমৎকার স্বপ্নের কথা অতি প্রত্যুষে উঠে। মাধবীর এ স্বপ্ন বই কি! স্বপ্ন, রামধনুর মত বিচিত্র সাত রঙে রাঙা।

কিরন আসবে, আজই আসবে, কিন্তু কখন আসবে তা তো মাধবী জানে না। সে কথা লেখেনি কিরণ। আর লিখতে পারেও না, যে দেশে ষ্টীমার ঘাট থেকে অনেকখানি আসতে হয় নদী পথে নৌকায় চড়ে এবং নির্ভর করতে হয় জোয়ার ভাঁটার ওপর।

'যাবি চাঁপা একবার খাল পার?'

'না দিদি, একা একা যেতে ভয় করে।'

'একটা মোয়া দেব মুড়ির।'

'যদি আমাকে এসে কেউ ধরে?' চাঁপা শিউরে চোখ বোজে।

'নারে ধরবে না কেউ—দেব দুটো মোয়া—যা না বিশ্বাস বাড়ীর ওপার দিয়ে।'

ইতিমধ্যে একটি ছোট ছেলে আসে, নাম তার ইসমাইল। সে সমপাঠী চাঁপার। 'একটু দাঁড়াও ইসমাইল, চাঁপা যাবে তোমার সংগে খালপার পর্যন্ত। তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'ঐ দিকে। একটু আগুন দাও বুবু (দিদি) বিড়িটা ধরাই।'

মাধবী আগুন এনে দেয়, একটা মুড়ির মোয়াও দেয় ওর হাতে। ও বড় মিঞা কেরোসিন-ডিলার-সাহেবের এক বর্গাদরের ছেলে। বয়স অল্প, কিন্তু বিড়ি টানে কড়া কড়া। ওকে দেখে মনেই হয় না যে ও অন্য বাড়ীর ভিন্ন সম্প্রদায়ের কেউ। যেন চাঁপাদের অশিক্ষিত জ্ঞাতি গোষ্ঠির একজন।

চাঁপ আর ও চম্পক নগরের কথা বলতে বলতে চলে যায়। সে গল্প ফুরালে পণ্ডিতের কথা ওঠে। ইসমাইল জিজ্ঞাসা করে, 'আজকাল আসেন না কেন গুরুমশাই? ইস্কুল কি আর খুলবে না? কপাট জানালা বেড়া ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে চোরে। গরু বাছুরে গুঁড়ো করল চেয়ার টেবিল বেঞ্চ। এর পর গুরুমশাই এসে করবেন কি?' অবশ্য পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে বলে ইসমাইল দুঃখিত হয় না। একটা সুন্দর সাজান গোছান প্রতিষ্ঠান তো ভেঙে তছনছ হচ্ছে! গ্রামের ছেলে মেয়েদের মিলন মন্দির—হৈ চৈ, হট্টগোল, কাকলির হাটখোলা!

'চাঁপা তুই আর পড়বি নে?'

'পড়ব কার কাছে—গুরু মশাই নাকি চলে যাচ্ছেন হিন্দুস্থানে।'

'কেনরে চাঁপা?'

'জানিনে!' একটা পথের মোড় ঘুরে চাঁপা আবার বলে, 'সব হিন্দুরাই নাকি চলে যাবে ইসমাইল, একে একে আমরাও যাব।'

'কেন?'

'নইলে তোরা নাকি মেরে ফেলবি আমাদের। দিবি ঘর দোর জালিয়ে।'

'এসব কথা কে বলে?' ইসমাইল শক্ত হয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেঁস দিয়ে দাঁড়ায়। নবীন কিশোর যেন একটা সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত জাতির প্রতীক হয়ে প্রশ্ন করে, 'কে বলে এসব চাঁপা?'

'বলে গাঁয়ের সবাই।'

'মিথ্যা কথা—নিষেধ করিস।'

'তাই করব, শোন ইসমাইল—এসব যেন মিথ্যা হয়।'

'আমার নানী কি বলে জানিস? হিন্দু আর মুসলমান, মা আর সন্তান—রাগারাগি ভাগাভাগিতে সুখ হবে না।'

ইসমাইল মনে বড় আঘাত পায়। সে যে চাঁপাকে শুধু ভালবাসে তা নয়, ভালবাসে ওদের বাড়ীর সবাইকে। তাই চেষ্টা যত্ন করে শিখেছে ওদের মত মার্জিত কথা, কিন্তু রুচিটা এখনও সম্পূর্ণ মাজিত করে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে খায় দু একটা বিড়ি।

এমন সময় চাঁপার দৃষ্টি পড়ে বনের দিকে। বেত ঝোপের মাথায় ও কি? বৌ কথা কও পাখী না একটা! নামল নীচে পাখীটা। 'কি খাচ্ছে ভাই?'

ইসমাইল বলল, 'কি জানি।'

'বন-বুখরি—ইসমাইল, বন-বুখরি। আমি জানি ঐ ঝোপের ভিতর একটা গাছ আছে, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করবে না রকমান দাদু। আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম তবে কি আর কারুর পায় ধরে সাধতাম!'

একে তো ইসমাইলের মনটা হয়ে উঠেছিল ভারাক্রান্ত, তাতে আবার চাঁপার এই সুর। সে বলল, 'তুই জ্বালালি চাঁপা, তুই জ্বালালি!' ইসমাইল ঝাড় জংগল ভেদ করে বন-বুখরির সন্ধানে চলল। বাপে তার এখনও হাল চায করে—রোদে পুড়ে বীজ ধান তোলে। ইসমাইলও চাষের মরশুমে ইস্কুলে যায় না। থাকে রোদে জলে বাপের সংগে। শক্ত তার গায়ের চামড়া ও পায়ের তলা। তবু কাঁটায় ঘায়েল করে তাকে। এ বেতের কাঁটা, বিষম ধার। অনেকক্ষণ ব্যর্থ সন্ধান করে ফিরে আসে ইসমাইল। 'কৈ তোর বন-বুখরি? মিছামিছি হয়রাণ করলি।'

একটু অপ্রস্তুত হলো চাঁপা, ওর হাত পায় স্থানে স্থানে সদ্য বিদীর্ণ রক্তাক্ত ক্ষত দেখে। তবু বলল, 'তা হয়েছে কি? তুই না পুরুষ মানুষ!'

ইসমাইল শুধু পুরুষই নয়—বীর পুরুষ। সে বয়সের আন্দাজে অনেক যোয়ান। মারতে পারে বুনো হরিণ, তাড়াতেও পারে বাঘ। আবার ঝঞ্ঝাট, ঝগড়ার ভূঁইতে যেতে পারে তীক্ষ্ণ ল্যাজা নিয়ে। মাঝে মাঝে বাপের অবর্তমানেও জমির 'আইল' নিয়ে বিবাদ হলে সে প্রতিপক্ষকে ছাড়ে না। সেবার সে রহমতকে ল্যাজা দিয়ে কুপিয়ে ছিল আর কি! গত মাসে একটা চিতা বাঘ যে সে মেরেছিল

দলবল জুটিয়ে তা চাঁপাও জানে। কিশোর ইসমাইল যোয়ান বটে, গোঁয়ার নয়, বুদ্ধি রাখে প্রচুর।

'চাঁপা নানী বলে, এসব গুণ্ডা-ষণ্ডার কাজ।'

'কি সব?'

'মানুষ মারা, ঘর পোড়া, কাজইয়া দাংগা করা—যা সব হচ্ছে এখানে ওখানে ঢাকা কলকাতায়।'

'আচ্ছা আমাদের ঘরে যদি কেউ আগুন দিতে আসে?'

'আমরা থাকতে? লাঠি সরকি নিয়ে পড়ব। মরব তবু কেউকে ভিড়তে দেব না।' বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ইসমাইল। বৃদ্ধা নানী ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। তার যেমন শুভ্র কেশ, তেমনি শুভ্র দৃষ্টি। এখনও তার কাছে ঘোলা হয়নি প্রাচীন হিন্দু মুসলিম মিলিত সংস্কৃতি অতি আধুনিক পংকে। সেই মন্ত্রেই দীক্ষা পেয়ে বলিষ্ঠ হয়েছে ইসমাইলের মন।

ঘরে ঘরে যেমন লক্ষ্মী পূজা হয় তেমনি চুরি ডাকাতি পূর্ব বংগের ঘরে ঘরেই লেগে আছে। কৃষ্ণপক্ষ খারাপ বেশী। তবে মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না পক্ষটাও বাদ যায় না। শোনা যায় এ-বাড়ী ও-বাড়ী সিঁধেল চোরের সংবাদ কিন্তু এসব নতুন কিছু নয়। কখন কখন আসে দুর্ধর্ষ ডাকুরা দল বেঁধে। হিন্দু মুসলমান কেউকে তারা রেহাই দেয় না, বিচার করে না নারী শিশুর। তবে ডাকাতিটা হিন্দু বাড়ীই হয় একটু বেশী। এর কারণ সাধারণত তারা অবস্থাপন্ন, জমিদার, তালুকদার, অথবা ব্যবসায়ী।

ইংরেজ আমলের স্থানে স্থানে এক একটা থানা আছে শাসন ও শৃংখলা রক্ষার ঠাট। তিনজন অফিসার তেরজন সিপাহী আর তিনটা বন্দুক। কিন্তু থানার চারপাশে অসংখ্য গ্রাম, অজস্র ছোট বড় খাল, বিল, নদী। বন জংগলেরও অভাব নেই। সেখানে রাহাজানী খুন খারাপি হতে পারে দিন দুপুরে। নদী দেখলে তো হয় আতংক। তারপর যদি শোনা যায় নৃশংস ডাকুর কথা। এর মধ্যেই সুসভ্য মানুষ চলা ফেরা করে। বোঝাই নায়ে মহাজন পালখাটায়, মাঝিরা বৌ-ঝি আরোহী নিয়ে এদিক ওদিক যায়। পরস্পর ভরসা করে পরস্পরকে। হয়ত কোন দূরগামী এক হিন্দু যাত্রী রাত্রি কাটিয়ে গেল এক মুসলমান বাড়ীর দরজায় তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে। এদের প্রচলিত ধারণা ছিল যে, ডাকাতের ঘাটে আশ্রয় নিলেও, সে চোখ ফিরিয়ে তাকায় না সোনা, গয়না, হীরা এমন কি চুনি পান্নার দিকে।

আজ সে বিশ্বাস আর বলতে গেলে নেই—সব নায়কদেরই সমস্ত আশ্বাস মনে হচ্ছে যেন পদ্ম পাতায় জল। ওই দু এক স্থানে টলমল করছে, বাকিটা যেন সব গড়িয়ে গেছে রসাতলে!

ঝগড়াটা কিসের? হিন্দু এবং মুসলিম স্বার্থবাদীদের। প্রতিদ্বন্দ্বীতার তলে তলে রয়েছে ঈঙ্গ-মার্কিণ ষড়যন্ত্র। সেই দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া বিষাক্ত ঘা—সমাজ দেহের সর্বাংগে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উভয় রাষ্ট্রে মরছে নিরীহ। নামকরণ করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। নিষ্ঠুরভাবে একদলকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘুর ওপর—আবার সুবিধা বুঝে টেনে ধরা হচ্ছে বকলেশ, যেন গৃহপালিত কুকুর।

এ বিভ্রান্তি চিরস্থায়ী নয়, কারসাজি এবং ধাপ্পাবাজি ক'দিন টিকতে পারে, কিন্তু সমূহ দিশা হারিয়েছে জনসাধারণ! প্রতিযোগিরা উপ্ত করেছে বীজ শিশু-মনে পর্যন্ত।

রাজনীতি এবং বন-বুথরির কথা ওরা ভুলে গেল কিরণকে দেখে।

কিরণ নিজেদের বাড়ীর দরজায় এসে থামল। 'চাঁপা নাকি? তুই এত বড় হয়েছিস! একেবারে বিয়ের যোগ্য মেয়ে!'

চাঁপা লজ্জিত হয়ে ছুটে পালাল।

'দাঁড়া চাঁপা, শোন, কথা আছে।'

আর কি চাঁপা দাঁড়ায়! সে ছুটে চলল হাওয়ার আগে।

সে যে শুধু বড় হয়েছে এই একমাত্র কারণ নয় পলায়নের—সংবাদটাও মধুর।

'দিদি কিরণ দা এসেছে।'

'কি বললি, কিরণ ঠাকুরপো এসেছে?' বলে ঊর্মিলা বেরিয়ে এলো হাস্য মুখে। সে ইসারা করে মাধবীকে কাছে ডাকল। 'তুই যে কেমন মাধবী!'

কিছুকাল ধরে চললেও সামলান যেত—পল্লীগ্রামে কাপড়ের দুঃখ চলছে আজ ক'বছর ধরে। এখন দুঃখটা দুর্ভিক্ষে দাঁড়িয়েছে। নইলে পূজা পার্বণে যে কাপড় শশিশেখর পেতেন তা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকেও দান করে ফুরাত না। এখন কাপড় কেউ দেয় না, দেয় কাপড়ের কন্‌ট্রোল দর। ঠেকা যেন পুরুতঠাকুরের। তাই আজ মাধবীর পরণে ছেঁড়া শাড়ী।

ঊর্মিলা মাধবীর বৌদি। মাধবী ঊর্মিলার দিকে সকরুণ চোখে তাকাল। এখন মাধবীর নিজের দিকে নজর পড়তেই বড় দীনহীনা মনে হচ্ছে নিজেকে। এতও জোড়া তালি পরণের শাড়ীখানায়!

উর্মিলা মাধবীর হাতে একখানা অতি সাধারণ সাবান দিল, আর দিল একটা পোড়লের খোসা। 'যা, স্নান করে আয় ভাই তাড়াতাড়ি!'

চাঁপা বলল, 'আমিও যাব নাইতে বৌদি।'

'যাও, তুমিও তো ভাই বড় হয়েছ। একটু গিলে হলুদ দেব নাকি?'

এবার চাঁপার অবস্থা যা হয় তা না বলাই ভাল। মাধবীও কম লজ্জা পায় না।

'আহা তুই যে দাঁড়িয়ে রইলি?' উর্মিলা তাড়া দিল মাধবীকে।

'চাঁপা যাবে না?'

'একি সহমরণ নাকি?' বৌদির এ মন্তব্যের পর চাঁপা একেবারে গুম মেরে বসে রইল।

তবু মাধবী ডাকল, 'আয় লো আয়!'

'চাইনে তোদের সাবানের ভাগ নিতে। আমার কিরণ দা এসেছে।'

মাঝে মাঝে কিরণ সত্যিই সাবান আলতা এনে দিত চাঁপাকে। মাধবী আর দু' তিনবার ওকে সাধাসাধি করে চলে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, যাকে সাধা হলো বেশী সেই চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিতে লাগল।

'যত কাঁদ মেয়ে, কিরণ আর তোমাকে বিয়ে করছে না।'

এবার উর্মিলাব গায়ের ওপর শিকারী বিড়ালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল চাঁপা। কাপড় চোপড় চুলের খোপা নিয়ে টানাটানি। কিল চড়ও পড়ল দুতিন গণ্ডা।

জাহ্নবী বেরিয়ে এলেন। 'একি?'

'বিয়ে বসতে চাচ্ছে···দিদির সংগে হিংসা···'বৌদির মুখ চেপে ধরল চাঁপা। 'তবে ঘাটে চল, নইলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।' মুখ ছাড়িয়ে নিল উর্মিলা।

নব বধূ উর্মিলা অনায়াসে চাঁপাকে কোলে নিয়ে ঘাটের দিকে পা বাড়াল। যেতে যেতে তাকে কি যেন বলল, দেখতে দেখতে চাঁপা থামল। সব রাগ গেল জল হয়ে।

মানুষের কারসাজি অতি লোভ ও লাভের জন্য পংগু হয়েছে জীবনযাত্রা। কাপড় নেই, নুন নেই, উগ্র মূল্য হয়েছে চাল ডাল। দুর্ভিক্ষে কৃষাণ কৃষাণী মরেছে। ক্ষয়িষ্ণু একটা সমাজের হাড়ের পাঁজর গুঁড়িয়ে ভিত্তি গেঁথেছে বর্দ্ধিষ্ণু আর একটা সমাজ ব্যসনের গগনস্পর্শী ইমারৎ। স্বাধীনতা এলো তবু ক্রন্দন হাহাকার ফুরাল না। কাঁদছে বাঙলা ও পাঞ্জাব।

কিন্তু তবু প্রেম তো যায়নি। ভাঙনের কোন ফাটল দিয়ে এখনও পাঁপড়ি মেলছে সূর্যমুখী। দিঘির কালো জলে, চারিদিকে তাল তেঁতুল নারকেল সুপারি গাছের পরিবেশে প্রেম এখনও লুকিয়ে আছে। চোখ মেলছে রাঙা শাপলা। শিষ টানছে বুলবুলি। তাই তো আজ রূপকে আরও অপরূপ করে তুলতে গা ধুচ্ছে মাধবী। এরপর পায় পরবে রাঙা আলতা চোখে টানবে সূক্ষ্ম কাজল রেখা। সেমিজ না থাকলেও সামলে পরবে বহুদিনের বাক্সে তোলা নীল শাড়ী।

প্রেম তো যায়নি। ভাঙনের মুখেও সরলা পল্লীবালার প্রেম চিত্তহারিণী। প্রেম শাশ্বত, লুকিয়ে থাকে—প্রতীক্ষা করে অবিরত।

উর্মিলার নীল শাড়ীই পরল মাধবী। একটু ছেঁড়া হলেও অপূর্ব তারতম্য লক্ষিত হলো বর্ণ সমাবেশে। কাঁচ পোকার উজ্জ্বল টিপটির চারিদিক ঘুরিয়ে চন্দনের ঘন বিন্দু দিয়ে সাজিয়ে দিল উর্মিলা। 'অপূর্ব!'

শশিশেখর দেশ ছাড়বেন না। নানা ডামাডোলের কথা দিন রাত শুনছে উর্মিলা। সে চায় কিরণ যখন ওকে বাস্তবিকই ভালবাসত একদিন, তখন এবার নিয়ে যাক না বিয়ে করে। ঐ উপলক্ষে চাঁপাকেও সে এখান থেকে কিছুদিনের জন্য দূরে সরাবে। তারপর সেও তো যুবতী। ভয় থাকলেও সে সংসারের সংহতি ছেড়ে কোথায় যাবে? আপাতত তার কথা ভাবনার বাইরে।

যতটা সম্ভব সেজে-গুজে চাঁপাও খেলতে গেল।

অনেক সময় কাটল তবু কিরণ এলো না। মাধবী ঘর বাইর করতে লাগল। এতক্ষণে তো আসা উচিত ছিল তার। একটা পথের বাঁক না থাকলে তো এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী দেখা যেত। বাঁকেও দোষ করেনি—বাঁকের মুখেই মুখুজ্জেদের বড় বাগান।

অনেকক্ষণ বাদে মাধবী এসে বলল, 'বৌদি।'

'কি লো মাধবী?'

'কিছু না।'

'একটু সুস্থ টুস্থ হয়ে তো আসবে।'

'না না সে কথা বলছে কে? তুমি আছ তোমার কথা নিয়ে।'

'তা ঠিক ভাই, কথাটা আমারই, কিন্তু ব্যথাটা তো তোমার?'

'তুমি ফাজলামি রাখো, নইলে আমি রান্না ঘর ছেড়ে চললাম।'

গত কাল রাত্রে জলে কাদায় হেটে এবং রাত জেগে শশিশেখর বড়ই কাবু হয়ে

পড়েছিলেন। আজ আর তিনি শয্যা ত্যাগ করেননি। তার শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে সবই টের পেয়েছিলেন। একবার মাধবী সুমুখে আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাধু কিরণ যে এখনও এলো না? তার খাওয়ার সময় হয়নি? বাড়ীতে তো কেউ নেই—খাবে কোথায়?'

মাধবীর চোখে জল এলো, সে বললে, 'জানে কে!'

'পূর্ণদার ছেলে, বাড়ী এসেছে, যে কদিন আছে এখানেই শাক ভাত খাবে।'

এবার বারান্দা থেকে ইসমাইল বলল, 'ঠাকুর ভাই সংগে করে চাল এনেছে, তাই চড়িয়েছে একটা পিতলের বড় লোটায়।'

'কি বলে, শুনেছিস মাধবী? এখনও এদেশ সহর হয়নি, ভুলে যাইনি পূর্ণদার উপকার। তিনি কি আমায় একটু ভালবাসতেন!'

শশিশেখর শয্যা ত্যাগ করলেন। মাধবীও ইসমাইলকে ডেকে তাদের কাঁধে ভর করে চললেন কিরণদের বাড়ীর দিকে। কবে কিরণের পিতা পঁচিশটা টাকা ধার দিয়ে আর ফেবত নেননি তাই ভোলেননি শশিশেখর।

শশিশেখর যখন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কিরণদের উঠানে পৌঁছলেন তার আগে সেখানে গাঁয়ের প্রায় সব লোক এসে জমা হয়েছে। খেঁদি, বুঁচি, তিন মাসের আন্না পর্যন্ত এসেছে মায়ের কোলে চড়ে। শশিশেখরকে দেখে সকলে সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। বসতে দিল তাড়াতাড়ি।

ঘর থেকে কিরণ বেরিয়ে দেখল যে একখানা সিঁদুরে মেঘের মত রাঙা মুখ লজ্জায় ফিরে রইল তার দিক থেকে। ঐ মেঘের কোলে যে বিদ্যুৎ থাকতে পারে তা কিরণের ধারণাতীত।

ইতিপূর্বে একটা কিছু আলোচনা হয়ে গেছে। যেন অনেক আশা করে এরা এসে শুনেছে বহু নৈরাশ্যের কাহিনী—এমনি সকলের ম্রিয়মান মুখ। এতক্ষণে ওঠা উচিত ছিল, সকলেরই তো সংসারী কাজ কর্ম দৈনন্দিন অন্ন চিন্তা আছে, কিন্তু তবু অপেক্ষা করেছিল, শেষ পর্যন্ত কিরণ যদি একটুও বলে কোন আশার কথা—অন্ধকারে দুর্যোগে দেখায় কোন আলোর শিখা।

শশিশেখর আসায় সকলেই ভাবল: আলোচনাটা একটা নতুন পর্যায় গতি নেবে, তাই সকলে আবার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। এগিয়ে এলো বুঁচির মাও ভীড় ঠেলে।

শশিশেখর সকলের আশা ভংগ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরণ তুমি যে বাড়ী এসে রান্না চাপালে? এটা কি সহর হয়ে গেছে?'

'না কাকাবাবু তা নয়। তবে কি জানেন সর্বত্র রেশন হয়ে গেছে, চাল ডালের যে অবস্থা। পৃথিবী শুদ্ধ…'কিরণ এসে পায়ের ধুলো নিল শশিশেখরের। তাও যেন অতি কষ্টে। পরণে পায়জামা, নোয়া কঠিন।

'কিরণ পৃথিবী শুদ্ধ তোমরা যে অন্ধকার দেখছ, সে অমাবস্যা এখনও এখানে ঘনায়নি, সহরে চালের রেশন হয়েছে, কিন্তু কুসুমপুরে এখনও চালের কিম্বা মনের রেশন হয়নি। আমরা বেঁচে থাকতে তোমার উচিত হয়নি হাঁড়ি চড়ান।'

উপস্থিত সকলেই কথাটা অনুমোদন করল, 'ঠিক ঠিক।'

তবু কিরণ সকলকে বোঝাতে চাইল এর উপকারিতা। 'দুপুর বেলা যখন তখন কাউর বাড়ীতে যদি কেউ এসে ওঠে…'

তবে বুঝি কষ্ট হয় পটের বিবিদের? সে পটের বিবি তো এখানে নেই কেউ। মনে মনে তর্জমা ক'রে খেঁদির মা হাসল। কিরণ আরও কয়েকটা সুকঠিন আন্তর্জাতিক নজির দেখিয়ে প্রাঞ্জল করতে গিয়ে জটিল করে তুলল সহজ কথাটা। কিন্তু তাতে আরও ঘুলিয়ে অবোধ্য হয়ে উঠল শুধু বক্তব্য।

মাধবী বলল, 'আমাদের এত গায় পড়ে আত্মীয়তা দেখানর দরকার কি বাবা? তুমি তো বুঝতে পারছ না ঐ এক মুঠো চালের আজ সাশ্রয় করে উনি জড়াতে চাচ্ছেন না গ্রামের আর পাঁচজনের সংগে। তুমি চলো, নইলে আমি কিন্তু দাঁড়াব না আর।' বলেই মাধবী একবার দ্বিধাগ্রস্ত পিতার মুখের দিকে চেয়ে হনহন করে চলে গেল।

অনেকদিন বাদে পূর্ণদার ছেলের সংগে দেখা, একটু ভাল মন্দ রান্না হইলেই পূর্ণদা বলতেন, 'বুঝেছ শশি, আজ কিন্তু…'

শশিশেখর অমনি বুঝতেন, বলতেন, 'আজ্ঞে আর বলতে হবে না' সেই পূর্ণদার ছেলেকে কি ফেলে যেতে পারেন বৃদ্ধ মাধবীর মত রাগ হয়ে?

'মাধু আমার চিরদিনই অমনি একটু তেজি, তুমি কিন্তু কিছু মনে কর না কিরণ।'

এমন সময় পরাণ শীল উঠানের ওপর দিয়ে হেটে চলেছে, সংগে সেই ল্যাংপেঙে ছোকরা। পরাণের গাল বোঝাই পান, কাণে একটা আধপোড়া বিড়ি। ময়লা জামাটার তিন তিনটা পকেট বোঝাই ওধুষ-পত্র।

'শোন পরাণ, যাচ্ছ কোথায়?'

'ঠাকুর গোঁসাই আমার খাড়াবার সময় নাই। এক শালা গাছ থিকা পইড়া

আধ মারা হইছে। গেছিল সুপারি চুরি করতে, পড়ছে গাছ ভাইংগা, এখন কয় যে, না, পড়ছি সাঁকো ভাইংগা। মরে তবু কি মিথ্যা কথা ছাড়ে! রকমানেরও কিন্তু অসুখ কম না।'

'বলো কি?'

'বলুম কি! বিহানে চারড্ডি জল-ভাত গাদাইছেন!'

'ভাল।'

এবার পরাণের নজর পড়ল কিরণের দিকে। 'পেন্নাম ছোট গোঁসাই—এ দুঃসময় বাড়ী আইছেন যে? বোঝলাম আপনার প্রাণে একটা মায়া আছে। আপনে জেল খাটছেন দ্যাশের লাইগা, এখন কি গ্রামে না আইসা থাকতে পারেন?

ধন্য পুত্তুর পূণ্য গোঁসাইর কিরণ বাবু নামে
যাঁহার তুল্য নাই রত্ন, দশ সহস্র গ্রামে।

এখন চলি আমি ছোট গোঁসাই। দেখা হইবে সন্ধ্যার পর।' পরাণ কিছুদিন কবিয়ালের দলেও ছিল।

সকলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে পরাণের দিকে। এই লোকটা মুখে যাই বলুক কেউ এসে ডাক দিলে সময় অসময় হিন্দু মুসলমানের বিচার করে না, অমনি উর্দ্ধ-শ্বাসে ছোটে। টাকা পয়সা কেউ বড় একটা দেয় না, আর দিলেও সে না করে না, না দিতে পারলেও সে জোর করে না। সে প্রাণের টানেই যেন ছোটে। দিন নেই, রাত নেই, সকাল সন্ধ্যার বিচার নেই, না আছে জল কাদার জন্য বিরক্তি—যেখানেই মানুষ জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বে অসহায়, হাবুডুবু খাচ্ছে ঝড়ো নদীর উত্তাল তরংগে সেখানেই খেয়ার নাও নিয়ে যেন পরাণ ডাক্তার হাজির। ও যে মানুষকে ভালবেসেছে তাই যত মুমূর্ষুর ও বন্ধু।

শশিশেখর চাঁপাকে ডেকে ভাতের হাঁড়িটা নামাতে বললেন। কিরণকে নির্দেশ দিলেন স্নান করতে যেতে। উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, 'এখানে তোমরা সকলেই উপস্থিত আছ কাল রাত্রে যারা যারা আমার কাছে গিয়েছিলে। তোমরা কি চাও? আশে-পাশের নজির তুলো না—তোমাদের ইচ্ছার কথা বলো।'

এই প্রশ্নের মধ্যেই শশিশেখরের এমন একটা সুদৃঢ় অথচ প্রাঞ্জল উত্তর ছিল যা সকলে জানত তাই এ ওর মুখের দিকে চাওয়া-চাওই করতে লাগল। চারপাশে যেখানেই যা ঘটুক, এখানে যখন প্রত্যক্ষ কিছু অত্যাচার হচ্ছে না তখন ওরাও দেশ

ছাড়বে না। এই দেশের ভিটামাটি জোত জমি ওদের কর্মক্ষেত্র, মর্ম্ম বাঁধা সমাজের একটি মিষ্টি স্থরে। এ সব ফেলে কে চলে যেতে চায় অচেনা অজেনা বহুদূরে ভিন্ন দেশে। তবে একটু ভরসা চায়, চায় একটু নিরাপত্তার আশ্বাস—যা অন্তত দিয়েছিল বিদেশী ইংরাজ। স্বরাজ এসেছে, ওদের বহু কামনার স্বরাজ, মুক্ত হয়েছে ভারতের শৃংখল, তবে কেন ওদের বুকের কাছে একটা প্রচণ্ড ভার ঠেকে? হাটে গঞ্জে অন্য সম্প্রদায়ের দুষ্ট বুদ্ধি লোকের কাছে তুলতে পারে না মাথা? ওরা এই-খানেই থাকবে, কিন্তু ছোট গোঁসাই ওদের কি কছু দিয়ে যাবে না? না হয় তাদের মত যারা শিক্ষিত পয়সাওয়ালা সম্প্রদায় তারাই অর্জন করেছে স্বাধীনতা—ওরা মূর্খ অবোধ পাড়া-প্রতিবেশী তো! ওরা ওদের সংসারের মাস কাপড় ধোয়, উঠানি-মাসকি কামায়, কেউ বা মাজে বাসন পত্তর, কেউ হয়ত জোগায় পূজার ফুল!

ইতিমধ্যে কে একজন লাঠি ঠক ঠক করতে এলো। পিছনে তার দুটি মেয়ে।

কিরণকে দেখে কেঁদে ফেলল বামাচরণ গোপ। সে নাকি ওকে শিশুকালে কোলে-পিঠে করে টেনেছে, বিনা পয়সায় খাইয়েছে অনেক দুধ ঐ যে খাল পারে বাঁধা কাজলী গাই ওর মেয়ের! কারণ শৈশবে নাকি দুধ ছিল না কিরণের মায়ের বুকে। আজ স্বাধীন হয়েছে কিরণ, বামাচরণ আনন্দে গদগদ! এসেছে দুটি বিধবা মেয়েকে নিয়ে, সংগে সেই এক ঘটি দুধ, আর গুটি আষ্টেক চিনি চাঁপা কলা। নিজের চোখ নেই, দেখবে শোভা ও বিভার কাঁচা চোখ দিয়ে। কিরণ স্নান করে স্থন্দর সাজ-গোছ করেই বেরিয়ে ছিল। বামাচরণ জিজ্ঞাসা করল, 'দেখত মা, তোরা একটু ভাল করে মন দিয়ে দেখ, কেমন দেখতে হয়েছে আমার কিরণ বাবু?'

'ভাল।'

শোভা ও বিভা বিধবা হলেও যুবতী। কেমন করে এর বেশী আর বিশ্লেষণ করে বলবে একজন যুবকের রূপ?

না, না, আর একটু ভাল করে দেখ।'

যেমন কিরণ তেমনি শোভা বিভা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

শশিশেখর বলেন, 'স্থন্দর বড়-সড়োটি হয়েছ বামাচরণ। বসো তুমি, স্থির হও।

'বস্থম না গোঁসাই, আমি বস্থম না, একটু গায়ে হাত দিয়া দেখুম।'

'কিরণ একটু এগিয়ে যাও। বুড়োর মন বাসনা পূর্ণ কর—ও তোমায় বাস্তবিকই ভালবাসে।'

কিরণের গায় হাত বুলাতে বুলাতে বামাচরণ গোপ বলে সে এমনি আর এক-

জনকেও ভালবাসত—সে জমিদার বিধুনাথের বড় ছেলে। এখন সেও বোধহয় এত বড় হয়েছে! আছে যেন হিন্দুস্থানেই কোথায়। তারও মায়ের নাকি ব্যাধি ছিল। দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে ওর ঐ কাজলীর মেয়ের! হয়ে ছিল ষোল কলা চাঁদের মত দেখতে সুন্দর এবং কিরণের মতই এমনি নধর।

বামাচরণ দুধের ঘটিটা ও কলা কটা কিরণের হাতে দেয়। 'আশীব্বাদ করি তোমরা সুখী হও।'

বামাচরণ কিছু চায়নি, কিছু পীড়াপীড়ি করেনি, এসেছে শুধু প্রাণের টানে একজন দেশী বিদ্বান বুদ্ধিমান দেশভক্ত যুবা পুরুষকে সাশ্রু অভিনন্দন জানাতে, তবু কেন যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল শশিঠাকুরের মনটা। তাঁর আবার শ্বাস কষ্ট প্রবল হলো। তিনি কিরণ ও ইসমাইলকে ইংগিতে কাছে ডেকে উঠে দাঁড়ালেন। একে একে আজকার মত বিদায় হলো সবাই। গেল যেন নিরাশ হয়েই চলে।

কেন এ নৈরাশ্য, কেন এ হতাশ? কি ওরা প্রত্যাশা করে কিরণের মত লোকের কাছে? কিছুই কেউ বুঝিয়ে বলতে পারে না। ওদের কি কোন দাবী আছে, না ওদের জন্য কোনও দায়িত্ব আছে কিরণের? বোবা হাবার দল এসেছে শুধু জটলা করতে! যুক্তির যেখানে জোর নেই, ভাষার যেখানে তীব্রতা নেই শুধু মর্ম্মের ভাবাবেগের ক্রন্দন তাদের কে শোনে? যুগযুগান্তের ইতিবৃত্ত কাদের শোক দুঃখ নিয়ে রচিত? সে কি কোন ভগ্ন খণ্ডিত জন সমাজের মর্মান্তিক অনুভূতির আলেখ্য? সে যে শুধু তথা কথিত বিরাটেরই হাসি আনন্দ ও শোক-দুঃখেরই সাক্ষ্য—মিচামিছি বুঁচির মা, খেঁদির মার চোখের জল ও হা হুতাশ!

যেতে যেতে বামাচরণ গোপ প্রশ্ন করে, 'কেমন লাগল তোদের মা কিরণবাবুরে?'

'তোমার কেমন লাগল বাবা?'

'মধুর - কি দিব্য হইছে যে কান্তি কমু কি!'

শোভা বিভা জবাব দেয়, 'হয়, সক্কলডি কয় ওনরা নাকি কি পাইছেন। মনের আনন্দে দেহের কান্তি খোলো।'

'তোরা বুঝি জান না নাম বোকা,—তয় আমার কাছে শোন, স্বরাজ।'

'অথ কি বাবা?' .

এবার মহাসমস্যায় পড়ে বামাচরণ। সে তো এতটা তলিয়ে বোঝার অধিকারী নয়!

(চার)

বাড়ী এসে দম সামলাতে শশিশেখরের অনেকক্ষণ কাটল। জাহ্নবী পাখা নিয়ে এলেন। কিরণ একটা টুলে বসল। ইসমাইল ইসারায় জিজ্ঞাসা করল, 'গোঁসাই, বিড়ি খাবেন ?'

কিরণ ধমক দিল।

ইসমাইল থত মত খেয়ে উঠে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পূর্বে শশিশেখর প্রশ্ন করলেন, 'বৌমা মাধু কোথায় ?'

'আমিও তো ভাবছি তাই জিজ্ঞাসা করব, গেছে তো আপনার সংগেই।'

'তারপর বাড়ী ফেরেনি ?'

'না।'

'বড় অভিমানী মেয়ে। ওরে পূর্ণদার ছেলের সংগে কি আমাদের মান অভিমান সাজে ? এই দেখনা বৌমা, রান্না চাপিয়ে ছিল কিরণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি না এসে পারল ?'

কিরণ একটু হাসল, উর্মিলা তার হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। 'এত পরপর ভাব কেন ভাই ? স্বাধীন হয়েছ বুঝি ? আমাদের বাদ দিয়ে কলকাতার বাসিন্দাদের স্বাধীনতা অচল।'

'এর মানে কি বৌদি—সকলেরই আক্ষেপ এবং অসন্তোষ ? সমস্ত বাংলাদেশটা ছারখারে গেলে কিঁ সুখী হতে তোমরা ?'

বুদ্ধিমতী উর্মিলা কথাটা ঘুরিয়ে ফেলে, বলে, 'তোমরা আছ রাজনীতি নিয়ে ? আমি বাংলাভাগের কথা বলছিনে বলি যে আমাদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতা অচল।' একটু চটুল কটাক্ষে চাইল উর্মিলা। 'চিন্তা করে দেখ সত্যি কিনা ?'

'তা হয়ত ঠিক···।'

'তবে অস্বীকার করতে চাইছে যে ?'

'কি যে বলেন !'

'তবে রান্না চাপালে কেন পৃথক হয়ে ?'

কিরণ রহস্যটাকে রহস্যের মত ধরে নিল। 'কেউ কে কি আমরা নিষেধ করি এক বাড়ীতে এসে থাকতে কিম্বা ডাল ভাত রেঁধে দিতে ? দোর তো খোলাই রয়েছে।'

'কিন্তু সকল মিলে হুড়মুড় করে গিয়ে উঠলে কি খুসী হবে ভাই ? তার চেয়ে বরঞ্চ একজনকে নিয়ে যাও, যে তোমার প্রিয়জন ! আমরা অভাজন আমাদের তো স্বর্গেও ঠাঁই নেই।' উর্মিলার কথা কতক সত্য, কতক রূপক, কতক যেন দুর্বোধ্য। বিষ আছে, তাব সংগে যেন বিষাদও রয়েছে। তাই কিরণ নির্জীব হয়ে পড়ে। সমানে সমানে জবাব দিয়ে উঠতে পারে না।

কণ্ট্রোলের বাজার। তবু রাজার মত যত্ন পেল কিরণ। গ্রাম্য শাক-সবজি এবং পুকুরের মাছ দিয়ে নানাবিধ ভোজ্য একটু খেটে খুটে প্রস্তুত করেছে উর্মিলা। টুকরা করেনি ডিম, কাটেন বড় সরপুঁটি মাছটাকে দু ভাগ করে।

কিরণ খেতে বসে অবাক। 'একেবারে সব আস্ত !'

'আমরা ভাই ভাগ করা ভালবাসিনে। ভাগের কথা শুনলে রাগ হয় এদেশী পল্লীগ্রামের সাধারণ লোক। অল্পে যে মন ওঠে না আমাদের। এতো তোমার অজানা নয়।'

কিরণ খেতে খেতে জবাব দেয়। 'ভাগ কি করে সাধে বৌদি, দায় ঠেকে।'

'কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়ে!' শিক্ষিত বিদ্বান পরিবারের মেয়ে এই উর্মিলা, এদের কৃষ্টি সতন্ত্র। এদের বংশের অনেকেই রাজবন্দী নয়ত জেল ফেরত। ঘরের ছেলে মেয়েরা ইস্কুল কলেজে যতটা পড়ুক আর না-ই পড়ুক এদের চিন্তা ভিন্নমুখী। ভাবের কোঠায় যখন আঘাত লাগে তখন এদের ভাষা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, সাধারণের স্তর ঠেলে এরা চলে যায় বহু উর্দ্ধ স্তরে। তাই হঠাৎ কেউ এ আলাপ আলোচনা শুনলে অবাক হয়ে যায়।

উর্মিলা সহসা ভুলে যায় যে কিরণ তাদের অতিথি—সে-ই এনেছে পরম সমাদর করে। উর্মিলার চোখ জোড়া অগ্নি-খচিত হয়ে ওঠে। 'এই লক্ষ লক্ষ পরিবারের মা, ভগ্নী, ঐতিহ্য, সম্পদের কথা তোমরা ভাবলে না, অনায়াসে ভাগ করলে গোটা ভারতটা !'

'এছাড়া উপায় ছিল কি ?' কিরণ জবাব দিল।

পূর্ব বাঙলার অবস্থা দেখে অনুমান করছে পাঞ্জাবের অবস্থা উর্মিলা। নাগর দোলার চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে তার চোখের সুমুখে। অবশ্য পাঞ্জাবের কথা এখন পর্যন্ত তার কানে কিছু আসেনি কিন্তু চিন্তাশীল প্রগতিবাদী গৃহস্থের মেয়ের মানসচক্ষে ফুটে ওঠে এক লোমহর্ষণ দৃশ্য—ভবিষ্যৎটা তার ভাবতে কষ্ট হয় না মোটে—খুন, রাহাজানী, নারীহরণ, গুণ্ডামী চলছে বেপরোয়া ভাবে।

বেছে বেছে ভারতের মস্তিষ্ক ও শক্তির কেন্দ্র দুটোতে ঘা দিতে চলেছে ইংরেজ। তার সংগে তাল দিচ্ছে দেশী সমধর্মীর দল—আর আসর মাতিয়ে রেখেছে গলাবাজি করে তাদেরই পেটোয়া বন্ধুরা—যাদের সংগে কস্মিনকালেও স্বার্থের যোগসূত্র নেই জনসাধারণের। উর্মিলার জেল খাটা পংগু দাদা বারবার এই কথাই তাদের কাছে বলেছে, আজ তা ফলতে চলেছে ভবিষ্যদ্বাণীর মত।

'এ ছাড়া উপায় ছিল কি, বলো দেব আমি ?' উর্মিলার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে কিরণ। 'আমরা বলব না, আমাদের মত শত শত ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা নারীর অশ্রুতে তোমাদের নেতৃত্বের সুখাসন ভেসে যাবে। ঘুম ভাঙবে তখন—দাদার কথাই বলি, যে দাদা আমার জেল খেটে পংগু হয়ে রয়েছে এই ক বছর—যখন সাধারণের মনে ফোনয়ে উঠবে অসন্তোষ। তোমরা গণ-বিপ্লবের কথা চিন্তা কর ?'

'বৌদি আমি তো কংগ্রেসের কেউ নই।'

'শিখেছ বাপুজীর মামুলি বুলি ! বিপাকে পড়লে অমন অমোঘ ওষুধ আর নেই।'

কিরণ ভাত খাওয়া বন্ধ করেছিল। উর্মিলার নজর পড়ল সেইদিকে। সে তাড়াতাড়ি রসনা সংযত করে আবার রহস্যময়ী হয়ে উঠল, 'ওকি ? বাপুজীকে তো আর বলিনি আহার বন্ধ করতে।'

'ঠাট্টা করছ বৌদি ?'

'না ঠাকুরপো তুমি খাও। গ্রামের সবাই যখন তোমার কাছে দরবার করতে এসেছিল তখন ওরা হয়ত ভেবেছিল তুমি কংগ্রেসের প্রতীক একটা হোমরা চোমরা কেউ, কিন্তু শুধু আমি জানি তুমি এখনও আছ আমার সেই ছোট্ট কিরণ ঠাকুরপোটি।'

'তবে অত যে বললে !' কিরণের অন্তর ভিজে উঠল।

'মনের দুঃখে ! সাতে বিষে আমরা হয়েছি রক্ত খেগো আর্জিনা। তুমি খাও ঠাকুরপো খাও, এসব কথা কলকাতা গেলে সহজেই ভুলে যেতে পারবে। তোমার কি ক্ষমতা আছে !'

মুখ নীচু করে নানাবিধ ব্যঞ্জন দিয়ে কিরণ ভাত মেখে নিল। সকলই বিস্বাদ ঠেকছে তার কাছে। বিস্বাদ ঠেকছে এই বিভাগের পরিণাম চিন্তা করে। এর মধ্যেই চীৎকার শোনা যাচ্ছে, এরপর শোনা যাবে হাহাকার। হানাহানি কাটাকাটিও দেখতে হবে দূরে বসে অক্ষম পংগুর মত। ওরা নিত্য নতুন মা ভগ্নীর

ওপর লাঞ্ছনার মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনবে তবু কিছু বলতে পারবে না বন্ধু রাষ্ট্রের খাতিরে, মুখ ভার করবে ইউ, এন, ও—শঠ চক্র শ্বেত বণিকের।

চাঁপা গরম দুধের বাটি নিয়ে প্রবেশ করল, 'এত দুধ আমি খেতে পারব না।'

'খাও ভাই, ও তো আমারা নগদ পয়সায় খরিদ করিনি—একটু বেশী খেলে কারুর ভাগে কম পড়বে না।'

'বাস্তবিক এমন ঘন এতটা দুধ আমাদের কল্পনাতীত। গরু বিয়ান আছে নাকি ?' হাল্কা কথায় এসে কিরণ যেন স্বস্তি বোধ করে। 'না জোগান আছে ?'

'গরুও বিয়োয়নি, জোগানও নেই। শ্বশুর ঠাকুর অসুস্থ হলেই দুধ পাঠায় রকমান।'

'পরাণের মুখে শুনলাম সেও নাকি অসুস্থ।'

'বুকে নাকি চোট লেগেছে, তবু পাঠাল দুধ ! আজ তো ওরই খাওয়া উচিত ছিল। আমরা না হয় রোজের চেষ্টা করতাম। কি যে মানুষ বোঝাই দায় !'

বারান্দা থেকে ইসমাইল বলল, 'পরাণ ডাক্তার তাই বলেছিল, বলেছিল আজ মিঞাকে খেতে, কথা শুনে সে কি রাগ—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কাঁথা মুড়ি দিল। ডাক্তারের সাথে কথা বলে না, তাই তো আমি এলাম দুধ নিয়ে।'

'ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি অমনি ইসমাইল, নিজের হিতাহিতও ভুলে যায় এ বাড়ী কিছু শুনলে।'

কিরণ জিজ্ঞাসা করল, 'চাঁপা তোমার দিদি কোথায় ?'

'বলব কেন ?'

ঊর্মিলা বলল, 'না বলাই তো উচিত। যেটি সামনে আছে, সেইটিরই খোঁজ নেই ! কেন চাঁপাকে কি দেখতে কুচ্ছিৎ, না সাজ-গোছ ওর মন্দ ?'

'ভাল হচ্চে না বৌদি।'

'তবে বল না তোর দিদি কোথায় ? তা হলেই তো তুই খালাস হস বাপু।'

'স্বর্গে'—অর্থাৎ দোতলায়। এদেশের ঘরগুলো প্রায়ই টিনের এবং দোতলাই বেশীর ভাগ।

'একটি বার নেমে আসতে বল অপ্সরীকে মর্তে আর একটু বাদেই ইন্দ্র যে চলে যাবে স্বর্গে।'

কিরণ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল। কিরণ গ্রামের ছেলে হলেও ভাল ছেলে, তাই ঊর্মিলা ও তার স্বামী অনেকদিন থেকে কথাটা পেড়ে রেখেছে কিরণের মার

কাছে। তখন পাশের অজুহাত ছিল। আজ আর তা নেই। কিন্তু এসব শশিশেখর জানতেন না। মাঝে মাঝে ঠাট্টা বিদ্রূপের টুকরো কানে এলে ভাবতেন—এসব নিছক প্রিয়জনের কৌতুক।

কিরণ অন্য কথায় গেল। 'তোমার দাদা আজকাল ও কি তেমনি ,পড়াশুনা করেন ?'

'পংগু মানুষের সে ছাড়া আর গতি কি ?'

পুলিশের নৃশংসতার ওপর একটা ঘৃণা জন্মে কিরণের। এমনি একটি নয়, পূর্ববাঙলার অগণিত মহামূল্যবান প্রাণ ওরা নষ্ট করেছে। ঊর্মিলার দাদা পংগু হয়েছে পুলিশের বেয়নেটের ঘায়ে।

'একটিবার মাত্র দাদাকে দেখেছি বৌদি, তোমার কথা শুনে আবার তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করে। তিনি নমস্য। তাঁর কথা এবং যুক্তি শুনলে গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।'

'এখন তিনি কি বলেন জানো ? বলেন যে, ইসলামের আদর্শ সাম্যবাদ। সেই ইসলাম রাষ্ট্রই যদি হয়ে থাকে তাতে দুঃখিত নয় পূর্ববাঙলার হিন্দু মুসলমান। দুঃখ হচ্ছে তখন যখন একটা মহান আদর্শকে অপব্যাখ্যা করে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা অন্ধ প্রাণবন্ত সম্প্রদায়কে তাদের সংখ্যালঘু প্রতিবেশীর ওপর।'

'তবে কি দাদা পাকিস্তানের শুভ কামনা করেন ? চান না মুসলিম রাষ্ট্রের ধ্বংস ?'

'না।'

'আশ্চর্য ! একমাত্র দাদার যুক্তিই শুনলাম সতন্ত্র। আজ পর্যন্ত কোন হিন্দুর মুখে একথা শুনিনি।'

'শুনবেও না। রাষ্ট্রের আদর্শ নাকি গণতন্ত্র। পাকিস্তানের সে গণমত তো এখনও একেবারে বিষাক্ত হয়নি। বিষাক্ত করতে পারেনি ষণ্ডা-গুণ্ডা এবং স্বৈরাচারী নেতারা।'

'যদি বিষাক্ত হয়েছে বোঝা যায়।'

'তখন এই সমগ্র ভারতের সভ্যতার ও সাম্যের রক্ষক যারা তারা কি বসে থাকবে ? দাদার মত পংগুরাও নাকি লাফিয়ে পড়বে ছদ্মবেশী রাষ্ট্রের মুখস খুলে ফেলতে। সমবেত হবে সাম্যবাদী হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ এ অতি সাধারণ কথা কিরণ, বিভ্রান্তির পাকে চিরদিন কেউ ঘুরবে না।'

'তুমি দেখি মুখস্থ করে রেখেছ বৌদি।'

'যতটা বুঝি আর না-ই বুঝি হিতোপদেশ আবৃত্তিতেও যে লাভ আছে, তাই তো মুখস্থ করেছি।'

উর্মিলার নিষ্ঠা ও গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয় কিরণ। এঁদের মত আত্মীয় পাওয়া মহাসৌভাগ্যের বিষয়। আর কিরণের গর্ববোধ হয় এই ভৌগলিক নাম গোত্রহীন গ্রামটির জন্য, যেখানে ও জন্মেছে, আছে উর্মিলার মত দীপ্তিময়ী মণি-কণিকা।

কিরণ আঁচাতে গিয়ে দেখে যে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাধবী। 'থাক, থাক।'

'না থাকবে কেন?'

'গায় পড়ে আর আত্মীয়তা দেখাতে হবে না।'

মাধবীর মুখে হাসি দেখে কিরণও আর কৃত্রিম গাম্ভীর্য রাখতে পারল না।

উর্মিলা বলল, 'এতক্ষণে গিয়ে বুঝিলাম ইন্দ্র যখন মর্তে অপ্সরী কেন ছিল স্বর্গে! এর মধ্যেই এক পসলা হয়ে গেছে, চোখ ভিজা যে? ধন্য মেয়ে!'

বাইরের বারান্দা থেকে ইসমাইল বলল, 'বুবু দুমদুম করে পা ফেলে ও বাড়ী থেকে চলে এসেছে।'

'কি হয়েছিল কিরণ?'

'তেমন কিছু নয়।'

কিরণ মাধবীকে ভালবাসত সত্য। কিন্তু সে ভালবাসায় তেমন উগ্রতা ছিল না। ছিল একটা সমবয়সী পাড়া-প্রতিবেশীর প্রীতি। ওরা কলকাতায়ই থাকত, মাঝে মাঝে আসত দেশে। কিরণ তখনই সংগলিপ্সু হয়ে উঠত, আবার গ্রাম ছেড়ে সহরে গেলে ভুলে যেত মাধবীর কথা। ঠিক যাকে ভোলা বলে তেমন করে ভুলত না কিরণ তবে এমন কিছু স্পষ্টও থাকত না তার মনে। সহরে গিয়ে সে জনারণ্যে ঝাঁপিতে পড়ত, প্রগতির দুরন্ত আবর্তে সে যেন কোন্ দিক দিয়ে কোন্ দিকে ভেসে যেত! তাকে বড় হতে হবে, পার হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি কোঠাগুলি—সময়েতে সাড়া দিতে হবে দেশের ডাকে। সে নিজেকে যেমন হারিয়ে ফেলত শত আকাংখার ঘূর্ণিপাকে, তেমনি মাধবীর স্মৃতি ও অস্পষ্ট হয়ে আসত ক্রমে।

কিন্তু মাধবী সহরের সহস্র বাসনার স্বাদ পেত না—তাই সে ভুলতে পারত না

কিরণকে। কিরণকে কেন্দ্র-বিন্দুতে রেখে সে বৃত্ত আঁকত বৃহত্তর জীবনের। প্রথম প্রথম সে বৃত্তের তেমন চিহ্ন পড়ত না, কেমন কেমন দেখাত যেন আবছা আবছা। ক্রমে, বয়স বাড়ার সংগে সংগে সে সর্বদাই লক্ষ্য করত বৃত্ত বেশ স্পষ্ট হয়েছে। কেন্দ্রে কিরণ আর তার চারদিকে যেন বৃত্তপথ ধরে নৃত্য করে চলেছে এক অপ্সরী। ঘুরছে তবু তবু ঘুম যেন ভাঙছে না যোগীর। এবার সে ঘুমুর পায় দেবে—নৃত্য করে লুটিয়ে পড়বে ধ্যানমগ্ন মহাকালের পদতলে।

কিরণ বাড়ী এলো; ঠিক তপ-ভাঙা যোগীর মত তো এলো না। কোথায় তার উগ্রতা, কোথায় হাহাকার? আরও সে বলে কিনা রেশনের কথা! বোঝাতে চায় বিশুষ্ক খাদ্য এবং বণ্টন-বিজ্ঞান। তাই মাধবী রাগ করে চলে এসেছিল, বড় অপমান বোধ হয়েছিল তার। যদি কিরণ নিজের ইচ্ছায় এবাড়ীতে না আসত তবে হয়ত মাধবী আর দেখাই করত না ওর সংগে।

কিরণ ওকে প্রীতি চোখে দেখে, আর মাধবী ওকে ভালবাসে।

লেখা পড়ায় কিরণ দিন দিন উন্নতি করছে, মাধবীও তার জন্য কম প্রস্তুত হয়নি। পল্লীগ্রাম, এখানে তো উচ্চ শিক্ষার সুবিধা নেই—সে একটু একটু করে মাধবী কংকণ পড়েছে, বিষবৃক্ষ আনন্দমঠও সে শেষ করেছে, মেঘনাদবধ কাব্য বুঝিয়ে দিয়েছে উর্মিলা। শশিশেখরের পুঁথি পুস্তকের স্তূপ ঘেঁটে কয়েকখানা কাব্য গ্রন্থও সে বের করে অধিকাংশ শ্লোক মুখস্থ করেছে। মাধবী পণ্ডিতের মেয়ে তাই এমনি করে সূর্যমুখী ফুলের মত রয়েছে বিকশিত হয়ে। ঘুরবে পূর্বাচল থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত।

মাধবী ভাবে প্রেমে মধুময়ী।

'একটু বসবে, বিশ্রাম করবে না দুপুর বেলা?'

'না—বিশ্রামের মত বয়স হয়নি এখনও। একটু ঘুরে আসব গ্রামের বাড়ী ক'খানা।'

মাধবী ক্ষুণ্ণ হলো। গ্রামের সেরা আকর্ষণ যেখানে সেখানে মন বসল না, যাবে ঘুরতে। 'যাও, কিন্তু আবার ফিরছ কখন? কিছুই তো জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।'

'কেন, কি জিজ্ঞাসা করবে, কর না।'

রাঙা হয়ে উঠল মাধবী। এমন করে বললে বুঝি জিজ্ঞাসা করা যায়! এই বুঝি আলাপের ধরণ? এতো লজ্জা দেওয়া, জব্দ করা। 'না যাও, সন্ধ্যাবেলা

ঘুরে এসো—চা খাওয়ার সময়। ওবেলা আবার হাঁড়ি চড়িও না বুঝলে?'

'চা খাব, চিনি?'

'অভাব হবে না গৃহস্থের ঘরে। চিনি না পেলে অন্তত গুড়ও তো জুটবে।'

'মিষ্টিটা একটু উগ্র।'

'খাঁটি তো বটে।'

'তাতে আর সন্দেহ কি।'

কিরণ চলে গেল। সে নাকি নিঃসন্দেহ। মাধবীর মনটা যেন উগ্র মধুতে ভরে রইল।

বেশ একখানা বড় কাঁসার থালার চারপাশে গোল হয়ে বসেছে মাধবী উর্মিলা ও চাঁপা। গন্ধরাজ নেবু ও মুশুরীর ডাল দিয়ে ভাত মেখে নিয়েছে ওরা। সুগন্ধে ভুরভুর করছে থালার চারপাশে। 'একটু লংকা হলে ভাল হতো বৌদি।' চাঁপা বলল।

'যা না তুলে নিয়ে আয় ডোয়ার পাশের গাছটা থেকে।'

'আমি দিচ্ছি।'

'ওমা এখনও তুই বসে আছিস ইসমাইল!'

'না, খেয়ে-দেয়ে এসেছি বৌদি।'

'তোর বাড়ীতে কাজ নেই?'

ইসমাইল কয়েকটা লংকা ছুঁড়ে দেয় রান্নাঘরের ভিতর। কাজ নেই মানে? সে সকাল থেকে উঠে গরু বেঁধেছে, একটা 'চাই' পেতেছিল মাছ ধরার জন্য মাঝ-ভূঁইতে, তা খালাস করে এনেছে; সুপারির চারা রুয়েছে সোয়া শ'। এখন বাড়ীতে সবাই ঘুমাচ্ছে ও এসেছে চাঁপার সংগে আয়না মোহর খেলতে।

'তুই পড়িস কখন?'

কোন সময়ই পড়ে না। তবু বলবে, 'রাত্রে।'

'একটু লেখা পড়া শিখিস ইসমাইল, লোকে ভাল বলবে খাতির মহব্বত করবে। জানতে পারবি দেশ বিদেশের নানা কথা।'

চাঁপা তাড়াতাড়ি কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে পুকুরের দিকে ছুটল। মুখ ধুয়ে সে ঝালে শিষাতে শিষাতে বলল, 'কৈ দে তো, কোথায় বন-বুখরি?'

'আজকাল পাকে না ভাই, কোথায় পাব বন-বুখারি।'

'তবে আড়ি আড়ি আড়ি...'

চাঁপা এসে ঘরে উঠল। ইসমাইল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল।

উর্মিলা খেতে বসে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। 'ওকি বৌদি খাও।'

উর্মিলা আসামাত্রই সংসারের যাবতীয় ভার তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ঠাকুর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন জাহ্নবী। মেয়ে তার, কিন্তু চিন্তা উর্মিলার। 'কিরণ গেল কোথায়?

'একটু বেড়াতে।'

না গেলেই ভাল হতো। এখন নিরিবিলিতে তার মনের ভাবটা জানতে পারত। কতদিন থাকবে, কেন হঠাৎ বাড়ী এলো কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি উর্মিলা। রোজ রোজ পরিস্থিতি যেমন গুরুতর হচ্ছে এসময় অন্তত অবিবাহিত মেয়েদের দূরে সরান বোধ হয় ভাল কিন্তু সে সুবিধার অন্তরায় দ্বিবিধ—এক কিরণ হঠাৎ এখন বিয়ে করতে রাজী হয় কিনা? এবং দ্বিতীয়ত বিয়ে হলেও মাধবী পিতার আদর্শ ত্যাগ করে এখন দেশ ছাড়তে চায় কিনা? বাপের চেয়ে মেয়ে কম পোক্ত নয়। যাক, কিরণ বাড়ী যখন এসেছে, দু' চারদিন নিশ্চয় আছে—সময় বুঝে মীমাংসা করা যাবে এসব সমস্যা। জটিল গ্রন্থি ব্যস্ত হলেও শিথিল করা যাবে না এক নিমিষে।'

বাসন-কোসন নিয়ে ঘাটের দিকে নামল উর্মিলা। 'ওকি ইসমাইল কাঁদছিস কেন?'

ইসমাইল কিছু জবাব না দিয়ে ছুটে পালাল।

'এই শোন, শোন ভাই ইসমাইল!' উর্মিলার মনে হলো ওরই একটি ছোট ভাই যেন চাঁপার দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে কেঁদে পালাল। 'চাঁপাটার আর বুদ্ধি হবে কবে!'

সন্ধ্যার পরই আবার ইসমাইল এসে হাজির হল।

উর্মিলা হেসে ফেলল। 'কিরে এর মধ্যেই রাগ জল হয়ে গেল?'

ইসমাইল একটু লজ্জিত হয়ে জবাব দিল, 'তবে ও বারবার আড়ি, আড়ি বলবে কেন? চিমটিই বা কাটবে কেন?' ইসমাইল একটা দাগ দেখিয়ে দিল হাতখানা প্রসারিত করে।

'ওমা মেয়ে মানুষের এত তেজ! কারণে অকারণে রাগ! দাঁড়াও ভাই আমি শাসিয়ে দিচ্ছি ওকে।'

ঊর্মিলার মুখের ভাব দেখে সহসা ইসমাইল বলে, 'এখন তো আর ব্যথা নেই বৌদি।'

মাধবীও এসেছিল, সে হেসে ফেলল বালকের কথা শুনে।

ঊর্মিলা বলল, 'না মাধু হাসি নয়, দিন দিন ও যা হচ্ছে—কেউকে মানুষ বলে গ্রাহ্য নেই—সারা গা ভরা কেবল গনগনানি।'

ইসমাইল গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল, 'একটু বড় হলেই সেরে যাবে।'

এবার ঊর্মিলাও আর না হেসে থাকতে পারল না। সে অনুমানে বুঝল একথা ইসমাইলের নয়। সে বাড়ী গিয়ে বালক সুলভ আর্জি দাখিল করেছে ওর প্রিয়জনদের কাছে। তারা স্ত্রীলোক, কখনও এবাড়ী আসে না, চাঁপাও বড় একটা ওপাড়ায় যায় না—তবু তারা অন্তরালে বসে চাঁপাকে স্নেহ করে। স্নেহের উৎস ব্যতীত, একথার উৎপত্তি অসম্ভব। তাই তো তারা ক্রোধ কিম্বা হিংসার ইন্ধন না জুগিয়ে, রচনা করেছে একটি দরদের বেষ্টনী, যে বেষ্টনী সকলের অলক্ষ্যে চাঁপার জন্যে গড়ে তুলেছে এই কিশোর বালকের মনে প্রণয়ের এক অভিনব দুর্গ প্রাচীর।

একটু বাদে ঊর্মিলা দেখল যে ইসমাইল নেই, কখন জানি চাঁপার ইসারায় চলে গেছে পূবের বারান্দায়, লম্প জ্বালিয়ে বসেছে গিয়ে তাস নিয়ে গোলাম-চোর খেলতে।

চাঁপার কলরব, ইসমাইলের হাসি, সব মিলিয়ে এত বড় রাজনৈতিক দুর্দিনেও ঊর্মিলার মন রসায়িত হয়ে ওঠে। সে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে রান্না ঘরে প্রবেশ করে, এবং অনেকগুলো শক্ত কাজ করে চলে অনায়াসে।

সময় মত না এলেও কিরণ ফিরে আসে গ্রাম ঘুরে সন্ধ্যার পরই। সে এসে মন্তব্য করে যে বড় যেন উৎসাহ দেখছে বৌদির। দিনের বেলা সে যা খেয়েছে, তাই এখনও হজম হয়নি কিন্তু।

'একটু বেশী রাত করেই না হয় খাবে—ব্যস্ত কি?'

'এত জোগাড় দেখলে ব্যস্ত না হলেও, সন্ত্রস্ত না হয়ে উপায় নেই, যার বিরুদ্ধে এ আয়োজন।'

'তুমি তো ভাই শত্রু নও।'

'আমারও তো সেই ধারণা ছিল, কিন্তু যা দেখছি...'

'তাতে সন্দেহ হচ্ছে, না?' ঊর্মিলা থামল।

মাধবী বলতে স্থরু করল, 'অনেকদিন যাতায়াত না থাকলে মহা আপনজনও পর হয়ে যায়।'

'পর হওয়া এবং শত্রু হওয়া কি এক কথা বৌদি? দেখুন গায় পড়ে কেমন ঝগড়া বাঁধাচ্ছে—ইচ্ছা করে শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'আবার মিত্রতা হতেও বেশী সময় লাগবে না। আমি একটু আবডালে যাই।'

এবার মাধবী লজ্জায় এবং কিরণ কৃত্রিম ভয়ে একত্রে, না, না করে ওঠে।

মাধবী বলে, 'তুমি ভারী দুষ্টু বৌদি।'

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর কিরণ বলল যে তার বড্ড ঘুম পেয়েছে। আজ আর নয়—কাল আসবে সকাল বেলাই। বাইরের দিকে চেয়ে সে অস্থির হয়ে পড়ল। এত অন্ধকার চরদিকের ফল বাগানে। সে একা যাবে কি করে বাড়ী? মাঝে মাঝে জোনাকীর আলো ছাড়া একেবারে ঘন কালো কালির তুলি লেপা। দু একটা বাদুড় স্থপারি গাছে ভূতের মত নড়ছে। পোকা মাকড় কীট, পতংগ ধ্বনি তুলেছে মহা হর্ষে। রাত তেমন আর একটা কি হয়েছে, এরই মধ্যে যে-যার দুয়ার বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। এক একটা বিছিন্ন বাড়ী, দুচার ঘর লোক—তার চারপাশে নারকেল স্থপারি বাগ, যেন স্থন্দর বন। তারপর আর একখানা বাড়ী। মাঝে মাঝে আছে ছোট বড় খাল, একেই বলে পূর্ব বাঙলার পল্লীগ্রাম। এখানেও যদি অনুগ্রহ করে চোর ডাকাত না আসে তো তারা কৃপা করে দর্শন দেবে কোথায়? আজকাল আরও ছড়িয়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

এখানে মানুষ বেঁচে থাকে সংঘ ও নিজের শক্তির জোরে। প্রধান যারা তাদের রক্ষা করে রাখে বাড়ীর পাশের অনেকগুলি অপ্রধানেরা। বড়দের ধানের গোলা ধনের সিন্দুক ছোটরা এতকাল ধরে মনে করে এসেছে নিজস্ব। তাই হয়ত বড় বাড়ী ডাকুর মামলা হলে ছোট ছোট বাড়ীর অজস্র হাতিয়ার ও লাঠি ছুটে গেছে নির্বিচারে। জীবন দিয়েও যারা এতকাল রক্ষা করেছে বর্দ্ধিষ্ণুদের মান, তারা কামার কুমার ধোপা নাপিত অপাংক্তেয় চাষী নমশূদ্র ভুঁইমালী। এদের জীবনান্ত ঘটিয়ে, আজ সোনার সিন্দুক গোপনে সরিয়ে চলেছে সবাই স্বাধীন রাজ্যে—প্রধানেরা স্বপ্ন দেখছে স্বর্গের।

কিরণ অন্ধকারের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

মাধবী বলল, 'তবু তো এখন টিপ টিপে বৃষ্টি নেই, পথে ঘাটে কাদা নেই এক হাঁটু। যদি ভাদ্র মাসের আঁধার রাত দেখতে।'

'এর ভিতর থাক কি করে?'

কিরণ সহজ স্বরে কথাটা জিজ্ঞাসা করল বটে, কিন্তু কেমন যেন অনস্বরা ঠেকল মাধবীর কাছে। অসুবিধার মধ্যে যারা থাকে, দিন কাটায়, মাস কাটায়, হয়ত অনেকের জীবন পর্যন্ত কেটে যায়, দোষ কি তাদের? এবং নির্দোষকে খোঁটা দিয়ে কিছু বলা যে কত বড় অন্যায়, এটুকু জ্ঞান অন্তত কিরণের থাকা উচিত। তবু মাধবী সহ্য করে ফেলে আঘাতটা। জবাবটা একটা সহজ রহস্যের পথেই ঘুরিয়ে দেয়। রাত্রির এই নির্জন পরিবেশটা সে সহজে মাটি করতে চায় না। এখন পর্যন্ত তো একান্তে বসে তেমন একটি কথাও হয়নি।

'যাই বা কেমন করে কেউ নিয়ে না গেলে।' মাধবী হাতের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে হাসল।

'ওকি লম্পটাও নিভালে!'

'থাকো না একটু অন্ধকারে, দেখবে যে আঁধারেও আলো আছে। নইলে পল্লীগ্রামের মানুষ পথ চলে কি করে?'

ক্রমে একটু একটু করে সুমুখের পথ ঘাট সত্যই যেন পরিষ্কার হয়ে এলো। আবছা এবং ঝাপসা হলেও স্পষ্টতর হয়ে উঠল বাগানের ভিতর দিয়ে কিরণদের বাড়ীর যাতায়াতের রাস্তা। সুপারি ও নারকেল গাছের বোঝা যাচ্ছে পার্থক্য। কিরণের ভয় ভাঙল—ভাল লাগছে এখন।

'ভাতটা যখন অনুগ্রহ করে এবাড়ীর খেলে, রাতটাও না হয় এ বাড়ীতে কাটিয়ে যাও—তাতে কি জাতটা যাবে?'

'তুমি দেখি কবি হয়েছ? কথায় কথায় মিল, কথায় কথায় ছন্দ।'

'শুনতে যদি ভাল লেগে থাকে, তবে বসো না—সত্যি কবিতা একটা শুনিয়ে দি।'

'ঘর দোর যে খোলা রয়েছে!'

'তাতে হয়েছে কি?'

কিরণের হাত ধরে মাধবী তাকে বারান্দার একটা বেঞ্চে বসাল। নিজে বসল গা ঘেঁষে। মাধবীর কথায় কথায়ই শুধু ছন্দ! আর তার দেহের দোলায়

দোলায় যে ছন্দ উথলে উঠেছে কিরণ তা তো লক্ষ্য করেনি। তবে সে যে নিঃসন্দেহ হয়েছে, সে শুধু কথার পূরণে কথা ?

কিছু সময় পরেই প্রমান পাওয়া গেল যে তা সত্য নয়।

যুবতী নারীর রূপের একটা মোহ আছে, গন্ধ আছে দেহের—সান্নিধ্যে ঘটতে পারে পলকে প্রলয়। পুরুষ আর্ত হয়ে ওঠে, আকুতি জানায়। এই পরিস্থিতির আবার সাহায্য করল কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি। কিরণ মাধবীর একখানা হাত ধরে বলল, 'ভালই লাগছে আজকার অন্ধকার—বাইরে একটু পাতলা হলেও এখানে কেমন গাঢ়।'

'তবে অন্ধকারেরও একটা প্রয়োজন আছে, যে প্রয়োজনটা আলোর তুলনায় এতটুকুও কম নয়—কেমন কিরণদা ?'

'হ্যাঁ আছে বই কি। বিশেষ করে যখন তুমি আমার পাশটিতে বসে রয়েছ।'

মাধবী একটু থরথর করে ওঠে। এতটা ঘনিষ্ঠ মন্তব্য সে কখনও আশা করেনি। তবে কি কিরণ বদলায়নি ? সমস্ত পুরুষের মত ব্যগ্র হয়ে আছে তার উদগ্র বাসনা নিয়ে ? মাধবী নিজেকে এক বিজয়িণী রমণী বলে বোধ করে।

সময় কাটতে থাকে এক কম্প্রমান প্রবাহে।

'এই না ভয় পেয়েছিলে ? এখন আবার সাহস পেলে কোত্থেকে ?'

'তোমার কাছ থেকে। তুমি চল না আমার সংগে।'

'কোথায় ?'

'কলকাতায়।'

'তাও ভাল। আমি ভেবেছিলাম এগিয়ে দিতে—আজকের অন্ধকারটা কাটাতে একত্রে।'

'চিরদিনের জন্যই চল না।'

'কেমন করে ?'

'পালিয়ে।'

'কেন, পালিয়ে যাবে কেন ? নিমিষে রুষ্ট হয়ে দাঁড়ায় মাধবী। খানখান হয়ে যায় যত কাব্য কুহেলী। সুমুখে উদার মুক্ত পথ থাকতে একি কথা ? একি মনবৃত্তি ? না বুঝে বলে ফেলেছে কিরণ ? তাকেও প্রশ্রয় দেবে না মাধবী। ঐ করে করে একটা সাজান গুছান পূর্ব বাঙলার সুন্দর বনেদী সমাজ আজ ভেঙে

চূর্ণ হয়ে গেল। পথ থাকতেও পালাল সবাই ভীরু শৃগালের মত। মাধবীর কাছে কিরণের কথা, রাত্রির ঘনায়মান পূর্বরাগ বিকৃত বিস্বাদ হয়ে ওঠে। 'যাও কিরণদা বাড়ী যাও, কলকাতা আমরা পালাব না। দেখব শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করে। এ সংহতি তো তোমাদেরই গড়া উচিত ছিল। তোমরা……'

'না, না—আমি তা তো বলিনি, এই রাজনীতি…তুমি…'

'তুমি বাড়ী যাও কিরণদা—আমরা মনটা বড় জ্বলেছে। তোমাকে আর বলব কি !'

'একা যাব ?' কিরণের মনে হলো কতগুলো ভূত যেন গাছে এবং কতকগুলি গুণ্ডা যেন ছুরি শানিয়ে পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার গাঢ় হয়ে এলো অন্ধকার।

'ভয় নেই আমি আছি, চলুন সংগে যাব। বাজান পাঠিয়ে দিয়েছে সারা-রাত পাহারা দিতে।

কিরণদের কিছু জমি বর্গা চাষ করে ইসমাইলের বাপ। বর্গা জমির স্বার্থে আজ মায়া হয়েছে মহাজনের ছেলের ওপর। ওরা ভাল থাকলে তবেই না ভাল থাকবে ওদের চাষী বর্গাদ। জমি অল্প তবু মায়া অগাধ। মায়া হিন্দু মহাজন বলে। মুসলমান মহাজন হলে এতদিনে বর্গা ছুটিয়ে নিত। নিজের আর পাঁচখানা জমির সংগে এখানায় জুড়ে দিত হাল। জ্ঞাতি ভাইরা গরীব বাঁচাতে চায় না, চায় খাস দখলে রাখতে সব জমি এই জন্যই হিন্দু ভূস্বামীকে ভালবাসে মুসলিম বর্গাদারেরা।

কিরণ চলে গেল।

মাধবী ভাবল : এরা একবার অসহায়দের জন্য ভাবলও না, পালাল দল বেঁধে। একবার প্রতিরোধও তো মানুষে করে দেখে ! এরা আবার জেল খেটেছে হালকা ঠুনকা দেশোদ্ধারের বুলি আওড়ে !

তবু মাধবী কিরণকে ভালবাসে—এ মাধবীর দুর্বলতা না ভাগ্যের পরিহাস তা মাধবী জানে না।

'ইসমাইল তুই কি আমাদের বাড়ী গিয়েছিলি ?'

'হ্যাঁ ঠাকুর ভাই।'

'ঘর দোর তো খোলা ছিল।'

'তা কি হয়েছে ? আমি তো এতক্ষণ বসেছিলাম। চাঁপা খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি উঠে আপনাদের বাড়ী গেলাম।'

কিরণের চিন্তা, সুটকেশে দামী একটা ঘড়ি ও সোনার একটা আংটি আছে। এ ছাড়া ঘরের ভিতর সাবেকী জিনিষ পত্রের অন্ত নেই। প্রত্যেক সৌখিন গৃহস্থের মত তার বাবা ও মা এমন সব তামা কাঁসা পিতলের জিনিষ জুড়ে ছিলেন, যা এক পুরুষ কেন তিন পুরুষেও গত হবে না। লোহার সিন্ধুক কিনে তাতে করেছেন নাম খোদাই। এখন বেচতে হবে এগুলি। বেচতে হবে যত খাট পালংক আসবাব। নইলে নাকি আর রেল ষ্টীমারে বুক করে নেওয়া যাবে না ভারী মাল। এতদিনের পুরান কলকাতা, ব্যবসা বাণিজ্য অর্থ ও আত্মীয়তার প্রাণ-কেন্দ্র যেন হঠাৎ পর হয়ে গেছে। যেমন এক রক্ত-মাংসের মেয়ে গোত্রান্তর হলে যায় পর ও দূর হয়ে। একি রোয়েদাত্ প্রস্তুত করে দিল র‍্যাডক্লিপ্? কিরণ গাঁয়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে শুনেছে ছেলে টাকা পাঠাচ্ছে, কিন্তু তা ঢাকায় না কোথায় যেন ঘুরছে—উপোষ করছে বাপ, ভাই, পরনির্ভরশীল বিপন্ন আত্মীয়। ঝলমল করছে সহরে উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রাসাদের ভিতর এবং চারপাশ। মন্ত্রীরা ঘুরছে শশব্যস্তে। আর এই অরক্ষিত গ্রামে নিরাপত্তার জন্য কালে ভাদ্রে আসে তুটি একটি পুলিশ। তাও কীটদষ্ট সংকীর্ণচেতা। ওদের কাছে হিন্দু মাত্রেই যেন কাফের। সিপাহী থেকে সালারে সুব্বা পর্যন্ত যেন বিষাক্ত হয়েছে তুষ্টক্ষতে। বিনা দোষে গুরু দণ্ড দিতেও ওরা প্রায়ই দ্বিধা করে না—মানে না কোনও ন্যায়-নীতির শাসন। তবে পংকেও জন্মে পদ্ম, এই তো পরমাশ্চর্য।

পূর্ব বাঙালার হিন্দু অধিবাসীরা যত দূরেই যাক না আয়-রোজগারের খাতিরে তবু পূজা-পার্বণে বাড়ী ফিরে আসত, সভা, সমিতি, বিবাহ, বিলাসে উৎসাহ করে রোশনাই জ্বালাত, বিদেশের টাকা এনে ঢেলে দিত গ্রামের কামলা মজুর মাঝিদের হাতে। পূর্ব বাঙলার হিন্দু অধিবাসীরা কৃষ্টি ও কীর্ত্তির বাহক এবং ধারক ছিল, তাই প্রেম ও প্রীতির চোখে দেখত সবাই, নইলে কি হাজার হাজার ঘর মুসলমানের মধ্যে বাস করতে পারত তু' দশ বিশ-পঞ্চাশ ঘর হিন্দু?

এই দেশের যে ঘর গুলোও আজ বেচতে এসেছে কিরণ তা ভেবে মনটা ভেঙে যায়। এরপর ভদ্রাসন ছেয়ে যাবে জংগলে। পরে এবং চোরে ভোগ করবে ফলের বাগান। শেয়াল ডাকবে দিনের বেলা। আর ওরা থাকবে ভূমিহীন গৃহহীম ভ্রমনকারীর দলের মত। এক একটা বাড়ী তো না যেন ছোট খাট রাজত্ব। সংগে রয়েছে সোনার ধানের তু' এক টুকরা জমি—কারুর বা আছে বছরের খোরাকীর ব্রহ্মত্র নয়ত সম্মান এবং প্রতিপত্তির নিদর্শন মহত্রান। তালুক

মুলুক রয়েছে বহু মধ্য বিত্তের, আছে ওসত তালুক কায়েম কর্ষা। কোনটারই ভরসা রইল না। আর চিহ্ন সইল না গর্ব গৌরব ও ঐতিহ্যের। জোত জমি জায়গীর হলো মূল্যহীন—স্মৃতিহীন হয়ে বেদিয়ার মত একটা সম্প্রদায় আজ ভেসে যাবে, ভাঙন এসেছে দুর্বার—এ বিধাতার ভাঙন হলে সইতে পারত কিরণ, কিন্তু সইতে পারছিল না মানুষের ষড়যন্ত্র বলে। এবং আপশোষ হচ্ছিল তার, যে সে নিজেও যেন নিরপেক্ষ নয় এই চক্রান্তে।

সে সুমুখের ঘাটলা বাঁধন পুকুর থেকে পা ধুয়ে ঘরের বারান্দায় উঠেই যা দেখল তাতে তার হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপতে লাগল। জন পনর সড়কি বল্লমধারী ঝাঁকড়া চুলো এই গাঁট্টা-গোট্টা যোয়ান তার বারান্দায়। যেন গোটা পনর মোষ ফোঁস ফোঁস করছে। তাদের মাঝখানে চণ্ডী মোক্তার—নিকটস্থ একটা বড় গঞ্জের হিন্দু মহাসভার নেতা। দিব্যি লম্বা চওড়া পুরুষ, সাতটা বাঘে খেয়েও ছাড়াতে পারে না।

কিরণ ঘরে উঠতেই তাকে ডেকে একান্তে একটা দুয়ারের আড়ালে নিয়ে গিয়ে চণ্ডী মোক্তার তার হাত জড়িয়ে ধরল। 'রক্ষা কর বাবা।'

ব্যাপার আর কিছু নয়—চণ্ডী মোক্তার দায়গ্রস্ত। এ তার কন্যা দায় বা পিতৃ শ্রাদ্ধের দেনা হলেও সে ভাবত না—ভাবিয়ে তুলেছে ঐ বল্লম সড়কিগুলো। এতদিন সে যে হিন্দু মহাসভার নামে এই নমশূদ্র কৃষকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। পাকিস্তান হতে না হতেই কেন গুটাল সে মহাসভার পাতা পাটি ?

চণ্ডী আগে বলেছিল, 'রক্ষা কর বাবা—' এখন বলল, 'রক্ষা কর ভাইরে, আমি নির্দোষ।'

এত বিপদের মধ্যেও তার মোক্তারী জবাবটি ঠিক আছে।

'সত্যিই তো, আপনি আফিসটা তুলে দিলেন কেন ?'

'কানে ধরে চাবি কেড়ে নিয়েছে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা।' তারপর নাকি চণ্ডী অনেক লেখা লিখি করেছে ওপর ওয়ালাদের কাছে কলকাতায় কিন্তু জবাব আসেনি মোটে।

'এখন কি করতে হবে আমাকে ?' কিরণ অধীর হয়ে পড়ে পিতৃ বন্ধুর কাকুতি মিনতিতে। শত হলেও একজন জন হিতৈষী লোক তো বটে !

'যা আদায় করে সদর আফিসে পাঠান হয়েছে তা আমিই ওদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বুঝিয়ে দেব, তবে এখুনি নয়—আগামী কাল। তুমি জেল খেটেছ বাবা,

তোমার ওপর সকলের একটা আস্থা আছে, তুমি একটু জামিন হও। এমন গোঁয়ারদের কাছেও চাঁদা চাইতে গিয়েছিলাম সৎকাজের জন্য! ঈশ্বর আছেন কিরণ, নিশ্চয় তিনি আছেন—নইলে অপরিনামদর্শিতার ফল এমন হাতে হাতে কেউ কি দেখাতে পারে!' ঐ অল্প সময়ের মধ্যে দুটি গীতার শ্লোকও আওড়ায় ধুরন্ধর মোক্তার। কিরণ গলে জল হয়ে যায়। সে স্যুটকেশ খুলে একটা মোমবাতি জ্বালায়। যারা এসেছে সবাই ওর পরিচিত।

কিরণ বলে, 'আমি জামিন হলাম। কাল দিনের মধ্যে উনি দিয়ে দেবেন, কান্ত সরদার।'

কান্ত সরদার মহা খুশি হয়। 'আপনি হিন্দুর বন্ধু, মহা সদাশয়, আপনাকে কি অবিশ্বাস আছে। ওরা বড় ধাপ্পাবাজ।'

আবার কি একটা কটুক্তি করে বসে বৃদ্ধ পিতৃবন্ধুকে—কিরণ ভিন্ন ডাল ধরে। 'তোমরা এবার কাকে ভোট দিলে? জ্ঞাতি ভাইকে, না—'

'ঐ বিভীষণকে আমরা ভোট দিমু? এত অজ্ঞেয়ান হই নাই!'

কিরণ মনে মনে তুষ্ট হয়। 'তবে দিলে কাকে?'

'দিলাম দল বাইন্ধা আপনাদেরকে—হিন্দুকে।'

'কাকে—কংগ্রেসকে?'

'হ্যাঁ ছোট গোঁসাই কংগ্রেসকে। ওটাতো হিন্দুরই সভা।'

অপর একজন কয়েকটা বড় বড় দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, 'নামটা শুধু খৃষ্টানী আমরা কি কিছু বুঝিনি! ভোটের জন্য টাকা দিতে চাইছিল একশ—ঘুষ, আমারা তা লই নাই।'

কিরণের মুখখানার হাসি মিলিয়ে যায়।

এবার দল বেঁধে সবাই অনুযোগ করল যে তাদের বড় ঠকান ঠকিয়েছে কংগ্রেস। ভাগ না করে ওদের যদি লেলিয়ে দিত শত্রুর ওপর ওরা কি পিছু হটত, না বাবু ভাইয়াদের মত পালিয়ে যেত? পিছন থেকে হাতিয়ার বন্দুক জোটালে ওরাও কম ষণ্ডা নয়, মহিষাসুরের মত বিদীর্ণ করতে পারে পৃথ্বি। শত্রুকে কেমন করে আঘাত হানতে হবে কি কৌশলে, তা তো ওদের দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। ওরা সরল সোজা, প্রয়োজন বোধে দিতে পারে শুধু বুকের রক্ত, ওরাও তো দেশভক্ত, কিন্তু ভাগ করে রেখে গেল কংগ্রেস। "ধম্ম যুদ্ধ কি হইবে না গোঁসাই?'

'তোমরা কাদের মারতে চাও?'

এইবার মুস্কিলে পড়ে সরদারেরা। দেশী মুসলমান ভাইরা তো শত্রু নয়, ইংরাজও এখন আর নেই এদেশে। তবে শত্রু কে? ওরা বোকার মত চাইতে থাকে। সত্যই শত্রু কে?

যে বর্ণচোরা ছদ্মবেশী দলটি দিন দিন প্রবল হচ্ছে এদেশে তার ছদ্মবেশ খুলে পড়ে কিরণের চোখের সুমুখে। এরা সখা নয় হিন্দু মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের —বন্ধুও নয় নিঃস্ব সর্বহারাদের। এরা শিখণ্ডী—মৃত্যুদূত হিন্দু মুসলিম মিলিত কৃষ্টির।

কোন উত্তর না দিতে পেরে কান্ত সরদার দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'কাইল সন্ধ্যায় আসুম আবার, বোঝলেন মোক্তার মশায়? পেন্নাম গোঁসাই।'

ওরা চলে যাওয়ার পর বেশ কিছু সময় ধরে চণ্ডী মোক্তার বিড়ি ফুকল। গুটি চারেক বিড়ি সাবাড় হল। বোধহয় তামাক পেলেই ভাল হত। কিরণ শয্যা প্রস্তুত করতে লাগল। সে আর চণ্ডী মোক্তারের দিকে লক্ষ্য করল না। অনেক সময় বাদে চণ্ডী মোক্তার বলল, 'কিরণ টাকা এক হাজার কি কাল দিতে পারবে বাবা?'

কিরণ সবিস্ময়ে জবাব দিল, 'টাকা, টাকা এক হাজার দেব আমি! এ আপনি বলেন কি?'

'এদের কাছে তুমি এবং আমি উভয়েই দায়ী। একজন কংগ্রেসকর্ম্মী, আর একজন হিন্দুমহাসভা ধর্মী। আমি দেনদার, তুমি জামিনদার। বাবা জীবন একটু বুদ্ধি খরচ করে বুঝে দেখ। টাকা যদি দিতে না পার 'নৌকা প্রস্তুত— মুরুব্বীদের ডোমিনিয়নে চল। আমরা তো সবাইকে হিন্দু রাজত্বে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি, কেবল তোমরাই মানে কংগ্রেস ওয়ালারা তেমন মাথা পাতছ না। মধু খেলে হুলের আঘাতও কল্পনা করতে হয়। সে ছাড়া আমাদের মুরুব্বীদের মধ্যে একজন নাকি হাতে হাত মিলাতে যাচ্ছেন তোমাদের ওপরওয়ালাদের সংগে—আর এরা চাচ্ছে সামান্য দেনার জন্য আমাদের গলা কাটতে, বলতো কি আপশোষ!'

কিরণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেঁয়ে থাকে। মোক্তারী ব্যাখ্যা সহজ সরল যুবকের পক্ষে দুষ্পাচ্য।

চণ্ডী বলে, 'এখন তোমার এ বুঝতে একটু কষ্ট হওয়ারই কথা, কিন্তু স্থান-

মাহাত্ম্যে তা সহজ হয়ে যাবে। নৌকা ঘাটেই রয়েছে, কখন রওনা দিতে চাও বল ?'

কিরণ কোনও জবাব দিতে পারে না।

চণ্ডী মোক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মনে মনে সকরুণ হাসি হাসতে হাসতে। এখনও কিরণ বালক। একটা ভাল চাকরী-বাকরী পাক, অভিজ্ঞতা বাড়ুক, তখন সব কিছু জলের মত বুঝবে।

বাড়ী পৌছে চণ্ডী গৃহিণীকে তাড়া দিল, 'বুঝলে আজই রাত্রে রওনা দিতে চাই।' তারপর সে ভদ্রাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন গাছপালার দিকে চেয়ে রইল ভারাক্রান্ত মনে।

চারদিকে এত আঁধার কেন ? কোন্ পথে তারা পাড়ি জমাল ?

* * * *

ঠিক সেই রাত্রে কান্ত সরদার পথ চলতে চলতে কেবলই সংগীদের পিছনে পড়ে যাচ্ছিল। সে হাটার তাল রাখতে পারছিল না।

এতদিন ঠিক এমন করে ভাবেনি কান্ত সরদার—

কান্ত সরদার প্রাচীন গ্রাম্য চাষী। চাষ-আবাদের সময় সে সাধারণত বিশেষ চিন্তা করে ফসল বোনে। তাই তার 'ফলন' নষ্ট হয় না বরঞ্চ 'বলন' (বৃদ্ধি) হয় মাঝে মাঝে। মামলা মকর্দমার সময় তাকে ডেকে উকিলেরা পরামর্শ করে সূক্ষ্ম জবাবের জন্য। কান্ত সরদারের দৈহিক বলের জন্য যেমন একটা খ্যাতি ছিল তেমনি একটা নামও ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য।

পথ চলতে চলতে আজ কান্তকেও ভাবিয়ে তুলল। সংগীদের সংগে অনেক আলাপ আলোচনা করল, কিন্তু সঠিক সে ধরতে পারল না—

শত্রু কে ?

একবার তার মনে হলো সমগ্র মুসলিম সমাজই শত্রু। আবার মনে হলো, তা নয়, এ হতে পারে না। যদি সত্য হতো তবে এতদিনে একটি হিন্দুরও চিহ্ন থাকত না এদেশে। তা হলে কি শত্রু তার স্বজাতিরা—যারা ছেড়ে যাচ্ছে, তোড়-জোড় করছে দেশ ত্যাগের ? না, না তাও নয়। এত সাধের বাড়ী ঘর, এতকালের পাড়া-পরশী জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ছাড়ছে যারা, তারা ছাড়ছে একটা বিষম দায়ে। সখে নয়, সুখে নয়—ভয়ংকরী ভয় এসেছে কাল বোশেখীর মত কুটিলা

পাখনা মেলে—তার ডানা ঝাপটায় লণ্ডভণ্ড হবে দেশটা। সব স্বজাতিই আর সুবিধাবাদী নয়।

এখন ছিল লাঠির কাজ, কিন্তু সে লাঠি কই ?

আছে, আছে, বাবু ভাইদের হাতে না থাকলেও কান্তর মত প্রাচীন চাষীর হাতে আছে। বিচারের প্রত্যাশায় বা সাহায্যের ভরসায় তারা এ সময় বসে থাকবে না। নিজের মা বোনের জন্য তারা ল'ড়ে, চিন্তা না করেই মরবে।

কিন্তু আঘাত করবে কাকে ?

শত্রু কে ?

ছোট গোঁসাই বাধা দিল, অথচ প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েও তো দিল না! তবে কি সেও সঠিক চেনে না ? ধরতে পারছে না মুখোস পরা শত্রুকে ?

একটা হোচট খেল কান্ত সরদার—'উঃ' !

সংগীরা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হইল ?'

'না কিচ্ছু না।'

ঝড় চালায় যারা তারা তো মেঘের আড়ালে। তাদের গায় চিহ্ন নেই হিন্দু মুসলমান বলে। কান্ত তাদের ঠিক ধরতে পারে না।

আবার একটা হোঁচট খেল কান্ত সরদার। 'উঃ !'

'কি হইল কান্ত সরদার, আবার হইল কি ?'

'না কিচ্ছু নয়—চলো চলো, জোড় কদমে চলো।'

কান্ত সরদারের পায়ের আংগুলের একটা নখই উঠে গেছে, সেদিকে আজ আর তার খেয়াল নেই।

সারা রাত কান্ত ছটফট করল। বাড়ীর সবাই বুঝল ভীষণ ব্যথা। ভোর না হতেই ডাকল পরাণকে। পরাণ এল হরিণ পায় ছুটে।

'ডাক্তার বড় ব্যথা হাত দিও না, কিন্তু আগে বইল্যা লও আমাগো শত্তুর কে ?

কান্তর মুখের দিকে চেয়ে সে যেন পড়তে পারল তার হৃদয়ের কথা। সে যাত্রার দলের বিবেকের মত জবাব দিল, 'শত্তুর, তোমাগো আমাগো শত্তুর ? এই পরাণশীল, হারাণ হালদার, রকমান মিঞা ?'

'ঝোকের মাধায় কান্ত জবাব দিল, 'হয়।'...

'এই গরীব-গরবা চাষা ভূষা যারা আছি এক ঠাশে ?'

'হয় ডাক্তার, হয়।'

'যেমন মাছের শত্তুর জাল, তেমনই গরীবের শত্তুর বড় বড় রাঙা মাকাল—এ কথাই পুরাণ-কেতাবে কয়।' বলে পরাণ এক শ্রেণীর মানুষকে আকারা ইংঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়।

'পরাণ তুমি কিচ্ছু বোঝ না—সাধে তোমারে পাগল বৈদ্য কয়। এখন দেখ দেখ আংগুলডা।' মন্তব্য করে কান্তর বড় ছেলে রাখাল।

পরাণের কথা উপস্থিত আর কেউ না বুঝলেও কান্ত সরদার উদগ্রীব হয়ে শোনে এবং বোঝে। মনে তার কেমন যেন একটা ছাপ পড়ে। পুরান দুনিয়াটা যেন পলকে পালটে যায়। সে স্বরূপ চেনে সকলের।

মুখের দিকে চেয়ে রাখাল অস্থির হয়ে ওঠে। 'বাবা আংগুলডা কি বড় টাটায় ?'

কান্ত বলে, 'চুপ কর বলদডা, বুক আমার জ্বইল্যা যায়।'

রাখাল পাখা খুঁজতে থাকে। আর বিশেষ কোনও কথা হয় না। পরাণ ঘাটা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দেয়।

(৬)

ইতিহাস ভাঙছে, দুর্বল সবলের ওপর অত্যাচার করছে, স্নায়ু যুদ্ধ হচ্ছে বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে তবু সূর্য উঠছে, আলোর আবর্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে।

প্রতিদিনের মত আজও সকালে উঠছে মাধবী, কিন্তু বিছানা ছেড়ে তার উঠতে ইচ্ছা করছে না। বড় শ্লথ বোধ হচ্ছে শরীর। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। অনেকবার উঠে উঠে অসুস্থ পিতার কাছে যেতে হয়েছে। শশিশেখরের রোগ মনে হচ্ছে যেন একটু একটু করে বাড়ছে দিন দিন। মাধবীর এ অবসাদের আর একটা কারণ ছিল এবং সেইটার ক্রিয়া বোধ হয় তীক্ষ্ণতম—অবশ্য সে তা স্বীকার করে না। স্বীকার না করলেও আঘাতের একটা ব্যথা আছেই এবং তা মনের ওপর ধীরে ধীরে বিষ ছড়ায়। বিষটা হয়ত অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয় তবু তা বিষ—মানুষের মনের বিষ, দ্বন্দ্বের বিষ—চির পরিচিত হলাহলের চাইতে ঢের উগ্র। তাই মাধবীর শ্লথ বোধ হচ্ছে সর্ব শরীর।

শুয়ে শুয়ে সে দেখল, মুক্ত জানালার পথ দিয়ে দূরে ইসমাইলদের ঝাঁকড়া বাঁশ বাগানের ওপর উঁকি মারছে প্রভাতী সূর্য। শিশিরে ভিজে গাছ পালা ঝলমল করছে—খুশি মনে উড়ে গেল এক ঝাঁক শাদা পায়রা। একটা ছাতিম

গাছ থেকে ডেকে উঠল বিবহী ঘুঘু। বাড়ীর স্বমুখেই এক খণ্ড জমি। জমির বুক চিরে একটা সোঁতা খাল। গেছে, ধান বনের মধ্যে পথ হারিয়ে। তার বুকে এক জোড়া বুনো হাস তরতরিয়ে সাঁতার কাটছে। কখনও বা সোহাগ করছে একে অপরের গায় জল ছড়িয়ে। তাদের পাখনার পালক মাঝে মাঝে ঝিলমিল করে উঠছে রোদে। সকলি আনন্দময়—শুধু আনন্দ নেই মানুষের মনে—বিশেষ করে মাধবীর মনে। কেন সে ভালবেসেছিল কিরণকে? চুপে চুপে সংগোপনে কেন আত্ম-নিবেদন করেছিল এই ভীরুকে? মাধবীর চোখে জল এলো। জল এলো এইজন্য—নারী কখনও কামনা করে না বালকের ভীরু সভ্যতা। সে চায় শার্দুলের বন্য বর্বরতা, যে আশ্রয় দিয়ে রুখতে পারবে শত্রুকে—যে ছিন্ন ভিন্ন করতে পারবে ঘোর বিঘ্ন।

ভালবাসা তো জলের আলপনা নয়—কল্পনাও নয় শৈশবের,—মাধবী নিজেকে মাতা বসুন্ধরার মত বিলিয়ে দিয়েছে, নইলে আজ এমন করে তার বুকে শিকড় মেলতে পারত না কিরণ। একটু কম্পণেই শোনা যেত না তার মর্মস্থলে ক্রন্দন। তবু তাকে সে আর প্রশ্রয় দেবে না? বাড়াতে দেবে না দাহ। কিরণ যাক তার যেখানে খুশি চলে।

কিন্তু ইসমাইল যখন সত্যি সত্যিই এসে জানাল যে ঠাকুর ভাই হঠাৎ গত রাত্রে চলে গেছে চণ্ডী মোক্তারের সংগে ঘরে তালাচাবি দিয়ে তখন মাধবীর অমন মুখখানাও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ছুটে এসে উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কি বললি ইসমাইল কি?'

'ঠাকুর ভাই চলে গেছে বৌদি—এই তো আমি নদীর পার থেকে ফিরছি।'

উর্মিলা সব ভাল করে শুনল, ইসমাইলের পায় নদীব চরের কাদা দেখল, তবু ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল বিহ্বলের মত।

মাধবী উঠে এসে বলল, 'বৌদি তুমি অমন করছ কেন? ভীরু যারা তারা আত্মীয় বন্ধুকে এমনি করেই অতর্কিতে বিপদের মুখে ফেলে পালায়।'

'তা তো বুঝলাম মাধু, তা তো বুঝলাম ভাই···কিন্তু···'

তখন ওপরের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে শশিশেখর তাঁর কক্ষে বসে জাহ্নবীকে বলছিলেন 'কিন্তু ঈশ্বর আছেন।'

সংবাদটা রূঢ় হলেও সকলে অনিবার্য বলে গ্রহণ করে যে যার সংসারী কাজে চলে গেল। শুধু ঘরে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করে মাধবী আবার শুয়ে রইল।

রকমানের অসুখও কমছে না—প্রত্যহই যেন জরটা বাড়ছে। পরাণ এসে শশিশেখরের পাশে বসল। খবরটা কি ভাবে তাঁর কাছে বলবে তাই সে ভাবছিল। এমন সময় উর্বশী এলো পণ্ডিত বাবাকে দেখতে। 'পরাণ খবর কি মিঞা ভাইয়ের ?'

পরাণ মুখে হাত দিয়ে ইসারায় চুপ করতে বলল উর্বশীকে।

শশিশেখর বললেন, 'বল বল পরাণ আমরা পণ্ডিত—আমরা মায়ামুক্ত—সব কথাই শুনতে প্রস্তুত।' তারপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বললেন, 'মা এসেছে বুঝি ? তাকে ঘরে আসতে বল।'

পরাণ এবং জাহ্নবী এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

শশিশেখর চোখ বুজে শুয়েছিলেন, বললেন, 'আমি বিকারের ঘোরে কিছু বলছিনে—ওকে ঘরে আসতে বল, মন থেকে হুকুম দাও জাহ্নবী। আমরা বড় বিপন্ন সমবেত হতে হবে সবাইকে, তাকি তোমরা চিন্তা কর না ?' তারপর একটু থেমে ফের বলতে লাগলেন, 'পরাণ আমি সব বুঝেছি, অসুখ বেশী হলেও মরবে না ঐ রকমান—অমন পরোপকারী মরতে পারে না। এ গাঁয়ের ও যে বান্ধব।'

কুসুমপুরের বন্ধু রকমান, কিন্তু এমন বন্ধু প্রত্যেক গাঁয়ে এক আধ জন আছে নইলে হিন্দুরা কিছুতেই বসবাস করতে পারত না এদেশে। 'জলের বল মাছ, মাছের বল জল' কথায় কথায় এ নজিরটা দেখায় এদেশের সকলে। এবং সেই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এদেশের সমাজ গড়া। নইলে হিন্দু নাপিত কামাত না মুসলমান পাড়া। নমশূদ্র ছুতার মিস্ত্রি তুলত না বড় বড় সৌখিন ঘর—যে সব ঘরের প্রধান দরজায় নক্সা আঁকা মক্কার মিনার এবং গম্বুজের। ঠিক তেমনি মুসলমানরাও যদি সহায়তা না করত তবে এত ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ত না, বিনা চাষে খিল পড়ে থাকত উর্বর জমি, বন্ধ্যা হত নারকেল সুপারিগাছ কামলা মজুরের অভাবে। হিন্দু মুসলমান অনেক দেশেই আছে—এখানে যেন জড়িয়ে গেছে অর্থে স্বার্থে কোথায়ও বা সুদুর্লভ প্রেমে।

সহরে বন্দরে এই তো সবে ঘুণ ধরেছে এখনও বসতে পারেনি কীট মর্মে। সবুজ মন হঠাৎ অবুঝ হয়েছে—যত্ন করলে ফিরান যায় সহজে। সাম্যবাদ যাদের ধর্মের সোপান, তারা কতকাল চালাতে পারে কসাই-এর ছুরি ? নব যোয়ান, নব আজাদী নিশ্চয় আসবে।

বাইরে থেকে জাহ্নবীর এবং ঘরের অন্যান্য সকলের মনের অবস্থাটা যেন বুঝল উর্বশী। তার কাপড় পরিষ্কার নয় বলে সে বাইরে থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেল।

শশিশেখর একটু ম্লান হেসে মন্তব্য করলেন, 'দেখলে তো, মা আমার কেমন অন্তর্যামী, নিশ্চয় করে আমি বলতে পারি কাপড় ওর ময়লা নয়, ময়লা আমাদের মন।'

পরাণ ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে উঠে পড়ল। শশিশেখরের হাতের অবস্থা সে ভাল মনে করল না। এ রোগী যখন তখন হার্টফেল করতে পারে।

ইতিপূর্বে—এই গতকালই কিরণ দেশে আসায় অনেকখানি সবলতা বোধ করেছিলেন বৃদ্ধ। তিনি আশা করেছিলেন, কিরণ একবার যখন গ্রামে এসেছে তখন ওকে কিছু দিন ধরে রেখে একটা বুদ্ধি পরামর্শ করে চেষ্টা করবেন ভীত গ্রাম বাসীর মনে নতুন একটা চেতনা ও প্রেরণা জাগাতে। অল্পে যারা ভীত হয়, সহজে তাদের সবল করা যায়—তবে কিরণের মত মাধ্যমকে কাজে লাগাতে পারলে ভালো হত। এমনি আরো বহু পরামর্শ হয়েছে পরাণের সংগে।

কিরণ হঠাৎ চলে যাওয়ার ধাক্কাটাই যেন প্রবল হয়েছে। এই ভাঙন ধরল কুসুমপুরে।

(৭)

মাধব যদিও দেশ ত্যাগের সংকল্প করে শশিশেখরের বাড়ী ছাড়ল তবুও পরের দিন একবার অতি কষ্ট করে শশিশেখর তার বাড়ী গিয়েছিলেন এবং তাকে ও তার স্ত্রী কন্যাকে এর কুফল বুঝিয়ে এসেছিলেন। ফেরার মুখে তিনি বলে এসেছিলেন, 'যখন লোকে বলে যে আর গত্যন্তর নেই, তখনও প্রকৃত গতির একটা পথ থাকে কিন্তু সাহসের অভাব এবং দুর্বলতার জন্য সে পথ সে ত্যাগ করে। কাজ যা করবে তা ভেবেই করো ভাই, নইলে পরে পস্তাবে।'

দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ল মাধব। তখন সে চিন্তা করল, আজকাল সভ্যতার হৃদপিণ্ড সহর। সে একবার সহরে গিয়ে বিষয়টা বুঝে আসবে। সদর মহকুমা আর কতদূর।

সদরে গিয়ে সবে মাত্র সে চৌমাথায় পা দিয়েছে অমনি কানাঘুষা শুনল যে রাজেশ্বর চৌধুরী নাকি মারা গেছেন গত রাত্রে। কিন্তু এখনও শবদাহের কোন ব্যবস্থা হয়নি। রাজেশ্বর ছিলেন একজন নামজাদা কংগ্রেস কর্মী। উনিশ শ' পাঁচের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি হিসাব করলে বহুবার জেল খেটেছেন ও নির্যাতন সয়েছেন দেশ এবং দশের মংগলের জন্য। তাই তাঁকে এদেশের না চিনত কে! গতকল্য রাত্রে মারা গেছেন, এখন শব নিয়ে হয়েছে মহা বিপদ। কেমন করে নিয়ে যাবে শ্মশানে? যেমন নেই জনবল, তেমনি নেই কোনও পরওয়ানা। অবশ্য শবদাহের সরকারী কোন পরওয়ানার ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি পাকিস্তানে, কিন্তু বেসরকারী একটা হুকুম নেওয়ার দরকার ভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এত রাত্রে তা নেবে কে? অনেক চেষ্টার পর কয়েকজন বৃদ্ধ এলেন। তাঁরা বললেন 'হরিধ্বনি' দিও না—বন্দেমাতরমের কথা আপাতত ভুলে যাও, শুধু মূক মিছিল করে একটু সদরের বড় রাস্তা কটা ঘুরে যদি শ্মশানে যেতে পার তবেই যথেষ্ট। আর পতাকা কটা গুটিয়ে শুধু ডাণ্ডা কখানা উচিয়ে রেখো।'

কে যেন বলল, 'রাত্রে তো হুকুম পাওয়া না গেলে মড়া যে বাসি হবে।'

'আরে দেখত বোকার কথা—মড়া আবার তাজা হয় নাকি সদ্য পোড়ালে?'

জটলা করতে করতে ভোর হল, বেলাও বাড়ল খানিকটা। অবশেষে কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর সাহায্য নেওয়া স্থির হল।

অতি মিনতি পূর্ণ নরম কটি প্রার্থনা—এগিয়ে এল আশ পাশের মিঞারা। তারা মূক মিছিলের সংগে আশ্চর্য সহানুভূতি দেখাল। সামান্য কটি মাত্র হিন্দু শুধু পায়ে শবাধার বহন করছে। এত বড় ব্যথা ও বিয়োগের আর কোন নিদর্শন নেই। কোথায় মিছিল, যান বাহন অগণিত, ব্যথাতুর স্ত্রী পুরুষ নরনারীর সমাগমই বা কই? মৃত্যুর শোকের ছায়ার ওপর যেন কি একটা মরণাধিক কৃষ্ণ যবনিকা নেমে এসেছে।

মাধব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

শব বাহকদের পিছনে চলেছে পাড়ার সব মুসলমান নেতারা। স্থির ধীর গতি তাদের, কিন্তু চোখে সন্ত্রাসের চাহনি। তারাও যেন কতকটা তটস্থ উচ্ছৃঙ্খল উগ্রপন্থীদের ভয়ে। ভদ্র চিরদিনই অভদ্রর আশংকায় এমনি শশংক।

মাধব সব দেখল—হিন্দুর শব যাচ্ছে, কিন্তু হরিধ্বনি দেওয়া যাচ্ছে না। একজন দেশপ্রিয় কংগ্রেস নেতা হলেও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে কেউ সাহস পাচ্ছে না—একি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি !

এমনি একজনের শবাধার বহনকারী জনতা দেখেছিল মাধব অনেকদিন পূর্বে কেওড়াতলা। লোকে লোকারণ্য, মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি—সবই তার মনে আছে। সে অনুচ্চকণ্ঠে বলল, 'ত্রাহি মধুসূদন।' তারপর এক দোকানীর কাছ থেকে এক পয়সার বিড়ি কিনে নিল। দোকানী চেয়েছিল শববাহীদের দিকে। সেও যেমন পয়সা নিতে ভুলে গেল, তেমনি মাধবেরও হল পয়সা দিতে ভুল। ঝাণ্ডাগুলির মিছামিছি ডাণ্ডা খাড়া রাখার অর্থ মাধব মনে মনে সমস্ত ন্যায় শাস্ত্রের পাতা ঘেটেও পেল না। সে ওখান থেকে চলে এলো।

এরপর মাধব সহরময় বিহ্বলের মত ঘুরে বেড়াল। একজন হিন্দু দেখা যায় কি না যায়, একশজন মুসলমান। হিন্দু পাড়াগুলো যেন এই দিন দুপুরে খাঁখাঁ করছে। কেউ যে বেঁচে আছে, তাই বোঝা কঠিন। সে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

দুপুর বেলা মাধবের মনে পড়ল যে বিড়ির পয়সাটা দেওয়া হয়নি ;—সে ফিরে গেল সদর রাস্তায়। দোকানী তখন দোকান বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেছে। আশপাশের দোকানগুলোতেও তালা দেওয়া। কেবল একখানায় একজন লোক ছিল—বৃদ্ধ মুসলমান। দাড়ি গোঁফগুলো তার ধবধবে শাদা।

'এই বিড়ির দোকানী গেল কোথায় ?'

'কেন ?'

'একটা পয়সা পেত, আমি ··'

'শোধ দিতে হইলে হিন্দুস্তানে যান—দোকানী মশয়, এই কতক্ষণ হয় দোকান বেইচ্যা গেছে কেরামত আলীর কাছে। আর আপনেও তো যাইবেনই একদিন —চিন্তা কি, বন্ধুর সাথে দেখা হইবেই পথে ঘাটে। তখন দেনাডা না হয় শোধ কইর্যা দেবেন।'

'এর মধ্যেই দোকান বেচল—বলেন কি সাহেব !'

উত্তরে দোকানী বলল, 'এ তো দেখলেন একখান—এই সহরের পট্টিকে পট্টি দোকান খালি হইল এই এক হপ্তায়। বড় বড় মহাজনেরা সব হাত গুটাইছে,

কাঁসা পট্টি নিঝুম—এই সারি বন্ধী দোকানগুলা মশয়রা বেইচ্যা গেছে জলের দরে !'

'সব চলে গেছে ?'

'হয়।' বৃদ্ধ, মাধবকে বসতে বলে দোকানের একপাশে। 'একটা বিড়ি খাইবেন ?'

মাধব ইতস্তত করতে থাকে।

'ভয় নাই, এ বিড়িতে বিষ নাই। কিন্তু কন্ দেখি ঠাকুর ভাই এ হইল কি ? উকুনের ভয়তে যদি আপনারা মাথা মুড়ান, চোরে উপর গোসা কইর‍্যা যদি মাটিতে ভাত খান—সে তো মাইগ্যা রাগ, তার জন্য কি দায়ী এই দেশী আমাগো মত গরীব মুসলমানরা ?' তারপর সে সত্য সত্যই দুঃখ করল যত প্রতিবেশী হিন্দু দোকানদারদের জন্য। ওরা যে হিন্দু ছিল সে কথা বড় নয়, বড় ছিল ওদের প্রাণ, মধুর ছিল ওদের সৌহার্দ। মিঞার ছোট দোকান, কত লেন-দেনের দায় যে উদ্ধার করছে ওরা !

'শুনলাম নাকি এমনি বিত্ত পসার বেচে অনেক মুসলমানও আসছে হিন্দুস্থানে ছেড়ে ?'

'হয় ঠাকুর ভাই, কথাডা সত্য। আপনাগো মধ্যেও যেমন পাগল আছে, আমাগো মধ্যেও তেমন আছে। না হইলে কি বাপ দাদারা বিত্ত—এই জমি জায়গা ক্ষেত খামার দোকান পসার কবলা দিয়া উদ্বাস্তু হইয়া আয় ?'

তবে হিন্দুস্থানেও একই সমস্যা ! একই জটিল চক্রান্ত ! বিভ্রান্ত হয়ে যায় মাধব। সামান্য ভৌগলিক সীমারেখার একি নিষ্পেষণ ? নেতারা একি করলেন ? ভাগ্যের জন্য ভুগে মরবে জনসাধারণ ? হিন্দু নেতাদেরও তো গর্ব করার মত কিছু নেই। তবে কি উভয় সম্প্রদায়ের কর্তাদের শুধু মুখোস আলাদা, স্বরূপ এক ? গৃহহারা স্বজনহারা করল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ? এ ব্যর্থ স্বাধীনতার অর্থ কি ?

'হিন্দু অফিসার মুসলমান দারোগা পুলিশ জমাদ্দারও অদল-বদল হইতে আছে—গেছেও নাকি ইতিমধ্যে কতক চইল্যা।'

'কেন ?'

'কেন আবার কি—আমরা স্বাধীন হইছি, ভাই-বন্দু-পাড়া-প্রিতিবেশীরে শত্তুর বইল্যা চিনছি। আমাগো কেরামত বাড়ছে কত !' দোকানী গায়ের জ্বালায়

একটা ঝাড়ন দিয়ে এমন করে ঝাড় দিতে লাগল যে স্বাধীনতাটা যদি বস্তু পদবাচ্য হত তবে আর রক্ষা ছিল না।

কথা বলতে বলতে আরও দেরী হয়। বেলা শেষ প্রহর। এতক্ষণ সহরটা যেন নিস্তব্ধ ছিল। এত লোকজন গেল কোথায়? অফিস আদালতে তেমন ভীড় নেই উকিল, মক্কেল, মহুরী, কর্মচারীর—না আছে তেমন যানবাহন গাড়ী ঘোড়ার চলাচল।

হঠাৎ সরগরম হয়ে উঠল সব। সাইকেল রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী, মাঝে মাঝে চলতে আরম্ভ করল মোটর। যাচ্ছে সব একই দিকে—কলকাতাগামী জাহাজের দিকে। যেন একটা জলস্রোত বয়ে চলেছে। এমনভাবে দেশ ছাড়লে আর সহর বন্দর গ্রাম খালি হতে কদিন?

মাধব উঠে আহারের চেষ্টায় গেল। যাবে এক পরিচিত উড়িয়া হোটেলে। স্নান করে আহ্নিকের কাজটা সেরে নিল এক পুকুর পাড়ে বসে। ইষ্ট মন্ত্র জপে আজ আর তার তেমন মন বসল না। ক্ষুৎ-পিপাসার চাইতেও তাকে কাতর করেছে নানা চিন্তায়। সে যাবে কি যাবে না দেশ ছেড়ে? যুক্তির দিক দিয়ে যাকে একেবারে অস্বীকার করা যায়, উদাহরণের দিক দিয়ে তা অকাট্য বলে মনে হয়। এ তো বড় বিষম সমস্যা!

সে হোটেল পট্টি গিয়ে দেখল যে প্রায় পনরখানা হোটেলই বন্ধ। এখন সে ক্ষুধায়ও বেশ খানিকটা কাতর হয়েছে। যাবে কোন দিকে? তার পরিচিত হোটেলখানা ঐ তো খোলা রয়েছে। কিন্তু হিন্দু পাচকের বদলে যে পরিবেশন করছে মুসলমান বাবুর্চি!

আরও কি দেখা লাগে,—এখানে এ অবস্থায় একজন ব্রাহ্মণকে দেখে হঠাৎ ওরা কি মন্তব্য করে, ভয়ে পিছিয়ে এলো মাধব। পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ মিষ্টি হলেও তার সর্বদেহ রি-রি করে উঠল। মিছিল থেকে ওই হোটেল পর্যন্ত এক সংগে সব কথা তার মনের ওপর গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল। সে ভাবল, আর নয়; সে যা দেখেছে তাতেই যথেষ্ট হয়েছে।

সে নদীর পারের রাস্তা ধরল। নৌকা ভাড়া করে বাড়ী যাবে।

পথে এক অপরিচিতের সংগে দেখা। 'শুনেছেন মশায় আজ থেকে Payment বন্ধ করল বড় ব্যাংকটি। আর তিন চারটে দু একদিনের *মধ্যেই লালবাতি জ্বালবে—বলুন তো আমরা এদেশ না ছেড়ে খাব কি?'

'আপনি কি করতেন ?'

'আমি তো ছিলাম এক ইস্কুল মাষ্টার। সে ইস্কুল তো প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। মশাই পাইকারীভাবে ছেলেরা Transfer certificate নিচ্ছে। ভরসা ছিল ছেলের চাকরী তাও বুঝি বা যায়। সে এক ব্যাংকের Typist.' ভদ্রলোক আরও খানিকটা অগ্রসর হল মাধবের সংগে, বলতে লাগল, 'যদি আয় রোজগারের মেরুদণ্ডই ভাঙল তবে আর উপহাসের মত পূর্ব বাঙলায় থেকে করব কি ? অথচ ওখানে গিয়েই বা খাব কি ?' হঠাৎ চিন্তাক্লিষ্ট মানুষটি মাধবের হাত ধরে টান দিল। 'সরুন, সরুন রাস্তা করে দিন। দেখছেন না কারা আসছে।'

একদল লীগ ভলান্টিয়ার নানাবিধ শ্লোগান চ্চারণ করতে করতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

অপরিচিত ব্যক্তি হাত তুলে অনেকটা আত্মসমর্পণকারী সৈনিকের দাঁড়িয়ে রইল। মাধবও দেখাদেখি তাইকরল। ভলান্টিয়ার দল ষ্টীমার ঘাটের দিকে চলে গেল।

'জানেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব, এখন আর কেউ নয়—এরাই এ রাজ্যের পাণ্ডা। ইচ্ছা করলে এক্ষুণি ঠাণ্ডা করে দিতে পারে আপনাকে-আমাকে সবাইকে। নমস্কার মশাই, যেচে গায় পড়ে আলাপ করলাম বলে কিছু মনে করবেন না—আমি যাব এদিকে।'

কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যাবেলা অভুক্ত মাধব এক বৈঠার ডিঙিতে উঠে বাড়ীর দিকে পাড়ি দিল। সূর্যের ম্লান রশ্মি ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল পশ্চিম দিগন্তে। অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে চারদিক থেকে। মাধবের মনে ভাঁটা, নদীর স্রোতে ভাঁটা, দুরন্ত ভাঁটা লেগেছে দিনান্তের দিগন্তে। আলো কই ? শুধু আঁধার।

মাধব গান জানত না। তবু তার কেবলই একটা বিস্মৃতপ্রায় আধ্যাত্মিক শ্লোক মনে পড়ল। সেইটাই সে মনে প্রাণে সুর করে গাইতে লাগল :

'হরে মুরারে, হরে মুরারে
মধুকৈটভ ভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।'

মাধবের চোখ বেয়ে গাল ও বুক ভেসে যেতে লাগল।

মাঁঝি অতি সংকুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুর গোঁসাই, একটা কথা কইতাম ?'

'বল, বল কি বলবে ?'
'আপনি কি পুত্র সন্তান হারাইয়াছেন ?'
মাধব প্রশ্ন শুনে হাসে কাঁদে আর গান গায় উচ্চস্বরে
নৌকা চলে ভাটিয়ে।

(৮)

বাড়ী ফিরেই মাধব বলল, 'আর সময় নষ্ট না করে বোঁচকা বাঁধ।' নকুলকে ডেকে বলল, 'স্বচক্ষে দেখে এলাম সব, এখন আর কাউর কথা শুনছিনে, তুমি কি করবে ভেবে দেখ।'

নকুল জবাব দিল, 'মহাজন যেন গতঃ স পন্থা—আমি আর কি করব!'

আর একটু ভাঙল কুসুমপুর। সংগে সংগে ভাঙনের আর্তনাদ কেন জানি প্রতিধ্বনিত হলো শশিশেখরের বুকে। 'মাধু ওরা কি ঘর দোরও বেচে গেল ?' বৃদ্ধ শয্যা ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না—শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কি করে গেল বিগ্রহশীলা ?'

'শালগ্রাম সংগেই নিয়ে গেছেন, অভিষেক করে নেবেন গংগাজলে হিন্দুস্থানে গিয়ে। ঘর দোর তো বাবা কেউ বেচেন নি।'

'তবে এরও ফেরার আশা রাখে। ওরে একবার ছাড়লে ফেরা যে বিষম দায়। এত করে বোঝালাম কিন্তু বুঝল না মাধব।' শশিশেখর একটু পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন।

এরা করল কি ? সত্যই ভুল করল—না ভুল হচ্ছে শশিশেখরের ? তিনি ঠিক নিরাপত্তার অভয় দিতে পারছেন না, অথচ নির্দেশ দিচ্ছেন থাকতে, ক্ষুব্ধ হচ্ছেন দেশ ছাড়লে। একি উচিত হচ্ছে তাঁর মত বৃদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষে ? একটা যেন মেঘ জমে উঠল তাঁর বুকের আকাশে। কালো মেঘ, বিদ্যুৎ স্ফুরণ হচ্ছে মুহুর্মুহু। মাথা বাঁচাতে হবে মানুষকে। বাইরে গিয়ে নয়, আশ্রয়ের অন্তরালে থেকে। হয়ত শক্ত করতে হবে খুঁটি, মেরামত করতে হবে চাল—কেবল ছুটোছুটি করে অন্তত গরীবের লাভ হবে না। শশিশেখরের ভ্রান্তি হয় নি, ভুল করল ওরা।

কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ কি একেবারে অভ্রান্ত হয়? শশিশেখর আবার সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন—তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্যই।

একখানা ঘাসি নৌকায়ই বোঝাই করা হয়েছিল দুটো বনেদী পরিবারের জিনিষ পত্তর। মালে মানুষে ঠাসাঠাসি। নকুলের স্ত্রী কাত্যায়ণীর ইচ্ছা ছিল ছাগল দুটোকেও সংগে নিতে। কলকাতার লোকে পাগল বলবে, তাই অগত্যা বর্গা দিয়ে গেল সমসেরের বাপকে। ছাগল এবং তার যা বাচ্চা হবে তা কাত্যায়ণীর, দুধ খাবে সমসেরের বাপ। সে প্রথম বিয়ানের একটা ছা চেয়েছিল কিন্তু তাতে রাজী হয়নি কাত্যায়ণী ঠাকুরাণী। কারণ সেই ছাটা নাকি দেবে তার নাতিকে। মেয়ে এখনও অবশ্য গর্ভবতী হতে ঢের দেরী—কারণ তার এখনও বিয়ে হয়নি।

এই কদিন ধরে মাধবের ওপর হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে। নৌকা ছাড়া মাত্র 'গুরির' দোলায় মাথা তার ঘুরে গেল। বমি বমি করতে লাগল তার সর্ব শরীর। নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে যত, ততই তার মনে হচ্ছে যেন খাল পারের নবরত্ন, পঞ্চরত্ন গুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে যেন তার শিষ্যবাড়ীর শিবমন্দির—যে মন্দিরের মাথায় ছিল মন্ত্রপূত লৌহ ত্রিশূল। আজকাল কালিন্দী লতায় জড়িয়ে গেছে তবু তা তীক্ষ্ণ আছে পূর্বের মত। ভাঙল মনসা তলার মনসা, মুখ কালি করে রইল অন্নপূর্ণা মন্দিরের দেবী। টলমল করতে লাগল যেন কুসুমপুরের সব হিন্দুর ঐশ্বর্য।

একি! এ সব মাধব কি দেখচে! সে মাথায় জল দিতে লাগল।

ষ্টীমার ষ্টেশনে এসে একটু সুস্থ হলো মাধব। কিন্তু ভীড় দেখে আবার তার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল—এত মানুষ! ষ্টীমারে তো জায়গাও হবে না।

'একজন কুলি বলল, 'একি দেখছেন, দু একদিন এর চেয়ে অনেক বেশী ভীড় হয়।'

ঘাটে ষ্টীমার এলে মাধব ভেড়ার পালের মত ছেলে মেয়ে স্ত্রীলোকদের ভিতরে ঠেলে দেয়। নকুল ওঠে বাঁদরের মত একটা রেলিং বেয়ে। দোতলায় উঠে সে দেখে যে তার ছোট ছেলেটা কাঁদছে ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে। 'ও বাবা, বাবা গো···'

এখন নকুল নামে কি করে?

সিটি দিয়েছে ষ্টীমার, সিঁড়ি প্রায় তুলল বলে। নকুলের মাথার মধ্যে চরকি ঘুরতে লাগল। সে চোখে দেখছে শরষে ফুল।

এমন সময় একজন খালাসী অনুগ্রহ করে 'ববাগোকে' তুলে দিল জাহাজে।

নকুল দোতলা থেকে আশীর্বাদ করল, 'বেঁচে থাক মিঞা, বেঁচে থাক।'

'প্রেন্নাম ন্যায়রতন মশাই।'

'কে, দাসু। তারপর', মাধব জিজ্ঞাসা করে। 'সংগে ওটি কে ?'

'লাখোপতি।'

'লাখোপতি !'

'হ্যাঁ ঠাকুর গোঁসাই, লাখোপতি—হরিণ গঞ্জের দাসু বণিকের কথা শোনেন নাই ? আমার বন্ধু।'

'তোমরা যাচ্ছ কোথায় ?'

'আপনাদের পদাংক অনুসরণ কইর‍্যা চলছি।'

দাসু একজন ছুতার। কোন বাড়ী যেন একখানা টিনের ঘর তুলে দিয়েছিল। মজুরী চাইতে তারা কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে হাতুড়ী বাটালী এবং আরও সব দামী 'অস্তর পাতি' কেড়ে রেখেছে। লোকগুলো বাড়ীর পাশের। পেশা ওদের চুরিডাকাতি। কাজ না করলেও নাকি মার খেতে হতো দাসুর।

তবে আর করে খেলে কেন ?' মাধব প্রশ্ন করল।

'লাভের মধ্যে কম খাইলাম—একটা চক্ষু লজ্জা আছে তো।'

তারপর সে বন্ধুর কথা বর্ণনা করল। সে নাকি ছিল হরিণগঞ্জ মিউনিসিপালটির চেয়ারম্যান—সত্যই বিখ্যাত ব্যক্তি। একদিন পুলিশে পরওয়ানা নিয়ে হাজির। দাসু বণিকের গুদামে নাকি পাঁচটা কাঁচা বোমা পাওয়া গেছে। কেউ দুষ্টবুদ্ধি করে এই বে-আইনি জিনিষগুলো তার গোলায় রেখেছে, না সে তৈরী করেছে এসব খোঁজ না নিয়ে সিপাহী জমাদার এগিয়ে এলো দড়ি এবং হাতকড়ি নিয়ে। কোমরে দড়ি বেঁধে হাতে আচ্ছা করে হাতকড়ি লাগিয়ে তাকে ঘোরাল সারা রাস্তা। অবশেষে সে দশ হাজর টাকা কি যেন ওদের একটা ফণ্ড হয়েছে, তাতে দান করে খালাস পায়। আর নয়, দাসু তালাচাবি মেরে কারবার গুটিয়ে টিকিট কাটল হিন্দুস্থানের।

একজন যাত্রী ভীড় ঠেলে জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁকে যেমন সভ্য শান্ত ধর্মপরায়ণ বলে মনে হচ্ছে, উনি হঠাৎ বিদেশে গিয়ে কি সেই পসার আর করতে পারবেন ?'

দাসু ছুতার ফিসফিস করে বলল, 'দেখতে ভিজা বিড়াল, কিন্তু ইঁদুর ধরার

যম। কলকাতায় যে রকম কাপড়ের 'ফরূরা' (সুবিধা) চলছে, গোটা চারেক কিস্তি এদিক ওদিক চালান দিতে পারলেই, ব্যস! বইস্যা বইস্যা মহাজনী করবেন, হিন্দু পুলিশ খাতিরও করবে যথেষ্ট।' পাকিস্তানেও নাকি অন্যান্য মহাজনদের সংগে প্রথম মনমালিন্য হয় ঐ কাপড়ের পারমিট নিয়ে। তা তাদের সংগে পারবে কেন আজকাল? ফলে তারা দিয়েছে মামলায় জড়িয়ে।

সেই যাত্রীটি ফের বলে, 'তবে রেশারেশি মন কষাকষি শুধু স্বার্থের?'

আর একজন ভদ্রলোক জবাব দেয়,' নিশ্চয়—একথা দুগ্ধপোষ্য শিশুও বোঝে। হিন্দু মুসলমানের নাম ভাঙিয়ে এই কারবারই চালাচ্ছে ষণ্ডারা।'

মাধব এসব কথা শুনে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেমন সবুজ ধানে ধন্য হয়েছে জমি, নারকেল সুপারি তাল তেঁতুল গাছে ভরা গ্রামগুলি। মাঝে মাঝে গোচারণ ক্ষেত্র, কোথায়ও মন্দির, কোথাও বা তার পাশেই মস্‌জিদ—এদেশ তাদেরই দেশ। এদেশ ছেড়ে যে চলল, তাতে কি মংগল হবে কখনও? দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে মাধবের চিত্ত আলোড়িত হচ্ছে—তবু সে এগিয়ে যাচ্ছে কি যেন দুর্নিবার চক্রান্তে। ঐ মাধবের মত আজ এই জাহাজ বোঝাই যাত্রীরা সব এগিয়ে চলেছে—হিসাব করার সময় পাচ্ছে না। এমনি আরও গেছে এবং অনেকেই যাবে। অবকাশ নেই সূক্ষ্ম চিন্তার।

নকুল মাধবকে লক্ষ্য করে বলল, 'হাতে তেমন কিছু না নিয়েই তো ছাড়লাম বাড়ী ঘর—এখন ওখানে গিয়ে টিকতে পারলে হয়। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পর ধর্ম ভয়াবহ ভেবেই তো করলাম এসব।'

একটি ফর্সা ছিপছিপে মেয়ে বসে ছিল মাধবের পাশেই একটা বিছানার মোটের ওপর। এতক্ষণ সে এদের সব কথাবার্তাই শুনেছে। পদ্মফুলের মত একটু হেসে সে জিজ্ঞাসা করল, 'স্বধর্মটা কি পণ্ডিত মশাই?'

নকুল জবাব না দেওয়ার পূর্বে মাধব অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, 'জানি না মা—তুমিই বল।'

'স্বধর্মটা হিন্দুয়ানী, খৃষ্টানী বা মুসলমানী নয়—জাত মান বাঁচিয়ে খেয়ে থাকাই স্বধর্ম। কিন্তু তার ভরসা কি দিচ্ছে কোন রাষ্ট্র?'

'তা তো দিচ্ছে না মা।'

একটি কালেজে পড়া ছোকরা এসে বিতণ্ডায় যোগ দেয়। যদি হিন্দুস্থান সে ভরসা না দেবে তবে এতগুলো রিলিফ ক্যাম্পের আয়োজন হচ্ছে কেন? জানেন

চমৎকার একটা বিলও করছে নতুন মন্ত্রিসভা—জন-নিরপত্তা বিল। এ তো আমাদেরই শুভার্থে।'

মেয়েটি মৃদু হেসে জবাব দেয়, 'তার সংগে আমার কথার সম্পর্ক কি ?'

'অলবৎ আছে—আপনি কমিউনিষ্ট।'

চারদিকের ছেলে ছোকরা এবং যারা একটু শিক্ষিত তারা এগিয়ে এলো। ঐ কথাটার সংগে যেন চুম্বকের শক্তি জড়ান আছে। আতংকও আছে ভিন্নপন্থী দেশ ভক্তদের।

'আপনি বিশ্বাসঘাতক।'

একজন প্রৌঢ় হন্তদন্ত হয়ে ভীড় ঠেলে ছুটে আসে। 'থামুন, থামুন মশাই—' সে কাছে এসে বলে, 'কালেজে পড়িয়ে আমি মেয়েটার মাথা খেয়েছি। লেখাপড়া শিখলেই জানেন তো আজকাল পাগল হয়।'

যুবকটি বলে, 'তবে কি আমরাও পাগল হয়েছি ?'

'না না আপনি পাগল হতে যাবেন কেন ? শুনুন তো মশাইরা আমি কি তাই বলেছি ? বলছি যে আমার মেয়ে কালেজে পড়ে পাগল হয়েছে। বলে কিনা উঁচু নীচু সব সমান হয়ে যাবে শীগগিরই। দুনিয়া ভেঙে-চুরে ঝড় আসছে গণ-বিপ্লবের। আরে তা হয় নাকি ? ঈশ্বরের দয়ায় যাঁরা লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে জন্মেছেন তাঁদের স্বয়ং ব্রহ্মাও নড়াতে সাহস পাবেন না বিষ্ণুর হুকুম বিনে। আর বিষ্ণুই তো নিজে বড় ক্যাপিটালিষ্ট—সোল প্রোপ্রাইটর অফ গডেস লক্ষ্মী।'

সকলে হো হো করে হেসে ফেলল যুবকটির দিকে চেয়ে। এখন উত্তর দাও—এইভাব।

তখনকার মত ঐখানেই যবনিকা পড়ল।

যুবকটি ঠিক বুঝতে পারল না প্রৌঢ় কাকে পাগল বলল।

ভীড়টা একটু কমলে মেয়েটির পাশে একটু এগিয়ে বসল মাধব। আজ যে কি একটা বিরাট পরিবর্তনের দিন তা কাউকে সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। এমন জাহাজে চড়ে সে তো কতবার বাড়ী ছেড়ে গেছে। কিন্তু সে যাওয়ায় যাওয়া ছিল না, পিছনে ছিল ফিরে আসার প্রত্যাশা। হয়ত খালি হাতে বেরিয়েছে, কিন্তু যখন ফিরে এসেছে সংগে রয়েছে পরিপূর্ণ সম্ভার। স্ত্রী পুত্র কন্যার মনলোভা সামগ্রী।

এমনি সবাই বিদেশে যায়, তার সাধ্যমত আহরণ করে নিয়ে আসে দেশে—

যেখানে রয়েছে একটি স্থায়ী নীড়, যার অন্তরালে কলরব করে ভোগ করে খাদ্য অর্থ বস্ত্র স্ব স্ব প্রিয়জনদের নিয়ে।

সেই মমতায় গড়া নীড় ছেড়ে সবাই আজ মাধবের মত চলেছে এক নিরুদ্দেশে যেন। ফেরার কোন প্রত্যাশা নেই, মায়ার রজ্জু ছিড়ে যায়নি, কাটতে হল নিজের হাতেই নিষ্ঠুরের মত—এ ব্যথা তো আর সহ্য হয় না। তাই কি কেউ কারুর মুখের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারছে না? এ হল কি বিধাতা?

মাধবের শেষের প্রশ্নটি পাশের মেয়েটির কানে গেল। সে জবাব দিল, 'বিধাতার কিছু ইচ্ছা নয় ঠাকুর মশাই।'

'তবে কার ইচ্ছা মা? বালকের মত প্রশ্ন করল মাধব। তার বুদ্ধি বিদ্যা চিন্তা শক্তি যেন লোপ পেয়েছে। কার ইচ্ছায় আমরা এমন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছি?'

'যারা স্বাধীনতা দিচ্ছে তাদের ইচ্ছায়।'

'কেন?'

'এ কথার উত্তর অতি সহজ। কে চায় তার ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে? নেতারা বুঝতে পারছেন না, তাঁদের নিয়ে পুতুল নাচ নাচাচ্ছে ধূর্ত শ্বেত বণিকের দল। অথবা বুঝেও তাঁরা উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না—নিজেদের স্বার্থও তো বজায় রাখতে চান।'

'বুঝলাম না।'

মেয়েটি একটু হেসে বলল, 'বিষয়টা একটু জটিল।'

'নেতাদের আবার স্বার্থ কি? স্বার্থ তো জনসাধারণের।'

'ঐ তো বললাম বিষয়টা একটু জটিল। নইলে যখন লক্ষ লক্ষ লোক ছন্নছাড়া হচ্ছে তখন নেতাদের কারুর কি সুখাসন টলছে? একটু ভেবে দেখুন সব বুঝতে পারবেন।'

মাধব আজ আর ভাবতে পারছিল না। ভেড়ার দলের মত একপাল মানুষের মধ্যে একটি পশুর মতই বসে রইল। জাহাজ যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই তার গতি বাড়ছে। বেড়ে চলুক—কোন দুঃখ নৈরাশ্যই আর তার মস্তিষ্কে যেন প্রতিফলিত হচ্ছে না। দেশ যাক, সাম্রাজ্য যাক, রসাতলে যাক পৃথিবী তাতে তার কি?

কিন্তু তার নয় কি? সমস্ত আঘাতই তো তার মত সাধারণের দেহে এসে

লাগছে—ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে সবাইকে। এর কি কোন জবাব নেই? প্রতিশোধ নেই? হয়ত আছে। কিন্তু সে পথটা ঠিক চিনতে পারছে না মাধব। তার পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কের অনুভূতিগুলি সে কেন্দ্রীভূত করতে চায় - চায় একটা দুর্বার দাবাগ্নি জ্বালতে। কোনও ক্রীড়ার যদি তারা ইন্ধন হয়ে থাকে, তবে জ্বালিয়ে দেবে সমগ্র বনানীর অতি স্ফীত মহীরুহগুলি।

(৯)

এই কদিনের মধ্যেই শশিশেখর খুব নরম হয়ে পড়েছেন। বয়স তো কম হয়নি।

শশিশেখরের হাতের নাড়ীতে মাঝে মাঝেই বেশ বৈলক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। একটা ম্লান ছায়া পড়েছে পরাণের মুখে, তার বাচালতা কমেছে।

পরাণ বাড়ীর সকলকে শুধু বলে গেল যে সাবধান। এর অতিরিক্ত সে কাউকে কিছু বলল না, কারণ এমন অনেক রোগীকে সে সেরে উঠতেও দেখেছে। অযথা আত্মীয় বান্ধবকে শংকিত করে লাভ কি? সে দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচ বার আসে যায়। তার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করে ওষুধের ব্যবস্থা করে।

শশিশেখরের একমাত্র ছেলে অবনীশেখর আজ প্রায় দু'সপ্তাহ হয় যজমান বাড়ী গেছে, সেখান থেকে সে ফেরেনি। দিন কালের অবস্থার জন্য সকলেই ব্যস্ত। মধ্যে মধ্যে শশিশেখর তার কথা জিজ্ঞাসা করছেন।

অবশেষে অবনী বাড়ী এলো। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে এলে?'

'অনেক বললাম, শুনল না অন্নদা। বাধ্য হয়ে দক্ষিণা করে পূজা বন্ধ করে দিতে হলো। তারা নাকি কিছুতেই দেশে থাকবে না, হরপার্বতী স্থাপিত রেখে করবে কি?'

'বেশ করেছ।' আর কিছু বললেন না শশিশেখর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অবনী। দ্বার-প্রান্তে এসে দাঁড়াল উর্মিলা। শশিশেখর আবার বললেন, 'ও বাড়ীর নকুল এবং মাধবও চলে গেছে, আমার শরীরের অবস্থা তো দেখছ—তুমিও যাবে নাকি অবনী?'

'একি বলছেন বাবা?' অবনী ভয়ানক আহত হলো।

উর্মিলা যেন সমস্ত পলাতকের অপমান বহন করে চুপ করে রইল।

'বলছি তোমারও তো স্ত্রী পুত্র রয়েছে, রয়েছে বয়স্থা ভগ্নী—আমি তো মূর্খ।'

এবার অবনী চুপ করে রইল, তার মুখে উত্তর যোগাচ্ছে না।

উর্মিলা বুঝতে পারল যে এ অনুযোগ সমস্ত বর্দ্ধিষ্ণু পলাতক সমাজটার বিরুদ্ধে। তার স্বামী একটা উপলক্ষ মাত্র। উর্মিলা বলল, 'বাবা সবাই দেশ ছাড়লেও তো আমরা আদর্শ ভ্রষ্ট হতে পারব না। কে বলে যে আপনি অজ্ঞান?'

'মা সবাই বলে—যারা নিত্য দেশ ছাড়ে।' কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে শশিশেখরের। একটু পরে তিনি নিজেকে সংযত করে ফের বলেন, 'যাও অবনী স্নানাহার করতে যাও - বেলা শেষ হয়ে গেছে। বৌমা তুমিও দাঁড়িয়ে থেকো না। যা বললাম তা পরে ভেবে দেখো।'

বিকালের দিকে পরাণ এলো। 'আমি আর ওষুধ খাব না ডাক্তার।'

'কেন?'

'যমে মানুষে টানাটানি ভাল লাগে না। তার চেয়ে যদি পার একটু চাঙা করে তোল রকমানকে। আমি তো যেতে পারব না, ও যদি একবার শেষবারের মত এসে একটু দেখা করে যেতে পারে।'

'আপনে ভাববেন না, ও ভাল হইয়া ওঠল আর কি!'

'সত্যই ভাল হচ্ছে, না প্রবোধ দিচ্ছ আমাকে?' শশিশেখর জ্ঞানী - কিন্তু তাঁর সমস্ত জ্ঞানের বাঁধ ঠেলে বেরিয়ে এলো মমতার প্লাবন। জ্ঞানের কাঠিন্যে বেঁধে রাখতে পারল না হৃদয়ের সরসতা।

'না, না ঠাকুর গোঁসাই—সত্য, সত্য ··।' কথাটা আর ভাল করে ভাঙল না পরাণ—অশ্বত্থমা হত ইতি গজের মত করে রাখল।

দিন যায়, প্রত্যহই আকাংক্ষা বাড়ে কিন্তু রকমান আসে না। ক্রমে ক্রমে নৈরাশ্য জাগে বৃদ্ধের অন্তরে। তিনি ইসমাইলকে দেখলেও জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু সেও পরাণের মত জটিল উত্তর দেয়। অমনি জবাব দিতেই পরাণ শিখিয়ে দিয়েছে সবাইকে। শশিশেখর ক্ষুব্ধ হন, মাঝে মাঝে হন ক্রুদ্ধ, কিন্তু উপায় নেই তাঁর। তিনি যে শয্যাশায়ী।

কোন কোন দিন তাঁর একটা দুপুরেই কাটে জানালার দিকে চেয়ে।

এখন আর আসবে কেন রকমান? তার অসুখ কি এতদিনেও ভাল হয়নি? তার মনেও নিশ্চয় একটা ঢেউ লেগেছে এই সাম্প্রদায়িক বিষের—নিশ্চয়।

কিছুক্ষণ গত হয় একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়। দুর্বল মস্তিষ্ক নানা রকম চিন্তার

ঘাত প্রতিঘাতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সংশয় আসে, আশংকা হয় নিজ পরিবারের জন্য। যদি তিনি ভুল করে থাকেন তবে তার পরিণাম যে কি ভয়াবহ, তা তাঁর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু শশিশেখরে ভুল হওয়া মানেই তার প্রিয় বিরাট একটি মহামানবের ঠিকে ভুল হওয়া। এ ভুলের জন্য কোন নৈতিক দায়িত্ব তাঁর নেই। শুধু দায়িত্ব আছে প্রাণ বলি দেওয়ার।

যদি মান যায়, শ্লীলতা নষ্ট হয় উর্মিলা কি মাধবীর ?

না, না তা তো সইতে পারবেন না তিনি। এবার সমস্ত আদর্শের বুনিয়াদ ধ্বসে ধ্বসে পড়তে থাকে নদীর ভাঙা পারের মত। একি, কেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাঁর বুক ? কেন এত প্রগাঢ় মমতা আপন জনের জন্য ? তবে কি কেউই নিজ পরিবারের শ্লীলতা বিপন্ন করে আদর্শের পিছু পিছু ছুটতে পারে না ? শুধু দিতে পারে তখনই পরকে নির্দেশ যখন সে নিজে সর্বোতভাবে সুরক্ষিত ?

শশিশেখরের উদার মন বাস্তবের প্রত্যক্ষ ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন জানি অনুদার হয়ে ওঠে। তিনি একটা কম্পন অনুভব করেন সার দেহে।

'কে আছ, আমার গায় একটা কিছু দিয়ে দাও বড্ড শীত বোধ হচ্ছে—আবার বুঝি জ্বর এল।'

জাহ্নবী এগিয়ে আসেন একখানা ধবধবে কাঁথা নিয়ে।

'অবনীশেখর কোথায় ? বৌমাকে ডাক।'

'অবনী তো বাইরে কৃষাণদের সংগে কথা বলছে—গোয়ালখানা একেবারে ভেঙে পড়েছে কিনা—আর বৌমা গেছে ঘাটে।'

'কে কে এসেছে ?'

'সমসের, খোরসেদ, ইসমাইলের চাচা···'

'বল কি !' শশিশেখর উঠে বসেন। তবে কি তাঁর সন্দেহ সম্পূর্ণ মিথ্যা ? মস্তিষ্কের দুর্বলতামাত্র ? রকমান বিষাক্ত হয়নি ? ওদের দলের সবাই আসছে যাচ্ছে, কাজ কর্ম মেলামেশা করছে দরদ দিয়ে ? তাই হক, তাই হক হে ভগবান। শশিশেখর জানালা দিয়ে চেয়ে থাকেন। একটা গভীর পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

'কাঁথা লাগবে না আর, আমার বাতিকের জ্বর ছেড়ে গেছে—দেখ গায় হাত দিয়ে।' শশিশেখর শিশুর মত জাহ্নবীর একখানা হাত টেনে এনে তাঁর ললাট স্পর্শ করান।

শয্যাই যার সংগী, তার শয্যা ত্যাগ করে যাওয়া অসম্ভব। শশিশেখরের এ অসময় তাঁর আর একটি বন্ধু জুটল—ঐ উন্মুক্ত গবাক্ষ পথ। মন ও প্রাণের অনেক কিছু আদান প্রদান চলে ঐ পথে।

সেদিন দুপুর বেলা আবার তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল মাধবের বাড়ী দৃষ্টিপথে পড়ে। জানালা দিয়ে কিছু জংলা গাছ দেখা যায়। এ জংগল ঝাড়ে বংশে আরও বাড়বে, মানুষ আর ও-বাড়ীতে ফিরে আসবে না। ক্রমে ক্রমে হবে শেয়াল ও বন্য ভামের আশ্রয়। দিন দুপুরে ছেলে মেয়ে ভয় পাবে ওমুখো যেতে। অথচ এই তো কদিন আগে ছিল কত কলরব। মানুষই লক্ষ্মী। ধীরে ধীরে লক্ষ্মীহীনা হচ্ছে কুসুমপুর। ওরা ছিল গাঁয়ের মানুষ--ভাল হক, মন্দ হক, প্রতিবেশীর কাছে যে কত বড় বৈভব, তা যে না হারিয়েছে সে বুঝবে কি করে? ওরা যখন গেছে, তখন ওদের যেন মংগল হয়। বৃদ্ধ আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করেন অশ্রু বিগলিত প্রাণে। যদি কোনও কঠিন কথা বলে থাকেন, দিয়ে থাকেন কোন ব্যথা তার জন্য তিনি মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 'ভাই মাধব, ভাইরে নকুল, তোদের বুড়ো দাদাকে ক্ষমা করিস।'

শশিশেখরও বোধহয় উচিত ছিল যাওয়া। কি করে একা এক ঘর থাকবেন আশ পাশের সব চলে গেলে? এতগুলো লোকের কি বুদ্ধি-ভ্রংশ হল? হয়ত হয়েছে—নয়ত হয়নি। এত কথা তিনি আর দুর্বল শরীরে চিন্তা করতে পারছেন না। তিনি যা স্থির করেছেন সেই তাঁর পথ। একটা আদর্শের পিছনে চলতে হলে শুধু যুক্তি তর্ক করে চলা যায় না। সামর্থ জোগায় অনুভূতি ও প্রেরণা। তিনি কিছুতেই ভদ্রাসন ত্যাগ করবেন না।

না, না, না।

কিন্তু আবার যে কম্প হচ্ছে···

'ঊর্মিলা—বৌমা, মাধু···'

সকলে ছুটে এল।

'একখানা লেপ দাও।'

সকলে বুঝল এবার বৃদ্ধ কখন যেন ফাঁকি দিয়ে যাবেন এ সংসারকে।

সেদিন রাত্রে পরাণ হঠাৎ উপস্থিত হলো উর্বশীর বাসায়। মনে তার ইচ্ছা শশিশেখরের অবস্থাটা যে অত্যন্ত গুরুতর তাই ওকে জানাবে এবং খোঁজ নিয়ে আসবে কেন ও এই কদিন ধরে যায়নি ও-পাড়ায়। সেদিনের ব্যাপারটা যে খুবই অশোভন হয়েছিল তা পরাণও ভাল করে বুঝতে পেরেছিল, উর্বশীর ঐভাবে কাপড়ের অপবিত্রতার কৈফিয়ৎ দিয়ে চলে আসার পর।

পরাণের একটা দোষ আছে—আর দোষ না বলে অভ্যাস বললেও ভুল হয় না—ঐ উর্বশীর কাছে আসার সময় তার একটা বোতল হাতে করে আসা চাই। অনেক সময় পরাণের ওষুধের জমা ফুরাত কিন্তু ও-জমাটা তার কিছুতেই নিঃশেষ হতো না। ওটা পরাণের প্রাণ।

একটা বড় খাল কনুই ভাঙার মত কোণ সৃষ্টি করে চলে গেছে। সেই কোণের কোলে একটা উঁচু টিলার ওপর একখানা টিনের দোচালা। তার চারপাশে ঘন ঘন সতেজ পত্রবহুল সব অল্প বয়সী সুপারি ও নারকেল গাছ। একেবারে খাল পারের চরে দুটো জিল গাছও আছে জলের সংগে ছোঁয়ান। জোয়ার এলে তো ডুবেই যায় লতা পাতা শিকড়-বাকড়। আবার ভাঁটার সময় জটগুলো মনে হয় যেন কতগুলো মাটি মাখা মেঘ-ডম্বুর সাপ নীচের দিকে মুখ করে ঝুলছে। ঐ গাছের নীচেই গভীর তল-খাড়ি, যেখানে থাকে অজস্র শলা চিংড়ি ঝাঁক বেঁধে। সময় সময় কেউ কেউ জাল ফেলে কিন্তু একটি মাছও ধরতে পারে না। যখন পাড় শক্ত ছিল তখন ওখানে ছিল নাকি একটা বাঁশের ঝাড়—এখন আর সে পাড়ের চিহ্ন নেই মোটে। তবে বিষম ভাঙা-মুড়া রয়েছে ডুবন্ত—যাতে বেঁধে সুতার জাল একেবারে হয়ে যায় ছিন্ন ভিন্ন।

কোন অজ্ঞকে জাল ফেলতে দেখলে উর্বশী হাসে—পরাণ ভাবে ও কি নিষ্ঠুর।

তবু পরাণ ওর কাছে না এসে পারে না।

'কিরে জুতা কেনছ নাকি ?'

'না।'

'তবে যে আইলি ?'

'তোর তো রোগ শোক নাই, ঘুইর‍্যা বেড়াও নতুন বকনার মত—আমি তো থাকতে পারি না।'

'ক্যান ?'

'চিন্তায়।'

'আমার লাইগ্যা না তোরে ভাবতে বারণ করছি পরাণ।'

'তোর কথা ভাবে কেডা ? একটা ভাণ্ড দে।'

'আবার মাতলামি করতে আইছ এখানে ?'

পরাণ তবু আর একটু এগিয়ে আসে। উর্বশীর হাতের কাজ ঠেলে রাখে। মিনতি করে বলে, 'একটা ভাণ্ড দে অপ্সরী, মনডা আমার বাস্তবিকই বড় খারাপ।' পরাণের মন খারাপের আর একটা লক্ষণ উর্বশীর স্থলে অপ্সরী সম্বোধন।

'খারাপ থাকে একলা বইস্যা ভাল কর, এই নে মালা একটা—আমার কাম আছে, ডাকিস না।'

পরাণ মালা ভর্তি করে মদ ঢালে। একটা উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। 'দেখ কেমন আসল চিজ।' বলে, পরাণ একটা আংগুল মদের মালায় ডুবিয়ে সুমুখের প্রদীপ্ত শিখায় ধরে। অমনি আগুন দাউ দাউ করে ওঠে। সে মালাটা উর্বশীর হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি আগুনটা নিবায়। 'দেখলি তো, পরাণ কেমন মাল চেনে।'

উর্বশী অস্থির হয়—সত্য সত্যই পুড়িয়ে ফেলল আংগুলটা! 'দেখি তোর হাতটা ? যাউক, কিছু হয় নাই।'

'অপ্সরী বড় বিষম দায় ঠেকছি তোর পণ্ডিত বাবারে লইয়া। রোগ বাড়ন্ত—বুড়ায় বুঝি আর ওঠবে না।'

'কও কি, এই দুই দিনের মধ্যে এত চেতাইছে ?' উর্বশী এগিয়ে এল পরাণের কাছে। 'কও কি এই দুই দিনের মধ্যে…'

'তুই তো কও দুই দিন, দুই দণ্ডে ঘটে পেল্লয়! রকমানডারে লইয়াও এক সমস্যাই আমার। আমাতে কি আমি আছি!'

উর্বশীর কত আশা, কত কল্পনা। ও দেখবে, অংশ গ্রহণ করবে, সাজিয়ে দেবে ফুল ফলের নৈবেদ্য—সে সার্বজনীন পূজা কি হবে না ? মুচির মেয়ে থেকেই যাবে অপাংক্তেয় ? একি ইচ্ছা মহাদেবীর ? তবে সে কেন এতদিন পালন করল কঠোর সংযম ? মনে প্রাণেই তো সে সংযত হয়ে চলেছে তবু কেন বিরূপ হলেন দেবী ? ভাবতে ভাবতে উর্বশী অধীর হয়ে পড়ে। পরাণ এক মালা 'মাল'

এগিয়ে দেয়। উর্বশী অন্যমনস্ক ভাবে সুরা পাত্রে মুখ দেয়। শুকনা গলা ক্রমে তার ভিজে ওঠে। সে ভাণ্ড খালি করে বলে, 'পরাণ নে, ধর ধর, ঠাণ্ডা কর পরাণডা। বড় আপশোষ, বুঝি আমি সবই।'

পরাণ আর মালা ব্যবহার করে না, খায় বোতল উপুড় করে। 'কত যে চেষ্টা যত্ন করলাম! এখন হাতের নাড়ী থাকে থাকে ফাল (লাফ) মারে।' সে আবার ভাণ্ড পূর্ণ করে উর্বশীর হাতে দেয়। উর্বশী উজাড় করে এক নিশ্বাসে। এমনি ভাবে নানা শোক দুঃখের কথা হতে থাকে, এবং চলতে থাকে মদ। সময় কাটে অনেকটা।

'পরাণ কখনও সাধ করিস না, আশা বাসনা আমার তোর ব্রেথা! কত পাপ যে আমরা করছি!' উর্ব্বশীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা ক্ষোভ ফুটে ওঠে যে তা অবর্ণনীয়।

সত্যই সে সেদিন পণ্ডিত বাড়ী থেকে কত বড় আঘাত যে বুকে চেপে এসেছিল। সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে সে যদি একবার স্বীকৃতি পেত তখন এমন যে পরাণ তাকেও উর্বশী বুঝিয়ে দিত, মানুষকে মানুষের ঘৃণা করা কত গর্হিত। কিন্তু শশিশেখর যখন যাত্রা করেছেন তখন তার এ স্বপ্ন মুকুলেই হলো ধ্বংস। উর্বশী নিতান্তই ভাগ্যহীনা।

'হ্যাশের মধ্যে দশের মধ্যে একটা মানুষ ছিলরে গোঁসাই ঠাকুর।'

'চুপ কর পরাণ, কইস না আর ও কথা।' উর্বশী কাতর হয়ে পড়ে। পরাণ, তাকে বুকে জড়িয়ে তুলে নেয়। সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয় অবিরত। 'তুই ভাবিস না অপ্সরী—কাঁদিস না খামাকা!'

রাত বাড়তে থাকে, নেশাও চড়তে থাকে দুজনার সমস্ত শিরা উপশিরায়। কোন সময় যেন প্রদীপটার তেল ফুরায়। উর্বশীর অসহ্য হৃদয়াবেগ অন্যপথে চালিত করে পরাণ। তারও ক্লান্ত পীড়িত মন চায় একটু উন্মাদনা। সে মদের পাত্র ফেলে, তার চেয়ে বহু উত্তেজক মুখের মধু আস্বাদ করে। জাগে উদ্দাম চাঞ্চল্য।

'কেহ কারো লয়রে পরাণ।'

'ক্যানরে অপ্সরী?' পরাণ কম্পিত হস্তে ওর নাভী মূলের বস্ত্র শিথিল করে। 'আমিও কি তোর পর?'

'না ভাই—তা কয় কে? কিন্তু মিছা লয়'কি যত আশার রংবাতি?'

পরাণ কি যে জবাব দেয় বোঝা যায় না। কিছুক্ষণের জন্য সে ভুলে যায়

নিজের অক্ষম চিকিৎসার কথা, ভুলে যায় রোগ বিয়োগের কথা। তেমনি উর্বশীর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে আসে পংক্তি সমাজ ও শ্রেণী ব্যবস্থা। অপার্থিব হর্ষে ও আনন্দে দুজনে অন্ধ হয়ে থাকে। যা উর্বশী মনে প্রাণে প্রতিরোধ করবে ভেবেছিল, তাতেই একান্ত অধীর হয়ে ডুবিয়ে দেয় নিজেকে। নেশার ঘোরে পরাণ প্রশ্ন করে, 'কই চলছি আমরা···? কইলো, কোন হ্যাশে ?'

ঘর্মাক্ত উর্বশীর মর্মের থেকে জবাব আসে, স্বগ্‌গে।'

রোগী বাড়ী যাবে—রাত থাকতে পরাণ শয্যাত্যাগ করে।

ভোর বেলা উর্বশী একটু কেমন লজ্জিত ও বিষণ্ণ হয়ে থাকে। নতুন করে কে যেন তার আবার কৌমার্য ভাঙল গত রাত্রে।

দিনের আলোতে তার আবার সংজ্ঞা ফিরে এলো, জাগ্রত হলো ভিতরের কর্তব্যবোধ। সে তাড়াতাড়ি স্নান করে একখানা পরিষ্কার শাড়ী পরে। মদের মালা এবং খালি বোতল তার হাত দিয়ে ছুঁতে ঘৃণা বোধ হয়। তবু তো পরিষ্কার না করে ওগুলো ফেলে রাখতে পারবে না। সে দামী বোতল এবং ঐ সংগে মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় খালের জলে। কণ্ঠ ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চায় উর্বশীর। এখনও তার দেহের সর্বাংশে ব্যথা জড়ান—এর মধ্যেই পরাণ পালাল! আবার উর্বশীকে ঠকিয়েছে শঠ। কই, সারারাত কাছে রইল—একবারও তো ওকে বলল না যে গ্রহণ করবে, বাঁধা নীড়ে বাস করবে পক্ষিণীর ইচ্ছা মত। ঐ পরাণ শুধুই কি শঠ, লম্পটেরও শিরমণি।

উর্বশী আবার স্নান করে আর একখানা ধোয়া শাড়ী পরে চলল তার পণ্ডিত বাবাকে দেখতে। পথে যেতে যেতে সে গজ গজ করতে থাকে—শালা জাত নেবে কিন্তু কিছুতেই জাত দেবে না। কি বিষম বজ্জাত্‌!

সকালবেলা—সকলেই একটু এদিক ওদিক হয়েছে কাজ কর্মে। মাধবী তো শেষরাত্রে পিতার পাশ থেকে উঠে গেছে। এখন ছিল চাঁপা। সে তো নিতান্ত ছেলে মানুষ। ইসমাইলকে দেখে সে যেন তার কি একটা জরুরী কথা বলতে উঠানের দিকে চলে গেল।

এলো উর্বশী।

শশিশেখর ইংগিতে তাকে কাছে ডাকলেন—আসতে বললেন একেবারে ঘরের ভিতরে।

উর্বশী ইতস্তত করতে লাগল। আবার কে এসে পড়ে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ—তাঁর ও-ঘরে কত না মূল্যবান পূত শুদ্ধ গ্রন্থ গীতা দেব দেবতা শিলা বিগ্রহ রয়েছে, পা বাড়াতে সাহস পায় না উর্বশী, আড়ষ্ট হয়ে আসে তার গতি। গত রাত্রির ব্যাভিচারের কথাও স্মরণ হয় তার।

মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলে অনেক সময় মধু সঞ্চিত হয় মানুষের মনে। শশিশেখর ছিলেন বহু উঁচুস্তরের মানুষ, ভাণ্ডে তাঁর মধু ছিল চিরদিনই। এখন তা যেন উপচে উপচে পড়তে লাগল চারদিক বেয়ে। বিদায়ের প্রাক্কাল—মধুময় কেন হবে না সাধুর মন? এ ধরিত্রীর পংক গ্লানি কেন স্পর্শ করবে তাঁর মন?

'মা, এমন যে বেশ্যা তার দ্বারের মাটি না হলেও দেবীর আরাধনা হয় না—তুই আয় মা ভিতরে।'

উর্বশী এগিয়ে এলো। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসল গিয়ে পায়ের কাছে। ঘরের শুভ্র শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। এখানে দেব দেবী নেই, শুধু একখানা গীতা আছে শশিশেখরের সংগী। কিন্তু কেমন তক-তক ঝকঝক করছে অনাড়ম্বর দীপাধার পিলসুজটি পর্যন্ত। জোলা চামারের ঘর তো এমন পরিষ্কার হয় না। উর্বশী একটা স্নিগ্ধ গন্ধ ও পাচ্ছে যেন গীতার ওপরের ফুল দুটির। শশিশেখরকে স্পর্শ করতেই সে যেন একেবারে নতুন জীবন লাভ করল আজ—বর্ষার ঘোলা জল যেন সহসা টলমল করতে লাগল গিরি গাত্রের ঝর্ণাধারার মত।

শশীশেখর ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন, যে সার্বজনীন পূজার ব্যবস্থা তো তিনি আর করে যেতে পারলেন না। তবে তাঁর সংকল্প নিশ্চয় পূর্ণ করবে অবনী। দেব মন্দির মুক্ত হবে সকলের জন্য। ধন্য হবে উর্বশী, ধন্য করবে সে এদেশবাসী নবসেনী ছত্রিশ জাতিকে। 'তুই ভাবিস নে মা, দেখতে দেখতে বছর ঘোরে বাজনা বাজে বোধনের।' আরও অনেক বুঝ প্রবোধ এবং উপদেশ দিলেন বৃদ্ধ। এই কদিন উর্বশী আসে নি বলে অনুযোগ ও করলেন। একটা দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠল শশিশেখরের মুখে। মনে হল তিনি যেন রোগ মুক্ত।

তিনি আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন, যেমন নিত্য থাকেন আশায় আশায় শুয়ে।......

উর্বশী মুখ নীচু করে রইল। সে কাঁদতে পারছিল না বা কিছু বলতে ও পারছিল না। গতকালও সে খেয়ালের বশে যা করেছে তার জন্য কেবলই তার

গ্লানি বোধ হতে লাগল। বিগত জীবনের কথাও যে তার মনে পড়ল না তা নয়। সে পণ্ডিত বাবার কাছে এলো, কুমারী অবস্থায়ও তো আসতে পারত। অক্ষত দেহে মনে এলে না জানি আজ তার কত ভালই লাগত।

মুচির মেয়ে হলেও সে যে মানুষ, অরণ্যে জন্মালেও সে যে সুগন্ধি পুষ্প একথা এতদিন তো কেউই জানায়নি তাকে। সে প্রমত্তা হয়ে এতদিন শুধু ভুলের বেসাতিই করেছে। এখন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর নয়—সে ফিরবে এবার।

কিন্তু কি কাজ নিয়ে থাকবে? একটা কর্মের বাঁধন ছাড়া তো মানুষ বাঁচে না।

শশিশেখরের অবর্তমানে থাকতে হবে তাঁরই আরব্ধ কাজ পূর্ণ করতে—ভীত স্বজাতির সেবাই হলো তার ধর্ম্ম।

'ওকি বাবা কান্দিস ক্যান?'

'না মা বুড়ো মানুষের চোখ মাঝে মাঝে অমনি ঝাপসা হয়ে আসে।' আবার শশিশেখর মুক্ত জানালার পথে চেয়ে থাকেন। রকমানদের বাড়ীটা দেখা যায় না, কিন্তু তাদের এজমালী তালগাছটা এখন থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বৃদ্ধের মুখে কয়েকটি ম্লান রেখা ফুটে-ওঠে। আর বুঝি দেখা হলো না।

আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটে। একটা টিকটিকি এগিয়ে এসে শিকার ধরে পালায়। বৃদ্ধের ভিতরের আঘাত একটা সাময়িক শ্বাস কষ্ট বোধ হয়। উর্বশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কেউকে ডাকবে নাকি? কিন্তু কেউ এসে তাকে এখানে দেখলে ভাববে কি? সে বিমূঢ় হয়ে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

শশিশেখর একটু সুস্থ হন। 'কি একটা তুচ্ছ ঘটনা, অথচ পরিণতি কি মর্মান্তিক! একটা হাতীর মত যোয়ান পড়ল কিনা শয্যাশায়ী হয়ে।' বলতে বলতেই তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ তিনি বিশ্বাস করবেন কি করে? সকলে মিলে তাঁকে একেবারে হতাশ করে দিয়েছিল। এ যে তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর!

উর্বশী কৌতুক বশত চোখ তুলতেই দেখে যে দুয়ারের বাইরে রুগ্ন রকমান একখানা লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে। সে এইমাত্র আদাব জানাল হাত তুলে।

'মিয়া ভাই আইছ!' ছুটে গেল উর্বশী।

রকমান কাঁপতে কাঁপতে কাদা পায়েই ভিতরে ঢোকে। আজ সংকোচ ও কুণ্ঠা ওর মনে জাগে না। আজ যে এবাড়ী পরিণত হয়েছে এক ঐক্যতীর্থে। শুধু হিন্দু মুসলমানের ঐক্য নয়—মিলন তীর্থ সর্ব অবজ্ঞাতের।

গায় হাত দিতেই সহসা শশিশেখর আনন্দে চোখ বুজলেন, হতবম্ব হয়ে রইল রকমান। কিছু সময় বাদে সে যখন বুঝল সব, বলল, 'ধর ধর উর্বশী, বাজান গেছে বেহেস্তে।'

জাহ্নবী ছুটে এলেন। তিনি যেন বিস্মিতও হলেন না, কাঁদলেনও না— এ মিলন স্বামীর ঈপ্সিত ও ঈশ্বরের যেন কল্পিত।

গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। এমন আশ্চর্য মরণের কথাটা বিত্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ছুটে এলো দলে দলে হিন্দু মুসলমান।

অবনী হিন্দুর শব হলেও কেউকে আর স্পর্শ করতে বাধা দিল না। সমান অধিকার আজ সাব্যস্ত হক মহাশ্মশানে। দেখতে দেখতে হিন্দুর চাইতে মুসলমানই জড়ো হলো বেশী। হরিধ্বনির সংগে মিশে গেল মুসলমানের নীরব প্রার্থনা।

দাউ দাউ করে শ্মশানে চিতা জ্বলছে। মুসলমানেরা ম্লান মুখে বসে রয়েছে একটু দূরে। গাছতলায় হিন্দুরা করছে সংকীর্তন।

নীরবে কাঠ-কুটো এগিয়ে দিচ্ছে উর্বশী। ও আজ নিষেধ মানছে না কারুর। সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়েছে যেন রকমানের। সে একবার গেছে আম গাছ কাটার কাছে, আবার গেছে ঘৃত চন্দন জুগিয়ে দিতে। অবশেষে ক্লান্ত দেহে অবসন্ন হয়ে বসে রয়েছে একা শ্মশানের একপ্রান্তে।

ইসমাইল এসে দাঁড়াল তার পাশটি ঘেঁষে।

মাধবী এবং চাঁপাও কাঁদছে না।

এ দৃশ্য দেখে হর্ষ ও বেদনায় বুকের ভিতরটা ভিজে ভিজে উঠতে লাগল অবনীর। একটা দিকপাল যেন অস্ত গেল।

শশিশেখরের মৃত্যু সংবাদ শুনে মন্নু সরিফ একটু বক্র হাসি হাসল। ওপারের হিন্দুদের মধ্যে আর বুদ্ধিমান, প্রতিষ্ঠাবান রইল কে? এখন ভেড়ার পাল হয় ভিড়ে আসবে, নয়ত এক ধাক্কাই দেশ ছাড়বে। পড়ে থাকবে উর্বর ধানী জমিগুলি। বাড়ীঘর যখন যেখানে খালি হবে অমনি সেখানায় তুলে দেবে এক এক ঘর স্বজাতি। তারা ফসল ফলাবে; বিনা মাশুলে অবশ্য বর্গা খাবে না মন্নু সরিফ—ঝক্কি সামলাবে পুলিশ পেয়াদার। আর হিন্দুদের স্থাবরাস্থাবর জমি জায়গা বাড়ী-ঘর সবাইকে পীর ছাহেবের নামে কিনতে বারণ করবে। ঢোল সহরৎ করা উচিত ছিল অনেক আগেই। যারা আজাদী পাকিস্তানে মনের স্ফূর্তিতে থাকতে পারবে না, তারা গেলে যাবে মাটির মালসা হাতে করেই। ভিটা মাটি ছেড়ে ঠিক বাপ-মা মরা ছেলের মত শুক্‌না মুখে গলায় দড়ি দিয়েই তো নিত্য জাহাজে উঠছে হাজার হাজার যাত্রী। একটা হাসি ও উল্লাসে অধীর হয়ে ওঠে মন্নু।

'ওরা গংগায় যায়, না মিঞা, গয়ায় যায়?' প্রশ্ন করে করে মন্নু সরিফের দোস্ত (বন্ধু) জালাল।

'যায় বাজানে গো কাছে নালিশ করতে।' মন্নু জবাব দেয়।

'তারা মরে নাই?'

'এখান থিক্যা সইরা ভূত হইছে দিল্লী গিয়া। যায় পিণ্ডি দিতে। যাউক তাতে কাম নাই।...ঐ যে শশিশেখরের মাইয়া মাধবী...'

তামাকের একটা বড় হুঁকো হাতে করে একজন বর্ষীয়সী মহিলা ঘরে প্রবেশ করেন। নাম ফতেমা বিবি। 'কি পরামর্শ কর তোরা?'

তাঁকে দেখে মন্নু উঠে দাঁড়ায়, জালাল দ্রুত পালায়।

'কিছু না।'

'তয় যে নাম করলি শশিঠাকুরের মাইয়ার?'

'না তো!'

'না তো? মিছা কও আবার?' মহিলা ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। 'ও হনুমান আইছিল ক্যান? ঘর পোড়া শয়তান?' এত বয়স হয়েছে তবু ক্ষুদ্র ঘোলাটে চোখে যেন আগুন জ্বলে। তিনি একটা চৌকিতে বসলেন। মন্নু সরিফ

এতটুকু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমস্ত তেজ বীর্য টেনে নিয়েছে কেউ। ফতেমা কয়েকটা ঘন ঘন টান দিলেন হুঁকায়।

'মন্নু!'

'আম্মা।'

'জানিস ঐ শশিঠাকুর কে?'

'না।'

'তোর বাপজানের গুরুভাই। এক পাঠশালায় পড়ত ওনরা।'

আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়েন বৃদ্ধা। 'সে উষ্টুমে (সম্পর্কে) হয় কি জান?'

'চাচা।'

'না হারামজাদা—বাপ।' ধমক দেয় ফতেমা।

মন্নু সরিফ কেঁপে ওঠে।

'বাজানের মাইয়া কি হয় কইতে পার ?'

'বুইন।'

'এখন যা আমার সুমুখ থিক্যা—বুঝলি তো সব—যা।' বৃদ্ধার তামাক টানতে টানতে মন যায় সেকালে চলে—সেই মধুময় যুগে, যখন এ জাতীয় কোন ভেদাভেদ ছিল না হিন্দু মুসলমানে। একের হাজারও রূপসী বয়স্থা কন্যার কথা এভাবে চিন্তা করতে পারত না অপরে। ভদ্র এবং শান্ত যারা, তারা ছিল যেন এক রীতি নীতিও সামাজিক সংস্কৃতিতে আবদ্ধ। হিংসা দ্বেষ যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু তা নিয়ে লড়াই চলত অন্তভাবে।

মন্নু সরিফ স্থানীয় ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ইলেকসনের সময় সে তার প্রতিযোগিকে বেমালুম খুন করিয়ে ভোটে জিতেছে। লেখা পড়া আদৌ জানে না, তবু ইংরাজী দস্তখতটা করে গর্ভণরের মত। শিখেছে কেরানীটির কাছে। যেমন শিক্ষিত সেক্রেটারীর লেখা বুলি আওড়ায় অনেক বকলম মন্ত্রী, তেমনি ভাবেই আফিস এবং মিটিংয়ের কাজ চালিয়ে যায় মন্নু। ধূর্ত পয়লা নম্বর তাই ধরা পড়ে না। কর্তাদের যে সব গুণ থাকা দরকার তা প্রায় সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। মন্নু আশা করে এরপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, তারপর কাউন্সিল।

বাড়ীর অবস্থা তার তেমন ভাল ছিল না। স্বায়ত্ত শাসনের মালিক হয়ে সে দশটা বিয়ে করেছে। ওর মধ্যে বুড়ী আছে সাতটা, আর বাকী তিনটা আধ বয়সী রাড়ী। প্রশ্ন যুবক হয়ে সে এসব করল কেন? এদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট

ধানী জমি আছে। কিন্তু মান ছিল না, সম্প্রতি রক্ষণা বেক্ষণের তেমন বুদ্ধিমান জন ছিল না -- এখন হলো দুই। যৌবন? তা অপ্রয়োজন এস্থলে।

মন্নু ইংরাজের শেষ দশায় ছিল কংগ্রেস ভক্ত। তাই গত ইলেকসনে কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের নির্দেশ মত ভোট জোগাড় করেছিল হক ছাহেবের পক্ষে। তারপর দেখল একেবারে অভাবনীয় একটা কাণ্ড ঘটল—ইংরেজ কাঁচি মেরে ছেড়ে গেল এই সোনার রাজ্য। সে খুবই দুঃখ বোধ করল। তবু তাড়াতাড়ি ছুটল সদরে। নতুন পাণ্ডাদের নানা কৌশলে ঠাণ্ডা করে ফিরে এলো মন্নু। সংগে করে নিয়ে এলো শতাধিক সবুজ টুপি, নয়া নিশান—আর কোট প্যাণ্ট পায়জামা। একজন হাবিলদার গোছের পাঠান ও এলো। সে রোজ প্যারেড করায় গৃহস্থ যুবকদের ধরে ধরে। আশ্বিন কার্তিক মাস তারা হৈচৈ করল। কিন্তু অগ্রহায়ন মাসে ধান কাটার আগে দল ভেঙে গেল। ধ্বজা ধরে নাচার চেয়ে ধান্য সঞ্চয়ে ঢের মজা। কিন্তু হাবিলদার গেল না।

তখন মন্নু সরিফ ডাকল জালালকে। জালাল জোত জমি হীন জেল ফেরত দাগী আসামী। সে দল জুটিয়ে খোদার নামে ভিড়ে পড়ল দেশের কাজে। দিনের বেলা তারা প্যারেড করে, রাত্রে দু একটা হিন্দু বাড়ীর গরু চুরি করে -- সুযোগ মত স্বজাতিরটাও বাদ দেয় না। পুলিশ এলে গম্ভীর ভাবে সবুজ টুপি পরে শান্তিও শৃংখলার নামে ফতোয়াজারী করে।

সময় সময় হয় ডাকাতি।

মন্নু যে তার মাকে এত ভয় করত তার কারণ ছিল। যারা ধনলিপ্সু তারা অতি সহজেই সংকুচিত হয়ে পড়ে তাদের চেয়ে বড় কারুর বিরাগ ভাজন হওয়ার আশংকায়। মা বা ছেলের সম্বন্ধও এখানে অচল। ফতেমা বিবি ধনী মহিলা। তিনি অগাধ পৈত্রিক ধানী জমির মালিক। মন্নু সরিফ তাই চটাতে সাহস পায় না মাকেও।

সে মায়ের সুমুখ দিয়ে চলে এলো। উঠানটা বেশ বড়। তা পেরিয়ে সে কাছারী বাড়ীতে এসে উঠল। কাছারী বাড়ীর সুমুখে বিস্তীর্ণ ধানী জমি। দরজার রাস্তার দুপাশে বড় বড় খড়ের গাদা। বড় একখানা গোয়াল তার কাছেই রয়েছে খটখটে শুকনা।

মন্নু চিন্তিত মনে পায়চারী করতে লাগল। ইংরাজ আমলে তারা কি করেছে? স্বায়ত্ত শাসনের নাম ভাঙিয়ে ইংরাজের কালা ধলা কর্মচারীর মন জুগিয়ে চলেছে।

কংগ্রেস সরকার হলেও তাই করত। বর্তমানে যারা কর্তা হয়েছে তাদেরই তোয়াজ করে চলতে হবে। তাদের নীতি কি? স্বার্থ উদ্ধার এবং জন জীবনের সমৃদ্ধি আহরণ করা। আবশ্যক মত নানা কূট ও ঝুট কথা বলতে হয়। কাগজে কলমে তারা যা খুশি লিখুক কিন্তু তাদের আসল মতলবটা অন্তত ছকে ছকে চলতে হবে উচ্চাভিলাসীদের। তারা কংগ্রেস ত্যাগ করেছে—কারণ কংগ্রেস মূলত হিন্দু প্রতিষ্ঠান। এখন হিন্দুদের তাড়াতে হবে। নইলে আর্থিক নিস্কৃতি নেই বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমানদের। হিন্দু জমিদার জোতদার মহাজন থাকতে বাড়াতেই পারবে না মুসলমান ভূস্বামীরা। এত কাল চেষ্টা করে নাজেহাল হয়েই ত এই পন্থা! নইলে লীগ এবং কংগ্রেসে কোনই পার্থক্য দেখে না মন্নু। স্বার্থ ও রাজ নীতির ক্ষেত্রে ওরা দুদল তো প্রায় জ্ঞাতি-ভাই।

কুসুমপুরের মনবল ভাঙতে হলে এখন আঘাত করতে হবে অবনীশেখরের মেরুদণ্ডে। শুধু ধন সম্পত্তি লুট করলে অবনী দেশ ছাড়বে না—অপমান বেইজ্জত করতে হবে। এ সব কাজে তাকে এগিয়ে এসে কোন নেতা কিম্বা রাজ কর্মচারী প্রত্যক্ষ সাহায্য করবে না—কিন্তু পরোক্ষে খুশি হবে অনেক। এই খুশির খোসবু অর্জন করে সে লীগের মীনারে চড়বে।

তাই আপাতত সে মায়ের কথা ভুলে জালালের সংগে পরামর্শ করতে নিজেই খাল পারের দিকে এগিয়ে চলে সুমুখের রাস্তা ধরে।

সম্প্রতি লক্ষ্য তার রাজনীতি কিন্তু একি? মাধবীর কথা মনে হতে কেন ধিকি জ্বলে কামাগ্নি?···

জালাল বাড়ী যায় নি। একটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে ছিল। মন্নু কাছে যেতে সে তড়াক করে বেরিয়ে পড়ল। মন্নু ভয় পেল—বাঘ ভাল্লুক নাকি?

না।

দুজনে মিলে অনেক পরামর্শ হলো। শেষ পর্য্যন্ত মন্নু কিছুতেই স্ত্রীলোক এবং শিশুর ওপর অত্যাচার করতে বলতে পারল না। মনে মনে তার কেমন যেন গ্লানি বোধ হতে লাগল। তাই উর্মিলা আর মাধবীর কথা সে তুলল না।

অথচ সুযোগ পেল মনুষ্যত্বহীন জালাল। সে ভাবল: অর্থের ভাগ হবে ছাপান্ন রকম—মন্নু সরিফ নেবে, পুলিশে নেবে, বামাল যারা রাখবে তারা চাটা মারবে অর্দ্ধেকে কিন্তু মেয়েমানুষ দুটিকে বেমালুম গায়েব করতে পারলে ঐ হবে

তার পরম লভ্য। ক্রমে ক্রমে হিন্দুরা দেশ ছাড়লে তখন বের করবে বিবি করে। এ সেরা মালের সে সরিক করবে না কারুকে।

কবে ডাকাতিটা করা যায়?

আঁধার পক্ষ এলেই ভালো হয়। দলবল ও তো জোটাতে হবে।

ঐ সংগে আর দুখানা বাড়ী।

'সে তো সোনায় সোহাগা প্রিছিড়িং।'

দুজনে বিদায় নিয়ে দুদিকে চলে যায়।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতে পারে না মন্নু সরিফ। ধিকি ধিকি মনে ও দেহে জ্বলছে তার হুতাশন। হত্যা আনাচার লুণ্ঠন এমন ভাবে করতে নির্দেশ দিয়ে দেবে যে দুটো একটা বাড়ীর নজির দেখে খালি হবে পাঁচটা গ্রাম। এখানে সাধারণ ডাকাতির মত কাজ করলে চলবে না—চাই গো কোরবানী, নারী হরণ। হরণই যদি করা হয় তবে কে ভোগ করবে সেই নারী দেহ। আম্মার কঠোর মন্তব্যও নিষ্প্রভ হয়ে যায় লালসার চিতাগ্নির কাছে।

পরদিন মন্নু বলে, 'জালাল লুটের সেরা মাল কার—মাইয়া মানুষ?'

জালাল স্ফূর্তিতে জবাব দেয়, 'ক্যান দোস্ত—যে খাটে পেটে মেহনত করে তার।'

'না,—বাদ্‌শার।' কঠিন কুঞ্চন দেখা দেয় মন্নুর মুখে।

'তয় তাই।'

(১২)

মন্নুর সুমুখ থেকে উঠে এসে রাগে আক্রোশে জালাল ফুলতে থাকে—ছটফট করে ঘন্টাখানেক। কিন্তু পেশা যার ডাকাতি তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট রাখতে হবে এই ভদ্রবেশধারী গুণ্ডাদের। এরা খাটবে কম, খাবে বেশী এই তো এদের ধারা। শালারা কি ছারেখারে যায় না? জীবন ভর সে এমনি ঠকতে ঠকতে এসেছে। একবার ভাবল ছেড়ে দেবে এসব কাজ—আবার ভাবল, না, ধর্মঘট করবে ওরা দল বেঁধে এই জুলুম রাজাদের বিরুদ্ধে। আদায় করে তবে ছাড়বে ওদের স্থায্য বখরা। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ও সংহতির অভাবে তা হয়ে ওঠে না। আরও হয়না ঊর্মিকে দেখে। সে খালের ঘাটে বাসন মাজছে।

মন্নু 'যাতা-নৌকার' জন্য কিছুক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করে খাল পার হয় নিজের গামছা পরে মাথায় পরণের কাপড়খানা জড়িয়ে। ঠিক একটা কুমীর বলে ভ্রম হয় তাকে দেখলে।

'কি সরদারেরপো সোমাচার কি ?'

মন্নু সন্নিফের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আভাসে ইংগিতে সে উর্বশীর কাছে সব বলে। 'কলাগাছ রুমু আমি, বান্দর বাতুড় খেদাইয়া কাঁটা বন চিইর‍্যা পাকা ফল ঘরে আনুম আমি, আর উনি নেবেন বাছা বাছা মাল। কও তো উর্বশী এ ক্যামন বিচার ?'

'ছাড়লেই পার এসব হারামীর সংসগ্‌গ।'

জালাল এবার নিশ্চয় ত্যাগ করত অবিবেচক মন্নুর সম্পর্ক কিন্তু আজ তার চোখে বড় অদ্ভুত ঠেকল উর্বশীর রূপ। সে এইমাত্র নিতম্ব ভিজিয়ে খাল পারের খাড়াই ভেঙে জল নিয়ে উঠল। এ মেয়েটাও তো একটা লুণ্ঠনের সামগ্রী। মুচির মেয়ে হলেও কেমন কচি বয়স—রসাল ভংগী। একে বাগে আনতে পারলে হয়ত অনায়াসে পড়বে কলমা। আর এর ওপর হয়ত লোভ পড়বে না মন্নুর।

ব্রাহ্মণ কায়স্থের মেয়ে বৌতে ওর কাজ নেই—সে সব থাক বড় ওয়ালাদের জন্য।

সমানে সমানে পিরিত জমবে ভাল। জালাল আরও নানা কল্পনা করে।

ও যখন জেলে তখন ওর স্ত্রী ভাতের অভাবে মন্নুর বাড়ী বাঁদী হয়ে ঢোকে। এখন আর সে কথাও বলে না জালালের সংগে। একটা বিয়ের মন্ত্র পড়ে বাঁদীকে হারেমে তুলেছে—সে এখন পরদানসিনা। বিবি হয় নি,—যাতে বাঁদী গিরি ছেড়ে না যেতে পারে তাই মন্নু করেছে বিয়ে। সেই জৌলুসেই ভুলে আছে জালালের স্ত্রী। শাহানশা যদি এক রাত্রের জন্যও আসেন তবে ধন্য হবে তার সারা জীবন।

এজন্য জালাল খুব দুঃখিত নয়। তার স্ত্রীটি ছিল নাকি ভীষণ মুখরা।

নিজের বাড়ীর দিকে জালাল চলে যায়।

উর্বশী কিন্তু গুরুতর কিছু ধারণা করে না। কারণ ওর সামনে হামেশা ওরা এইরূপ নানা বিষয় আলোচনা করে।

বাড়ী গিয়েই জালাল চারটি খেয়ে একখানা বাঁশের লাঠি হাতে দল বল জোটাতে নামল। কাজটা শক্ত, বেশ পোক্ত পোক্ত লোক চাই। অন্তত পঞ্চাশজন।

'কি কর অপ্সরী ?'

'ওকি তুই যে বাক্স পেটারা নিয়া আইছ।'

'যামু কোথায় ?'

'ক্যান, কর্মকার বাড়ী হইল কি ?'

কর্মকারেরা লোহাগড়া কামার নয়—স্যাঁকরা। দেশী রূপার গয়না গড়াত। ওদের দোকান ছিল, বহুদূরে প্রায় সুন্দর বনের কাছে—বিলাবাদে। চারদিকে হাজার হাজার ঘর মুসলমান চাষী জোতদার, মাঝখানে শুধু একখানা ওদের দোকান। ইদানীং কে কে এসে যেন লুটপাট করে নিয়েছ ওদের সোণা, রূপা, কাঁচি, মায় কষ্টি পাথরটুকু পর্যন্ত। এই ঘটনায় স্থানীয় বিবেচক মুসলমানরা লজ্জিত। ওদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য বহু ভরসা দিয়েছ—তবু ওরা আর যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই দেশে এসে স্ত্রী পুত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে বেশী লোক জানাজানি না করে। এমন যে পরাণ তার কাছেও বলে যাওয়া ভাল মনে করেনি।

কুসুমপুরের এক ঘর ভাঙে, শংকায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে বাকী সমস্ত ঘর।

'আমার যে ঘর একখান পরাণ তুই থাকবি কই ?'

'আমিও তো মানুষ একটা।'

'তোর ঝামেলা কত—রোগী পত্তর, ওষুধ, বাক্স ডেক্স।'

'আর তোরও তো মক্কেল ছত্রিশ জাইত, ঝামেলা আমারই মত।'

'তাই বলি এক ঘরে কি কুলাইবে ?'

'খুব খুব, আমি দাওয়ায় থাকুম!' পরাণ বলে, 'বাক্সটা সাবধান উরবশী—আমি রোগী বাড়ী চললাম। আর শালারা মরেও না, আমি দুইডা দিন একটু জিরাইতেও পারি না। একবার আমার পা দুখানার দিকে চাইয়া ছাখ, তোরও মায়া হইবে।'

সত্যাই পরাণের পা দুখানা কেটে গেছে। খালের চরে খোলাম কুচির এবং ঘাস বনে মাঠে ঘাটে কি শামুক কাঁটার অভাব আছে ?

উর্বশীর ইচ্ছা করে ওকে আজ বারণ করে। অন্তত এ বেলাটা ও বন্ধ রাখুক রোগী বাড়ীর কাজ। কিছু বলার আগেই পরাণ অদৃশ্য হয়।

এ লোকটা কেমন ? এই না সেদিন যেতে চাইল দেশ ছেড়ে, অথচ দেশের বালক বৃদ্ধ যুবতীর এতটুকু দুর্গতির কথা কানে এলে ও আর সুস্থ থাকতে পারে

না। নিজের হাজারও দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ করে ছুটে যায়। বিচার করে না সময় অসময় হিন্দু মুসলমানের। পরাণ তবে দেশ ছাড়তে চেয়েছিল কেন? ওর জন্য? ও তো বাধ্য। শুধু ওর একটুখানি জেদ—জুলুম নয়, জবরদস্তি নয়, শুধু প্রেমিকার একটুখানি মনের সাধ, পরাণ নামুক। নেমে কুড়িয়ে নিক ধূলার মাণিক বুকে করে।

কি অপরূপ! এত যে দুর্যোগ, এত যে ঘনঘটা, তবু অকস্মাৎ প্রেম যেন চমকায়—কষ্টিপাথরে খেলে যেন সোণালী বিদ্যুৎ।

ইতিহাস পালটায় তবু প্রেম মরে না।

শশিশেখর সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন উর্বশীকে—উর্বশীও জিজ্ঞাসা করেছিল বহু জটিল প্রশ্ন। সে জেনেছে যে সে অন্ত্যজ হলেও তার অধিকার আছে দেবী পূজায়। আর পূজা কিছুই নয় শুধু একান্ত মনে মাকে ডাকা। ভোগ নৈবেদ্য যে কেউ সাজিয়ে দিতে পারে। সেই পূজার আজ আয়োজন করছিল উর্বশী। কেউ দেখবে না, সে একা একা ডাকবে মাকে।

এলো পরাণ—যাক, সেও বেরিয়ে গেল। দু একজন খদ্দের এসেছিল তাদের আজ সে নিষেধ করে দিয়েছে যে জুতো সেলাই, হাফ সোল বদলাই আজ বন্ধ। ও পাড়ার মোল্লা সাহেব খুশি হয়ে গেছেন উর্বশীর পরিবর্তন দেখে। যতই ঠেকা হক তিনি আবার কাল আসবেন। এ সময় বিরক্ত করবেন না মুচির মেয়েকে।

খুব ভোর বেলা উঠে উর্বশী ফুল তুলেছে, কলাপাতা কেটেছে। কলাপাতা ধুয়ে তার ওপর রেখেছে ফুল দুর্বা চন্দন। পিতলের থালে রেখেছে আতপ চাল এবং কলা। বাসনে বাসনে ছোট বড় নানা রকম নৈবেদ্য ফল মূল। বাগানে যা ছিল তার একটাও বাদ দেয়নি সে আনতে। আলপনা সে দিতে জানে না, তবু তার হাতের উলকির মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এঁকেছে অপটু হাতে নক্সি লতা। শুকনা ঘরে সাদা দাগ ফুটেছে চমৎকার। গন্ধ আসছে ধুনা ও গুগ্‌গুলের। প্রদীপ এবং জল ঘট সে জোগাড় করে এনেছে কুমার বাড়ী থেকে।

সারাদিনের উপোসী উর্বশী জ্বালল প্রদীপ সন্ধ্যা হলে।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বাড়ী সে ঘুরে ঘুরে যেমন করে পূজা করতে দেখেছে তেমনি পূত শুদ্ধ হয়ে পূজায় বসল এই অন্ত্যজা দুহিতা। ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ, পাঁজাল প্রদীপ পুষ্প চন্দনের কি যে মাধুর্য,—ও সব নিয়ে উজ্জ্বল দীপ শিখার সুমুখে যে-ই বসবে, সে-ই অপূর্ব হয়ে উঠবে আগন্তুক ভক্তজনের কাছে। উপবাসে যদি সে

ঈষৎ কৃশ হয়, যদি কণ্ঠস্বর সামান্য ক্ষীণ হয়ে আসে তার—তবে আরও অপূর্ব বোধ হবে তাকে।

উর্বশীকে ঠিক অমনি দেখাচ্ছিল।

সে মনে মনে মাকে স্মরণ করে সমস্ত উপচার নিবেদন করল। ওর মনে হলো মা তা গ্রহণ করল অন্তরালে থেকে। আনন্দে ওর উপবাসের কষ্টটুকু কি যে ভাল লাগছে!

এ সকলি হয়ত মিথ্যা—মিথ্যা দেবতা মিথ্যা ওর ভক্তি। কিন্তু মাধুর্য ও মাদকতা আছে বিশ্বাসী মূঢ় মানুষের মনের কাছে। রসবেত্তার কাছেও কি সুন্দর লাগে না? ক্ষয়িষ্ণু জীবনও তো বহু মিথ্যার রাঙ্‌তায় মোড়া। তার জৌলুসের পিছনে যদি মানুষ ছুটতে পারে তবে কি দোষ এই অজ্ঞান অন্ত্যজা কন্যার?

পরাণ এলো সন্ধ্যার একটু পরে। 'আর এক নম্বর বুঝি ঢং বাড়ল? খাব কি দে?'

উর্বশী থতমত খেয়ে গেল। ওর হাতের ছোঁয়া কি পরাণ খাবে? এই দধি, দুগ্ধ, মধু, ফলমূল? ওর ভাণ্ডারে তো ভোগের সমগ্রী সবই সঞ্চিত।

পরাণ বলল, 'সর সর, সইরা যা—ছুঁইস না আমারে।' সে নানাবিধ ভোগের জিনিষ টেনে নিয়ে খেতে বসল। খেতে খেতে বলল, 'তোর এ ঢং বজায় থাউক, নিত্য উর্বশী না হইলে পরাণ ডাক্তার বাঁচবে না রোজ রাত্রে রাইন্ধ্যা খাইয়া। সারা দিনের যম তাড়নার পর কি এই হাঁড়ি ঠেলা পোষায়?'

সত্যই উর্বশী ঘর থেকে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং দূর থেকে এগিয়ে দেয় এক-খানা কাটারী ডাবটা ফুটো করে খেতে।

পরাণ ওকে যতই অস্পৃশ্যা ভাবুক তবু মনে হয় ওর যেন ধন্য হলো সমস্ত আয়োজন।

খেয়ে দেয়ে পরাণ উঠে পড়ে এবং অল্প সময় বাদেই শোনা যায় তার নাকের ডাক।

শেষ রাত্রে উর্বশীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। 'না, না পরাণ তুই আমাকে নষ্ট করিস না, আমার আর ভাল লাগে না ও সব।' ওর বুকের ওপর থেকে দূরে ঠেলে ফেলতে চায় হিংস্র শ্বাপদের মত পরাণকে। অনেকক্ষণ ধরে ধস্তাধস্তি চলে। মেয়ে মানুষ হলেও উর্বশীর শক্তি কম নয়।

'মাইয়া লোক কি গোদুগ্ধ নাকি যে নষ্ট হইবে এক ফোঁটা অম্বলে! থাম, থাম অপ্সরী। পুরুষের সুখের সময় এমন প্রতিবন্ধক হইয়া কি পাপ করে কোন বুদ্ধিমতী নারী?'

কতক্ষণ আর উর্বশী বাধা দিতে পারে। সে যেমন স্ত্রীলোক তেমনি দেহী। ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করে। ধীরে ধীরে যেন উর্দ্ধলোকে চলে যায়।

* * * *

ভোরের এক ফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। ঘরের বেড়া মাঝে মাঝে ফাঁকা।

'পরাণ তুই কি এখ্যাশ ছাইড়া অন্য ঠাঁই যাবি?'

'ক্যামনে উর্বশী, ক্যামনে যামু ক' তো? আগে যা কইছি তা ফাঁক কথা।'

উর্বশী ভাবে ওর জন্যই বুঝি যেতে পারবে না পরাণ।

অথচ পরাণ ভাবে—এদেশের শিশু, বৃদ্ধা, যুবা, জায়া, প্রৌঢ়া—যত দুর্বল মুমূর্ষু যেন ওর সন্তান সন্ততি। ও যেন জটায়ু, ওর পক্ষ পুটে অসংখ্য ভীরু রুগ্ন শাবক ঝড়ে জলে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের ফেলে ও যাবে কি করে?

পরাণ সময় মত নিজের কাজে বেরিয়ে যায়। উর্বশী শয্যা ত্যাগ করেছে অনেকক্ষণ। সে গত রাত্রির পূজার আসবাব বাসন পত্র এবং নির্মাল্য ছুঁতে গিয়ে কেমন জানি সংকোচ অনুভব করে। পরাণ ওর কাছে এসেছে তো না যেন একটা বিরাট সর্বনাশ এসে উপস্থিত হয়েছে মূর্তিমন্ত হয়ে। উর্বশী ওকে কি করে এড়াবে তাই ভাবতে থাকে, আর মনে মনে বলতে থাকে, 'মা এই বারটি ক্ষমা কর আমার সকল অপরাধ, আমি অধম সন্তান।'

(১৩)

বামা চরণ গোপ একটা মহা সমস্যায় পড়েছে। একবার তার আনন্দ হচ্ছে আবার ভয় হচ্ছে কোন ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করে বসে নাকি। তাই সে ভোর বেলাই চলল পণ্ডিত বাড়ী।

সংগে সংগে চলেছে জগাই মাধাই। এরা দুইটি তো ভাই নয়—বন্ধু। বিংশ শতাব্দীর বন্ধু। থাকে সহরে তাই ওদের মধ্যে সংগতি ও সৌহার্দ অনবদ্য। বাড়ী ওদের কুসুমপুর। বসুবংশের ছেলে। বছর আষ্টেক আগে ওরা দেশের

প্রায় সব কটি বিধবাকে অল্প পয়সায় তীর্থে নিয়ে যাবে বলে সকলের সংগে মাতা পুত্রের সম্বন্ধ পাতায়। সব বিধবারই প্রায় একটা স্বকীয় পুঁজি থাকে। ওরা তা ধীরে ধীরে অতি সংগোপনে হাত করে। পাঁজি দেখে দিন একটা স্থির করা হয়—অনেক দূরের পথ, এর একটা প্রয়োজনও আছে। সকলে মনের আনন্দে বোঁচকা বুঁচকি বাঁধে। কেউ কেউ দাঁতের মিশি গুঁড়িয়ে নেয় সম্বৎসরের। যাবে অনেক দূর—পথে হয়ত খাবে না, তখন এই মিশিই তো ভরসা। ভোলার পিসী দোক্তা কিনলেন প্রায় আড়াই সের।

যাত্রার দিন দেখা গেল, যাত্রীদের ফেলেই জগাই মাধাই গত রাত্রিতে চম্পট দিয়েছে তীর্থে।

দীর্ঘ আট বছর বাদে আবার ফিরে এলো। ওরা এখন নাকি কম্পাউণ্ডার। শিখেছে ভাল কাজ, নইলে এত পয়সা আনল কি করে? বিধবাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, এসেই সেই সব মায়েদের খোঁজ নিয়েছে। অনেকে ভুলে গেছে, কেউ কেউ আবার ভোলেনি, কিন্তু কেমন যেন সংকোচ করেছে এতদিনের পরতা টাকা চাইতে। তবে জগাই মাধাই বিবেচক। দেশে এসেই ঋণ শোধের প্রতিশ্রুতি জাহির করেছে। তাতেই আপাতত সকলে তুষ্ট। তাই উচ্চাসন দিচ্ছে আদর যত্ন করছে বিধবা মায়েরা।

বামা চরণ গোপ বিধবাও নয় এবং স্ত্রীলোকও নয়—প্রশ্ন উঠতে পারে ওর সংগে তবে কি সম্পর্ক জগাই মাধাইর? মা বলে কি ডেকেছিল ওরা এই বুড়ো গোয়ালাকে?

তাও নয়।

ডেকেছিল বাপ বলে। আসল বাপও নয়—ধর্মের। বামা চরণ তাই কিছু টাকা এদের খুশি মনে ঋণ দিয়েছিল সেই বছর আষ্টেক আগে। আহা! অল্প বয়সে যাবে তীর্থে।

এবার দু বন্ধুতে এসে সে টাকা সুদে আসলে শোধ করে দিয়েছে। এ ঘাটে আর তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জল ঢালেনি, বলেনি, এই তোমাদের আগামী কালই শোধ করে দেব। এখনও তারা অজস্র টাকা ব্যয় করতে রাজী - যদি বৃদ্ধ গররাজী না হয় নিতে।

তারা বিয়ে করতে চায়। কায়স্থ বামুনের মেয়ে নয়, নিকৃষ্ট জাতের—আবার সধবা নয়, বিধবা। যুদ্ধ গেছে, তেরশ পঞ্চাশ গেছে, হাড়ে বাতি জ্বলেছে সকলের,

এখন নাকি দেশ হয়েছে স্বাধীন—ওরা দুটি বন্ধুতে মতে এবং স্পর্দ্ধায় দেখাবে স্বাধীনতা তাই এসেছে গ্রামে।

ওরা বামা চরণের মেয়ে দুটির পাণি প্রার্থী।

শোনা মাত্র বামা চরণ চমকে উঠেছিল। তারপর অনেক বোঝাতে, খানিক বুঝেছে। এর জন্য দু বন্ধুতে খেটেছে কি কম! নজির দেখিয়েছে ভুরি ভুরি। তাদের ডাক্তারের কত বড় যে বাড়ী তাও অনেকবার বলতে হয়েছে। কলকাতায় নাকি বাসার সমস্যা, সে সব সমস্যা জগাই মাধাইর নেই। ইচ্ছা করলে বামাচরণও সংগে যেতে পারে, থাকবে তেতালায় উঠে।

নামবে কি করে শারীরিক প্রয়োজনে?

'সে জন্য ভাবনা কি!' জগাই হেসে জবাব দিয়েছে, 'কল পাইখানা তেতলায় আছে।'

বামা চরণ মন্তব্য করেছে, 'ভাল ভাল।'

পরের দিন আবার তার মন খারাপ হয়েছে। এত বড় মন্বন্তর গেল, যুদ্ধের জন্য এখনও জুলুম চলেছে জীবন ধারণে অভাব গেছে নানা রকম তবু সে তার গরুটি বিক্রি করেনি। কলকাতা গেলে গরুটার কি ব্যবস্থা করে যাবে?

প্রশ্ন শুনে জগাই মাধাই সমস্বরে প্রাঞ্জল উত্তর দিয়েছে। 'কেন বেচে দেবেন।'

বামা চরণ একেবারে নেচে উঠে জবাব দিয়েছে, 'যাও বাপু যাও— তোমাদের সাথে কাজ হইবার নয়।'

'তবে এক কাজ করুন, সংগে করে নিয়ে চলুন--রেল ষ্টীমারে আর ক' টাকা ভাড়া?'

তবু বিমর্ষ হয়ে থাকে বামাচরণ গোপ।

'এখন আপনার আপত্তির কারণ কি?'

'তোমরা তো ভাবছ ভাড়ার কথা—আমি ভাবি সিঁড়ির কথা—তেতলার সিঁড়ি...।'

'সিঁড়ি!' দুজনে আশ্চর্য হয়।

'হ্যাঁ, গরু আমার সিঁড়ি বাইয়া ওঠবে ক্যামনে?'

'গরু থাকবে গোশালায়।'

'আর, আর আমি থাকমু তেতলায়? তয় বাপু হইবে না।'

'না, না, আপনিও থাকবেন গোশালায়।'

'কি, আমি কি গরু নাকি ?"

'একথা ভাবী শ্বশুরকে কি বলতে পারে কোন জামাই ? 'আপনি নীচের তলায় থাকবেন, সদা সর্বদা তত্ত্বতালাশি করবেন মা লক্ষীর।'

বামাচরণ এবার হেসে লাঠিখানা চেয়ে নেয়।

ওরা তিনজনে যখন পণ্ডিত বাড়ী এসে ওঠে তখন কোন্দল শুনতে পায় চাঁপার।

সেই বন-বুখরী।

ইসমাইল চুপ করে মাথা নীচু করে একটা কঞ্চি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। আর চাঁপা বলছে, 'হ্যা অসময় না ছাই! আমাকে তুই ফাঁকি দিচ্ছিস কাঁটা জংগলের ভয়ে।'······

বন-বুখরী যদি কোথাও আজকাল পেকে থাকত জংগল তো ছার, বাঘের ডাকেও ভয় পেত না ইসমাইল! এনেই দিত চাঁপাকে।

'দিদি ঠারইন ছোট গোসাই কোথায় ? একটু ডাইক্যা দাও।'

'বস, বস বামাচরণ—এই যে আমি ঘরেই আছি, বস বস জগাই মাধাই।' অবনীশেখর বেরিয়ে এলো। সে এসে শুনল সব। অবনী পণ্ডিত হলেও তার নিজস্ব কোন মত ছিল না। বুঝল বামাচরণের ইচ্ছাটা কি। তারপর বলল, 'আজকাল বিধবা বিবাহ তো হামেশা হচ্ছে। জাতি বর্ণ অনেকেই মানছে না।'

তার স্ত্রী উর্মিলা বলে, 'এখন এসব উঠে যাওয়াই ভাল।'

অবনী বলল, 'দিন কালের গতি বুঝেই চলতে হয়। তুমি দৃষ্টিহীন, তোমার এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আজকাল চোরের জ্বালায় একটা বড় বাড়ীর ফল-ফলাদি বেচেও একটা লোক খেয়ে থাকতে পারে না—তুমি দেও ওদের পাত্রস্থ করে।'

'তারপর ?'

'তুমিও সংগে যাবে।'

'দ্যাশ ছাইড়া ?'

'অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে বহু যোগ্য লোকই তো দেশ ছাড়ল—তুমি তো তৃণাদপি তৃণ।'

'না আমি যামু না ছোট গোসাই, মাসে মাসে ওরা কিছু পাঠাইবে।'

'এই তো আমার বাবার মত কথা বলছ তুমি। এ বন্দোবস্ত হলে চংকার। কি জগাই মাধাই পারবে তো ?'

'তা আর পারব না ঠাকুর গোসাই, তবে আর এতকাল শিখলাম কি ?'

অবনী শেখর তামাক খাওয়াল সকলকে। সে ও বড় খুশি হল, বলতে গেলে প্রায় দুইটি অরক্ষিতা বিধবা যুবতীর একটা পথ হলো। ঈশ্বর মংগলময়, তাঁর দৃষ্টি আছে, নইলে চক্রের মত ঘুরছে কেন গ্রহ তারা ? সুখের পর কেন আসছে দুঃখ ? আবার দুঃখের পর সুখ ?

'তোমরা কি কর ?' অবনীশেখর জিজ্ঞাসা করল।

'কম্পাউণ্ডার, এ্যাট দি সেম টাইম ম্যাসেজ মাষ্টার।'

সকলেই ভাবল চাকরীটা বেশ মোটা দরের। অবনী বলল, 'অর্থটা বাঙলা করে বুঝিয়ে দাও।'

এবার মাধাই জবাব দিল, 'আপনারা সূর্য চিকিৎসার কথা শুনেছেন, এ হচ্ছে ব্যায়াম চিকিৎসা—তার কম্পাউণ্ডার, অর্থাৎ মাষ্টার মানে শিক্ষক।'

'মাইনে কি পাও এক একজনে।'

'লজিং ফুডিং ফ্রী, পে নাইনটি।'

অবনী বিরক্ত হল—আবার ইংরাজী।

'খাওয়া দাওয়া হোটেলে, মাইনে নব্বই!'

'সেও তো খুবই ভাল। খাওয়া দাওয়া ছাড়া নগদ নব্বই টাকা। আর চিন্তা করো না বামাচরণ—শুভস্য শীঘ্রম্।'

সেই সময় রকমান এলো দুধ নিয়ে। সে একটু একটু করে ভাল হচ্ছে। বামাচরণের সংগে দুটো কথাবার্তা হলো। বামাচরণ মন্তব্য করল, 'আগের ধারাটা এখনও বজায় রাখছ মিঞা! সকলে কিন্তু তা পারে না।'

'পণ্ডিত গোসাই স্বগ্গে গেছেন—নাতি দুইডি তো আছেন। আমরাও তো মহব্বতের জন।'

আর দেরী না করে সেইদিনই গোধূলি লগ্নে অমলা ও ধবলার বিয়ে হয়ে যায়। পৌরহিত্য করে স্বয়ং অবনী। বিয়ের পরই তাদের নিয়ে রওনা হয়ে যায় জগাই ও মাধাই।

অবনী বাড়ী ফিরে আসে।

উর্মিলা জিজ্ঞাসা করে, 'শাঁখের শব্দ শুনলাম কোন বাড়ী ?'

'কেন বামাচরণ গোপের মেয়ে দুটির বিয়ে হলো যে, তুমি জান না ?'

'কই, আজ যে হবে তা তো বলনি। একেবারে এত তাড়াতাড়ি ?'

'শুভ কাজে···'

'আমি তো বাধা দিতাম না, জানলে বরঞ্চ দেখতে যেতাম। এ অঞ্চলে একটা নতুন কিছু হলো বটে, এমনি করেই দিন দিন সমাজ এগোচ্ছে।' একটু পরে আবার উর্মিলা বলে, 'তুমি পৌরহিত্য করে এলে, নিশ্চয় অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে তোমার? জগাই মাধাই কি করে? সংসর্গ গুণে স্বভাবের কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে।'

'ওরা ম্যাসেজ ক্লিনিক না কিসে যেন চাকরী করে। ব্যায়াম চিকিৎসা মন্দির।'

সহসা উর্মিলার চক্ষু স্থির হয়ে যায়। 'সর্বনাশ পারলে ওদের ফিরিয়ে আনো।' ধর্মান্তরিত হওয়ার চেয়েও যে এ জঘন্য ব্যবসা। ওরা তোমাদের ফাঁকি দিয়েছে।' উর্মিলা গতবার বাপের বাড়ী বসে কার মুখে যেন এ পাপ ব্যবসার কথা শুনে এসেছে।

কিন্তু উপায় কি? তখন ওরা অনেক দূর এগিয়ে পড়েছে।

(১৪)

মন্নু শরিফ বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ঘরে মায়ের কঠোর পৌরাণিক মনবৃত্তি—বাইরে নবাগত পুলিশ সাবইনেসপেক্টরের হিন্দুপ্রীতি। তারা মতবাদের ধার ধারে না, চায় মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে। গত কাল নতুন দারোগা সমস্ত এলাকার বড় বড় মিঞা এবং মৌলভীদের ডাকিয়ে নিয়েছিলেন। একটা সভা হয়েছিল থানায়। মুসলমান জোতদার জমিদারও বাদ যায়নি। সমস্ত ইউনিয়নের চৌকিদার দফাদারও হাজির ছিল সে সভায়।

তিনি বলেছিলেন—

আমি পশ্চিম বাংলার বাসিন্দা। এখন পর্যন্ত আমি সাহস করে আমার স্ত্রী পুত্র পাকিস্তানে নিয়ে আসিনি। এর অর্থ এ নয় যে আমার বন্দুক বেয়নেটের অভাব—আপনারা জানেন যে একটা এলাকার আমিই সর্বময় কর্তা, ইচ্ছা করলে যত বড় মাতব্বরই হক না কেন তার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে চালান দিতে পারি, পাকিস্তান সরকার অন্তত এটুকু ক্ষমতা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতা দিয়ে বশ্যতা যে অর্জন করা যায় না তার উদাহরণ মহাত্মা গান্ধী। গতবার

কলকাতায় হিন্দু ভাইরা আবার যখন রায়ট আরম্ভ করল তখন তিনি অনশনে দেহত্যাগ করবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। অমনি রায়ট থেমে গেল। এ যেন রীতিমত যাদুমন্ত্র! সারা দুনিয়া আশ্চর্য হয়ে গেল—হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, এ্যামেরিকা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স!'

কলু বাড়ীর একটি পাঁঠা ও একটা ছাগল অমনযোগী ছাত্রের মত গোলমাল করতে করতে এদিকে আসছিল, একজন দফাদার উঠে দুটোকে তেড়ে গেল।

'প্রেম দিয়ে মানুষকে জয় না করতে পারলে শক্তি দিয়ে বশীভূত করে রাখা যায় না এ কথাটা আপনারা ভেবে দেখেছেন?'

দুজন মাংসলোলুপ মাতব্বর আলোচনা করতে লাগল যে পাঠা ও ছাগলটার গায় কতখানি গোস্ত হতে পারে এবং এ বাজারে তার দামই বা কত হতে পারে?

'কুড়ি কুড়ি চল্লিশ!'

'আপনারা মনযোগ দিয়ে শুনুন—কোন রাষ্ট্রই ধর্মের দোহাই দিয়ে অধর্ম করতে পারে না। অন্তত তা করলে সে রাজত্ব কিছুতেই স্থায়ী হতে পারে না। আপনারা হিন্দুদের মনবল ফিরিয়ে আনুন। স্বাধীন হয়েছেন, পাকিস্তান কায়েম হয়েছে—জগতের কাছে নিজেদের উঁচু করে তুলুন। হিন্দুরা তো ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে কম জান কোরবানী দেয়নি। তারা আপনাদের বন্ধু, ভাই। আপোষে ভাগ হয়েছেন—আপোষে পাশাপাশি বাস করুন।'

'যাওয়ার সময় বকরীডার দর জাইনা গেলে মন্দ হয় না—সামনের চাঁদে আমার নাতিডার ছুন্নাৎ।'

মন্নু শরিফ খাসি পাঁঠা দর করা মাতব্বর নয়। সে অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি লীগের নীতি মানি নাই দারোগা ছাহেব?'

'না, না, তা কে বলছে—এ এলাকা তো জলের মত ঠাণ্ডা রয়েছে।' দারোগা চকিতে মন্নুর মুখের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মন্নুর প্রশ্নটা ঠিক সরল নয়।

'আপনে পরিবার আনেন নাই ক্যান? আমরা কি আমাদের কসুর জানতে পারি হুজুর?'

দারোগা বিস্মিত হয়ে জবাব দেন, 'কার কসুর?'

'এই আমাদের—লীগের।'

এত বড় একটা এলাকার মালিককেও কাবু করে ফেলে মন্নু শরিফ। ধূর্তের

বাক্যজাল ছেদন করতে পারেন না দারোগা সাহেব। কেবলই জড়িয়ে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। আশংকা হতে লাগল চাকুরীর।

'লীগের কথা বলছি নে, বলছি নীতি বিগর্হিত কাজের কথা।'

'আপুষে কি পকিস্তান কায়েম হইত?' একটা ক্ষুরধার হাসি খেলে যায় মন্নুর চোখে।

দারোগা সাহেব বোঝেন ঐ হাসির ধারের কাছে কেটে খান খান হয়ে যাবে একটা নবগঠিত রাষ্ট্রের মর্যদা ও সম্মান। আপোষে হয়ত পাকিস্তান কায়েম হতো না—কিন্তু বিনা আপোষে যে টিকবে না ওর স্থায়িত্ব। দারোগা সাহেব এবার একটু দৃঢ় স্বরে বলেন, 'আমার এলাকায় কোন হুট-হুজ্জং হতে আমি দেব না। তার জন্য যদি চাকরীতে ইস্তফা দিতে হয় দেব--দিয়ে চলে যাব দেশে স্ত্রী কন্যার কাছে।'

'গোস্ত কমছে কম এক একটায় আধমণ।'

'বেশীও হইতে পারে বকরীডার গায়....' বলাবলি করে মাতব্বরেরা।

অনেকক্ষণ ধরে মিটিং চলছিল। এমন মিটিংয়ে মাতব্বরেরা ঢের উপস্থিত হয়েছে। কাপড়, কেরোসিনের কথা হলে ভাল লাগত। কেবল মামুলি জলো বুলি। কেউ হাই ছাড়ল, কেউ টুপি খুলল। এখন সভা ভাঙলেই জ্বালা যেত। তাদের কারুর তো হিন্দুর উপর ক্রোধ নেই, আর হুটহুজ্জংও করতে চায় না পরশীর সংগে। তবে তাদের বৃথা ডেকে এনে লাভ হলো কি?

'আপনারা কি চান?'

'শান্তি—সদ্ভাব।' এই কথাটাই শোনা গেল প্রায় সকলের মুখে।

সভা ভাঙল। 'আদাব, আদাব।'

দারোগা সাহেব লক্ষ্য করলেন যে, শুধু মন্নু শরিফ কিছু বলল না। সে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। ভীড় সরে গেলে মন্নু জিজ্ঞাসা করল, 'লীগের নীতি কি দারোগা ছাহেব পছন্দ করেন না?'

'কেন করব না।'

'তবে এ সব বলেন কি?'

'কি বললাম বলুন তো?'

'এই সব আগরম-বাগড়ম।'

দারোগা সাহেব থতমত খেয়ে যান।

'লীগের আপনে কি জানেন?' দুটি অগ্নি স্ফুলিংগের মত মন্নুর চোখ জ্বলে ওঠে। 'জানেন না কিচ্ছু আইছেন শুধাশুধি দারোগ্‌গিরি করতে। এ হিন্দুস্তান না, আমরা তোষামুদির ধার ধারি না।'

দারোগা সাহেব মূর্খ নন—কলকাতার ছাত্র। তিনি আবার দৃঢ় হন। 'তোষা-মোদের ধার ধারেন না, কিন্তু আমাকেই যেন আবার আপনার খোষামোদ না করতে হয় মিঞা ছাহেব। ভাগ্যক্রমে যে রত্ন অর্জ্জিত হয়েছে, অবিবেচনায় তা কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। আবার যেতে দেব না বিদেশী বেনের হাতে।'

'বাইন্যা কইলেন কারে?'

এবার ক্রোধে কাঁপতে থাকেন দারোগা সাহেব।

'ও, বুঝছি।' বলে মন্নু একটু হাসে। দারোগা সাহেবের আর একটু কাছে এসে, গলাটা সামান্য খাদে নামিয়ে আবার বলে, ঐ 'বাইন্যা ছাড়া কি এত সূক্ষ্ম বুদ্ধি খেলত আমাগো মাথায়? কাঁটা দিয়াই কাঁটা তোলতে হয়।'

দারোগা সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে চলে যান।

তাই মন্নু শরিফ চিন্তিত।

সভা থেকে ফিরে সে জালালকে খবর দিল একজন চৌকিদার পাঠিয়ে। দু' দোস্তে কোথায় বসে পরামর্শ করবে? খাল পার হলো ডোঙা নায়ে। উর্বশীর বাসা বেশ নির্জন স্থান।

উর্বশী পান তামাক দিয়ে নিজের কাজে গেল। এমন পরামর্শ ওরা সর্বদাই এখানে বসে করে। উর্বশী তাই তেমন লক্ষ্য করে না ওদের কথায়।

প্রত্যেকটি কথা জালাল বেশ মন দিয়ে শুনল। সে বলল যে এ কাঁটা না তুলে কোন কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। এর আগের দারোগাটা ভাল ছিল। মন্নু শরিফকে সে জেলায় যেতে উপদেশ দিল। পরামর্শটা ভাল। মন্নুও তাই ভাবছিল।

সে রাত্রেই ষ্টীমার ধরল মন্নু।

সদরের ইনেসপেক্টর সাহেব পশ্চিম পাঞ্জাবের একজন পাঠান। হালে টাউনে এসে একখানা প্রাসাদের মত বাড়ী দখল করে বসেছেন জরুরী নোটিশ দিয়ে। বাড়ীখানা ছিল নাকি এক হিন্দু জমিদারের। এ বাজারে দাম হবে হাজার পঁচিশেক টাকা। কিন্তু সদাশয় সাহেব দেবেন মাত্র মাসিক পনের টাকা। তাও সময় মত আদায় হয় কিনা সন্দেহ।

মন্নু যাওয়ার আগে এই এলাকার জন পঞ্চাশ প্রতিষ্ঠাবান লোকের নাম জাল করে একখানা দরখাস্ত লিখে নিয়ে গেল। অভিযোগ মাত্র একটি, কিন্তু তা অমোঘ।

নতুন দারোগা ছৈইদালী সাহেব হিন্দুস্থান পাকিস্তান এক করতে চান।

ইনেসপেক্টর সাহেবের মন্নু শরিফকে চিনতে কষ্ট হলো না। থানার ভূতপূর্ব এ, এস, আই এসেছে এখানে বদলি হয়ে। সে বাঙলা ভাষার উর্দ্দু তর্জ্জমা করল। অমনি বাঙালী মুসলমান মন্নু যেন পাঞ্জাবী পাঠানের দোস্ত হয়ে দাঁড়াল। তিনি তাকে একেবারে কাছে টেনে বসালেন।

'বড়া তাজ্জব কি বাৎ মৌলভী ছাহেব !'

মন্নু শরিফ সম্বোধনটা শুনে খুব খুশী হয়। এই তো আসল মুসলমানী ভাষা। কিন্তু সে গম্ভীরভাবে জবাব দেয়—

'এ আর হইবে না—যেমন জুটছে আপনাগো সব সাংগাৎ ! এত কষ্টে জান কোরবানী দিয়া ভাগ করলাম আমরা, এখন ওনরা চান যোগ করতে !' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মন্নু।

'বড়া তাজ্জব কি বাৎ !'

মন্নু বিরক্ত হয়। এ বেটা পাগল নাকি, এক কথা বারবার বলে।

ইনেসপেক্টর সাহেব বাঙলা দরখস্তটা পড়তে চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে শুধু হিজিবিজি ঠেকে বাঙলা হরফ। অথচ সগর্বে দখল করে বসেছেন সেই দেশেরই তক্ততাউস। এ ও ঠিক সহ্য হয় না মন্নুর।

ইনেসপেক্টর সাহেব মন্নুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পুলিশ সাহেবের কাছে যান।

মন্নু শরিফ খুব সমীহ করে বলে, 'জনাব এই তো খবর। পাকিস্তানের দুশমন আমরাই।'

'রিয়েলি ভেরি সিডিসাস্ ইনেসপেক্টর। নাউ ··?'

আরও কি যেন হাউ হাউ করে বললেন ইংরাজীতে দুজনে, মন্নু তা বুঝল না। তবে উদ্দেশ্যটা সফল হলো। সে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরল রাত্রে।

সাম্যবাদী দারোগা নাকি সাসপেণ্ড হয়েছে।

আসার সময় নদীর পারে অন্ধকারে কে যেন একটা দোনালা বন্দুক গুঁজে দিল মন্নুর হাতে। মন্নু শিউরে উঠল বন্দুকের মসৃণ নলটা হাতে লাগায়। এ বস্তুটা ইংরেজ আমলে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল মন্নুর, কিন্তু আজ পাচ্ছে বিনা আয়াসে। খোদার কি মেহেরবানী ! মন্নু পাকিস্তানের জন্য জান দিলেই বা

কি! সে আনন্দে নেচে উঠতে চায়। সে মনে মনে দীর্ঘ জীবন কামনা করে লীগের।

ভোর বেলা জালাল এসে শুনে খুব খুসী। সে ফুর্তিতে হাতের লাঠিটা ঘুরাতে ঘুরাতে উর্বশীর কাছে গিয়ে হাজির হয় লাফাতে লাফাতে।

'বড় ফালাও (ফুর্তিতে লাফান) যে?'

'আহা মরি মরি তুই যে আমার প্রেমের নাগরী
গাগরী ভাসাইলাম আর কি জলে

মনে প্রাণে যার একটা অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে—হৃদয় যার রসান্বিত হয়ে উঠছে নতুন ঐশ্বর্যে তার কাণে কেন ভাল লাগবে জালালের কথা? উর্বশী পাশ কাটিয়ে চলে যায়। রীতিমত তার মনে একটা ঘৃণা সঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে এসব সংসর্গ আর চায় না। জীবনের অনেকগুলি দিন তো সে অপচয় করে দেখেছে।

জালাল আবার গান গেয়ে হেসে হেসে এগিয়ে আসে উর্বশীর কাছে—

'ও যুবতী মরি মরি, তোমার গমক ভারি, ঠমক ভারি
কালার সাথে করলে আড়ি
ভাঙবে তোমার জারিজুরি
ও যুবতী মরি মরি…'

'মর গিয়া গাঙে ডুইব্যা, এখানে কি চাও?'

'ও বাবা তুই যে বেদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী হইছ! কুমার বাড়ী শোনলাম, পূজা-আচ্ছা কর—তোর হইল কি উব্বশী? ও আমার আসমানের শশী?'

উর্বশী নিরুত্তরে নিজের কাজ করে যায়।

'সোনা পাকিস্তানে থাকতে হইলে আমাগো উপর গোসা করইয়া থাকা যাবে না।'

'ক্যান, এডা কি তোগো বাজানে গো তালুক?'

'পরান বাজানও তো একলা নীলামে খরিদ করে নাই তোর তালুকটা।' দাড়ির পাশ দিয়ে একটা তীব্র লালসাপূর্ণ শ্লেষের হাসি নির্গত হয় জালালের।

'জালাল, হাজার হইলেও পরান আমার স্বাজাতি।'

'বেশ্যার আবার স্বজাতি!'

'হুঁ, দিন কালের গুণে সবই হয়—হইবে না ক্যান? না হইলে তোর চোট্টায়

দিনে তুফারে উঠানে দাঁড়াইয়া কইতে পারে যা তা!' অভিমানে অসম্মানে উর্বশীর বাকরোধ হয়ে আসে।

পরান শুধু ওর স্বজাতি নয়—একটা মানুষের মত মানুষ। তার তুলনায় মন্নু কিম্বা জালাল কত ক্ষুদ্র, কত নীচ! আজ তারতম্যের মাপ কাটিতে পড়ে, পরানের সমস্ত লাম্পট্য ও শাঠ্য ছাপিয়ে একটা মহত্তর রূপ ভেসে ওঠে উর্বশীর চোখে। সে রূপ হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়—জাতির কোনও গণ্ডীতে সে রূপকে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। সে যে মানুষের অপরূপ রূপ। জালালের মত যারা, তারা কি করে কল্পনা করবে সে শ্রী? উর্বশী তা পেরেছে, কারণ ইদানীং সে তার অজ্ঞাতে সমস্ত জাতির উর্দ্ধে চলে গিয়ে যে মানুষের ওপরই আকৃষ্ট হয়েছে। তার দরদী মন যেখানে ভয়, সেখানেই যে শংকাহরণ হয়ে বাহু বাড়িয়ে দিয়ে চায়।

'থাউক, থাউক, তোর থিক্যা কত সুন্দার জাতে কুলে মানে ছেষ্ট বাওনা কায়েতের মাইয়া 'দেবে আমাগো গলায় মালা। উর্মিলা মদবীরে তো চেনো ..' কথাটা শেষ না করেই জালাল উঠে পড়ে। নামে গিয়ে মাঠের পথে।

উর্বশী শিউরে ওঠে। বলে কি জালাল! এ তো ঠাট্টা তামাসা নয় ঠিক। উর্বশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। 'শোন সরদার, কি কইলি জানি, কার কার নাম?' সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না, আবার অবিশ্বাসই বা করবে কি করে নিজের কানকে। পূবের প্রান্তরে উন্মুক্ত সূর্য রশ্মির দিকে সে চাইতে পারছিল না তবু আবার ডাকল, 'সরদার! ও সরদার!'

উত্তর দিল না জালাল। সে যে ডাক শোনেনি, সম্বোধনের উচ্চগ্রামটা তার কানে যায়নি তা নয়—দেখল মজা। উর্ব্বশী একটু টাটাক্।

একি রহস্যালাপ, না এর পিছনে কোন সত্য ঘটনার শরজাল রয়েছে তা বুঝতে পারল না উর্বশী। অনেকবার তার মনে হল নিশ্চয় তামাসা। তবু আকুল হয়ে রইল তার চিত্ত। একবার ভাবল পরান এলে বলবে। সে হয়ত কতকটা রহস্য ভেদ করতে পারবে। কিন্তু নানা অবান্তর প্রশ্নের ভয়ে উর্বশী স্থির করল এসব আর উল্লেখ করবে না ওর কাছে। এ কথার সংগে যে দুটি অতি পবিত্র স্ত্রীলোকের মান মর্যাদা জড়িত। হঠাৎ যদি একটা আহাম্মকে বেফায়দা কিছু বলে গিয়ে থাকে তা চেপে যাওয়াই ভাল।

একটা স্থির সিদ্ধান্ত করেও উর্বশী মনে মনে জ্বলতে লাগল! দেখ, একটা লম্পট ডাকুর কি সাহস বেড়েছে!

রাজা নেই যে নালিশ করবে, উপযুক্ত লোক নেই যে শালিশ মানবে। এসব কথা দারোগা পুলিশ কানে তুলবে না মোটে। আজ বলে নয়, কোনও কালেই তারা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্তত চুরি-চামারী হলেও কিছুটা গুরুত্ব দিত। এ আর এমন একটা কি!

কিন্তু বিচার হত নানাজী বেঁচে থাকলে। তিনি ছিলেন মনু শরিফের বাবা। যেমন বাঘের মত ছিল তাঁর গোঁফ জোড়া, তেমনি মানুষ ছিলেন রাশভারী। লুচ্চা-লম্পটের জারিজুরি (আস্ফালন) টিকত না তাঁর আমলে।

নইলে উর্বশীরা বিচ্ছিন্নভাবে এই খাল পাড়ে কিছুতেই এতদিন টিকতে পারত না। তারা হিন্দু হলেও তাদের আসল বন্ধু ছিল মুসলমানরা।

খালের জল তেমনি বইছে, তেমনি ফলছে ফসল মাঠে, সূর্য উঠছে, পাখী ডাকছে, চাঁদ উঠছে আগের মতই আকাশে। কিন্তু কেন মনে হচ্ছে আজ ওরা এত অসহায়? কেন প্রাণে খোঁচা দিচ্ছে নানা ভয় ও ভাবনায়?

ও সব কিছু নয়। চারদিকের ডামাডোলে ওরা অস্থির। তাই জালালের কথাগুলো অত তীব্র ঠেকেছে কানে। আদপে তো প্রায় পুরুষই মাংসলোভী— কারুর নাম জালাল, কেউ বা পরান। ওদের মুখ দিয়ে হামেশা লোভের কথা বেরিয়ে আসে, চোখ দিয়ে ঝরে অমার্জনীয় দৃষ্টি। উর্বশীর অভিজ্ঞতা প্রচুর—সে উঁচু স্তরের জীব বলে ভ্রম করে না একটিকেও। জালালের সংগে সংগে সে কেন জানি টেনে নামিয়ে এনে আঘাত করে সকলকে।

ওদের বেফায়দা ঘেউ ঘেউতে ও কান দেবে না মোটে।

দিনটা কাটল উর্বশীর নানা টুকিটাকি কাজে। ক-জোড়া ছোট বড় জুতা মেরামত করল। সেদিন মাংসের যোগাড় ছিল না, কুকুর দু'টাকে পেট ভরে খেতে দিল ফ্যান আর ভাত। ভাল করে রোদ খাওয়াল হুনেজারা পাঁঠার চামড়াখানা।

বেলা পড়ে এলো— সূর্য ঢলে পড়ল বাঁশ বাগানের পশ্চিম সীমানায়। খালের জলে কয়েকজন জাল বাইছে, আর কয়েকজন চেয়ে আছে ওপার বসে। গরু বাছুরও যেন কম কম ঠেকেছে উর্বশী বাড়ীর পাশের মাঠে। আজ এমন রিক্ত কেন চারদিক? যদি দু'চারজন খদ্দেরও কাজ-কর্ম নিয়ে আসত, উর্বশী একটু গল্প করে সময় কাটাত। নিঃসংগতা তাকে যেন গ্রাস করে ধরেছে।

এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে সে খালের পারের দিকে গেল। চেয়ে রইল

জাল যারা বাইছিল তাদের দিকে। মাছ উঠছে বিস্তর। বোয়াল, চিংড়ি, রুই। একটা হাত দেড়েক মাছ জাল ছিঁড়ে পালাল। এমন লাফ দিল যে জালের ফাঁস কেটে একেবারে শিকারীর নায়ে এসেই পড়ল। হেসে উঠল সবাই। বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করল উর্বশীও। সে ডেকে তামাক খাওয়াল সকলকে। সামান্য গল্প গুজবও হল ওরই মধ্যে।

উর্বশী বলল, 'আজই না একাদশী ?'

একটি মুসলমান ছোকরা জবাব দিল, 'তাতে আর হইছে কি ? তুমি এই মাছ কয়ডা নেও, খাবা ক্যান নিরামিষ ?'

উর্বশী একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। ওরা কি বুঝবে, আজকাল উর্বশী কত নিয়মকানুন মেনে চলে। তবু হাত বাড়িয়ে মাছগুলো সে রাখল—অসময়ে পরান এসে কি দিয়ে ভাত গিলবে। যাদের হয়ে তাড়িয়ে আসবে বুনো মোষ তাদের তো আর এদিকে খেয়াল নেই।

গৃহস্থদের ছোট ছোট নাওগুলো চলে গেল একখানার পর একখানা। কোনখানা পূবে, কোনখানা বা পশ্চিমে। সন্ধ্যার আঁধারে কতগুলো কৃষ্ণ বিন্দু যেন হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে। এতক্ষণ একটু তবু কলরব ছিল, আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ল এই নিঃসংগ খালপারের বাড়ীটা। ঝিঁঝিঁর ডাক, দূর মসজিদের আজানের একটানা স্বর কানে না এলে উর্বশী বোধহয় এত ব্যাকুল হয়ে পড়ত যে তা বলা যায় না। সে আজ মানুষের সংগ লিপ্সায় আকুল।

এইখাল পারে সে আজ কত বছর ধরে বাস করছে এমনি একা একা। মায়ের অনুগ্রহ যখন হয়, তখনও সে নাকি একাই কাটিয়েছে প্রায় এক মাস। তখন তার ভয় করেনি, আজ যেন কেমন ছমছম করছে তার গা। জালাল কি যে উক্তি করে গেল, তা ও ভুলতে পারছে না। কত নাম গোত্রহীন মদ্যপের সংগে ও রাত কাটিয়েছে, নেশায় হয়ে রয়েছে চুর, শুনেছে কত অশ্লীল বক্রোক্তি, কিন্তু সে আঘাতের চাইতেও সহস্র গুণ আঘাত লেগেছে আজ জালালের কথায়। ইংগিত অপরের ওপর তবু যেন তার আশ্লেষ ছড়িয়ে পড়েছে একটা পবিত্র সমাজের হোমপাত্রে। নারীর সম্মান, সতীর সতীত্ব তা হয়ত উর্বশীর চলে গেছে দাবীর বাইরে, কিন্তু কি আশ্চর্য দরদ তবু এই অস্পৃশ্যা মুহ্যমান হয়ে পড়ে অন্যের কুৎসিৎ স্পর্ধায়।

অসহায় মন এবারে কামনা করে সংগ। যাচনা করে সাহায্য।

পরানটাও যদি আসত !

খালের জলে গাছের শুকনা ডাল পড়ে, মাছে ঘাউ মারে—উর্বশী ভাবে পরাণ বুঝি আসল।

হায়রে উদাসীন পুরুষ, হায়রে নিষ্ঠুর ! সব কি ভুলে যেতে হয় ঘর ছেড়ে বাইরে বের হলে ?

এবার প্রয়োজনের পথ বেয়ে প্রেম আসে চুপে চুপে। আসে অজ্ঞাতে, আসে অতি ধীরে ধীরে। সান্ধ্য তারার মত কোথায় যেন দাঁড়িয়ে থাকে মনদিগন্তে।

ঘরে এলে ওর দেহটার জন্য উগ্র নেশা, বাইরে গেল সমগ্র মনুষ্য সমাজটার হিতের নেশা—এমন পাঁড় মাতাল, কেউ কি কখনও দেখেছে !

সে রাত্রে আর পরাণ ফেরে না।

উর্বশীর ছটফট করে কাটে একা একা। সে স্থির করল যে এমন দায়িত্বহীন লোকের সংগে ঘুচিয়ে দেবে সব মেলামেশা। পরাণ সহজ মানুষ নয়। ..

তবু ওরই জন্য কেন জানি উর্বশী কান পেতে থাকে—মান অভিমান রাগ অনুরাগ চক্রাকারে আসে যায় বারেবারে।

সেদিন রাত্রে গুটি দুই বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে একটু দূরে। পরদিন উর্বশী ছুটে আসে পণ্ডিতবাড়ী। তার মনে গভীর উদ্বেগ ও আশংকা। যারা উঠানে বসে জটলা করছিল তাদের মুখ শুকনা। কেউই আলোচনা করছে না যে কি পরিমাণ টাকা পয়সা সোনাদানা লুণ্ঠিত হয়েছে, কখানা ঘরে দিয়েছে আগুন, আলোচনার বিষয়বস্তু তার চেয়েও গভীর। বিষয়টা বিশেষ করে কেউ বলতে সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু অন্তর্দাহ হচ্ছে অবিরাম। সইতে পারছে না, তবু বহন করতে হচ্ছে ভারবাহী মুমূর্ষু পশুর মত।

এ আশংকা তো ঘরে ঘরে। এর থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার উপায় কি ?

কেউ কোনও মীমাংসায় পৌছাতে পারল না। শুষ্ক মুখে জটলা করল বিস্তর। তারপর যে যার বাড়ী ফিরে গেল মেরুদণ্ড ভাঙা সরীসৃপের মত। প্রয়োজনে তারা শত্রুর বুকে বিষ ঢালতে পারে, কিন্তু ফণা তোলবার ক্ষমতা কই ? অহিংসার চরম দণ্ডে যে তাদের হাড়ের প্রতিটি জোড়া খসে গেছে।

নানা ভাবনা ভারতে ভাবতে উর্বশী ফিরে গেল বাড়ী। পণ্ডিত বাড়ীর কাউকে যে হুঁশিয়ার করে দেবে, তাও ভুলে গেল সে।

একটা বিরাট আতংকের কৃষ্ণ যবনিকা যেন নেমে এল কুসুমপুরের ওপর একটা

রক্তহীন ধাতু পাত্রের মত। হাঁপিয়ে উঠল সবাই, কিন্তু উপসর্গ নিবারণের কোনই তো পন্থা নেই।

দিনের প্রখর আলো যেন আঁধার হয়ে এল।

উর্মিলা ও মাধবী ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন পরামর্শ করল। অবনীশেখরের ছেলে দুটি হাঁ করে শুনতে লাগল সেই সব কথা। ওরা ঠিকঠাক সব কিছু না বুঝলেও ভয়ে শুব্ধ হয়ে রইল। অন্য কোন দিন হলে হয়ত নানাবিধ উপদ্রব করত মাকে, কিন্তু আজ রইল পাথরের পুতুলের মত বসে।

পরামর্শ শেষ হলে উর্মিলা ও মাধবীর লক্ষ্য পড়ল ওদের দিকে। দুজনে দুটিকে কোলে নিয়ে চুমো খেল ও মনে প্রাণে বোধহয় কামনা করল ওদের দীর্ঘায়ু। দুটি পদ্ম কোরক যেন নীরবে এলিয়ে রইল দুজন স্নেহময়ী শুভার্থিনীর বুকে।

(১৫)

সে রাত্রেও আর পরাণ বাড়ী ফিরিল না।

কেমন করে উর্বশীর যে দিনের অংশটা কাটল তা আর বলা চলে না। কত অশুভ কথাই যে ভেবেছে ও! পঁচিশবারও কি সে যায়নি খালের ঘাটের দিকে।

বাড়ী ছেড়ে যে অন্যত্র গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে আসবে, তাও সে পারেনি—পাছে শ্রান্ত পরাণ এসে অসুবিধায় পড়ে। আসবে তো নিশ্চয়ই না খেয়ে। হয়ত আজ দুদিনই কেবল চালিয়েছে চিঁড়া মুড়ি। পরের স্বাস্থ্যের জন্য যার অত মাথা ব্যথা তার নিজের প্রতি একটু খেয়াল নাই। এমন বেহিসেবী সে দুনিয়ায় খুব কমই দেখেছে।

আজ অফুরন্ত অবকাশ উর্বশীর। কাজ যে কিছু ছিল না, তা নয়—কোনও কিছু করার স্পৃহাই ছিল না তার।

বেলা পড়ে এল,—জ্বালা নিবে এল সূর্যের, কিন্তু দাহ কমছে না এই মুচির মেয়ের অন্তরের। হঠাৎ কেন জানি আজ তার খতিয়ে দেখতে ইচ্ছা হল জীবনের ভুল চুকের অংকে ভরা জাবদাখাতাখানা।

গোধূলির রক্তাভ বর্ণালী ছড়িয়ে গেছে পশ্চিমাকাশে। দিগন্ত প্রসারী মাঠ জনশূণ্য; একটি গরু নেই, ছাগল কি মেষ চরছে না, আসছে না কোন ক্লান্ত উৎকন্ঠিত পথিক দিনের শেষে খেয়ায় পাড়ি দিতে। অবশ্য খেয়ার নাও এখানে

নেই, উর্বশীই তার ছোট্ট নায় ওপার পার করে দিত যে সম্প্রদায়ের হক না সে পথিক। আকাশে দু একটি করে তারা দেখা দিল—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্লান্ত আশাহত আলোর বর্তিকার মত।

উর্বশী হিসেব করতে লাগল—

পরাণ দুশ্চরিত্র লম্পট। কিন্তু কেমন করে হল এই লম্পট যাদুকর আত্মভোলা বিশ্বপ্রেমিক ? দুঃস্থ, অন্ধ, আতুর, বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর পরম প্রিয় সে,—নইলে এমন করে কেউ নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে না। কস্মিনকালে উর্বশী এমন লোক কোথায়ও দেখেনি।

সেই পরাণ ওকে ভালবাসে। লম্পট পরাণ মুখে যা বলে বলুক, প্রেমিক পরাণ মধুপাত্র নিয়ে তার কাছে আসে। মদ সে খায় বটে, মাতাল সে হয় বটে, কিন্তু এ মাদকতা কার জন্য ? মুচির মেয়েকে এত শুদ্ধসূচী করে, স্নেহ প্রেমে কেউ তো কখনও গ্রহণ করেনি। পরাণের সমস্ত শঠতা আজ সাধুতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে উর্বশীর চোখে।

প্রতিদানে পরাণ কি পেয়েছে ?

পুরস্কার ?

না, না, সহস্র শত তিরস্কার ও গঞ্জনাই শুধু উর্বশী দিয়েছে। ভাল সেও বেসেছে কিন্তু কোন যোগ্য আসনে বসায়নি এই বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা দেবতাকে। লম্পট বলে কেবলই সে তাকে দূরে ঠেলে রেখেছে।

আজ দিনান্তে হিসেব নিকেশ খতিয়ে উর্বশী অনেকক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে রাতও বাড়ে, ক্রমে ক্রমে মনটাও উর্বশীর নেমে আসে নীচের পর্দায়। দায় ঠেকে খাওয়া দাওয়া করতে হয়, শুকনা চামড়া তুলতে হয় ঘরে। ডাকতে হয় কুকুর দুটোকে।

উর্বশীর অধিক রাত্রি পর্যন্ত আর ঘুম এল না। একা একা তার যে কেবল ভয় করছিল তা নয়—তবে কেন জানি ভালও লাগছিল না। মানুষটা গেল কোথায় ? এখন এসে খাবেই বা কি ? আজ তো উর্বশী বিশেষ কিছু সংগ্রহ করে রাখতে পারেনি। একটু শুধু দুধ জোগাড় করেছিল, তাও প্রায় নষ্ট হয় হয়। সে ভাবল, আর একবার জাল দিয়ে রাখবে দুধটা। তাই উঠতে গেল। বিরক্ত হলো হাতের কাছে দিয়াশলাই ও ল্যাম্প না পেয়ে। এমন ধারা উচ্ছৃঙ্খলের মত পরাণ চলে কেন ? এখানে থাকতে হলে তাকে চলতে হবে নিয়ম মত। উর্বশীর বড়

মাথা ধরেছিল। এখন জেগে জেগে নবাবের দুধ জ্বাল দাও আর কি! কাল থেকে বলে দেবে, সে আর পারবে না।

দিয়াশলাইর সন্ধান পাওয়া গেল। বাহিরটা ঘোর অন্ধকার। বাতি জ্বালতেই উন্মুক্ত দ্বার পথে দেখা গেল, জালাল। দিব্যি যেন একজন সাহেব—যাচ্ছে শিকারে। হাতে বন্দুক, মাথায় টুপি, পরণে হাফ প্যাণ্ট মুখে দাড়িতে মনে হলো পাউডার, পায় জুতো।

'কিরে উর্বশী তুইতো পুঁছলি না—তোগো গোঁসাই বাড়ী যাই—মাদবী ঠাইন বোলাইছে (ডেকেছে)।'

নিমেষে উর্বশী সব বুঝল। এ সজ্জা যে অভিসারের সজ্জা নয় সে জানত। বুকের মধ্যে তার হাহাকার করে উঠল। এবার তার ভুলের মাশুল দিতে হবে—কেন সে হুঁশিয়ার করে আসেনি পণ্ডিত বাড়ীর সবাইকে। সে বাতিটা ঠেলে রেখে লাস্য জড়িত কণ্ঠে বলল, 'কোথায় যাও জান, আমারে ফেইল্যা?' জালালের গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বনে চুম্বনে পাগল করে তুলল। টেনে আনল ঘরের ভিতর। 'মাইরী পরাণ আমার কে? তুই তো সব সরদার। আমি তোমার ইলশা মাছের কোল—আমারে ফেইল্যা খাইতে চাও তিতা পুঁটীর ঝোল?'

একেবারে হকচকিয়ে যায় জালাল। এই কত বছর সে স্ত্রীলোক স্পর্শ করেনি—ছিল জেলে। এখন সে অনুগ্রহের লোভে কাকুতি মিনতি করছে না—পাচ্ছে যেন সহস্র ধারায়। দ্বিপ্রহরের মরু তৃষ্ণার কাছে যেন এলো শ্রাবণের ঘন বারিপাত।

উর্বশীর স্বামীর সঞ্চিত বহুদিনের কয়েক বোতল মদ লুকানো ছিল ঘরের মেজেতে মাটির তলে। হঠাৎ তার তা মনে পড়ল। তাই সে মাটি খুঁড়ে তুলল। তুলে কণ্ঠ ভরে পান করল। সে যা আজ করতে যাচ্ছে তা সজ্ঞানে করা অসম্ভব—তাই কতকটা অজ্ঞান হয়ে নিল সুরা পান করে। এগিয়ে দিল একটা বোতল ও মালা জালাদের কাছে। ভাবল সর্দ্দারকে আজ ঠেকাতে পারলে কাল পরিস্থিরিটা যাবে অন্তত বদলে। মালার পর মালা উজাড় হয়ে যাচ্ছে। দামী মালের জন্য আজ দৃকপাত করছে না উর্বশী। অন্য দিন হলে ভিন্ন কথা ছিল। দিতে হতো অগ্রিম মূল্য।

জালাল বলে, 'ওরে আমার ইলশা মাছের কোল—তোরে খামু চাবাইয়া চাবাইয়া।' সে উর্বশীর তপ্ত তনু বেষ্টন করে ধরে দুহাতে।

নেশার মধ্যেও একেবারে দিশা হারায় নি উর্বশী। তার দেহ মন এক একবার রি রি করে ওঠে। তবু সে জোর করে জড়িয়ে ধরে জালালকে।

পণ্ডিত বংশ—কুসুমপুরের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশ—যার খ্যাতি আছে, কুল মানের মর্যাদা বহুপুরুষ ধরে ছড়িয়ে আছে সপ্তগ্রামে—সেই বংশের মেয়ে মাধবী, পুত্র বধূ উর্মিলা—তাদের আজ রক্ষা করবে উর্বশী। সে যত পবিত্রভাবেই এ ক'দিন চলে থাক, সে এখনও বেশ্যা। অন্য পরের কি কথা, সমস্ত জেনেশুনেও পরাণ তার উর্দ্ধে তাকে স্থান দেয়নি, জালালের মত লোকে তো বলে যা ইচ্ছা তাই। এইবার সত্যই তার জীবন উৎসর্গ করার সময় এসেছে—সে যূপকাষ্ঠে মাথা নত করে দেবে। তার নারীত্বের মূল্য তো কেউ বুঝবে না কিম্বা বুঝলও না এক সংগে এত ঘনিষ্ঠভাবে থেকে। একটু কেমন চক চক করে উঠল যেন উর্বশীর চোখ জোড়া। অভিমানে ক্ষুব্ধ হচ্ছে অন্তর।

এমন সময় যেন বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, কারা 'সরদার, সরদার!'

জালালের জবাব দেওয়ার অবস্থাও নয়, সময়ও নয়।

উর্বশী বলে, 'আজ ফেরো মিঞারা।'

একটা রাত ফিরিয়ে রাখতে পারলে সময় পাবে অবনীশেখর। তারপর বুঝে সুঝে যা হয় ব্যবস্থা করতে পারবে দিনে। আজকার এই কালরাত্রি! মনে মনে মহাদেবীর কাছে শক্তি ভিক্ষা করল উর্বশী নত মস্তকে জোড় হাতে।

ডাকাতেরা পরামর্শ করে। কি, ওদের ফাঁকি দিয়ে এসে একাই লুটছে মজা? ছোকরা সতের জন চেঁচিয়ে ওঠে। তারা আগে চলে, পিছনে বয়স্করা। হুড়মুড় করে দাওয়ায় ওঠে সকলে একত্র হয়ে। জালাল রেগে তেড়ে আসে। এরাও রুখে দাঁড়ায়।

উর্বশী বলে, 'সরদারেরে আইজ পাবা না।'

একজন বলে, 'তারে আমরা চাইও না।' সে উর্বশীর শাড়ী ধরে টানে।

'একি জোর জবরদস্তি?'

'না পিয়ারী খাতির মহব্বতই......'

'ধর ধর হালিরে ধর।'

কে জানি আরও অশ্লীল উক্তি করে।

তারপর একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়। জালালকে ছেড়ে সবাই মিলে জুলুম করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় উর্বশীকে।

পরদিন উর্বশীর লাস পাওয়া যায় খালের চরে।

চারপাশের গ্রামের সকলে ভোর হতেই কথাটা শুনল।

এত দিন কেউ মাথা ঘামিয়ে চিন্তা করে দেখেনি—উর্বশী হিন্দু না মুসলমান। জেনেছে এবং ঘৃণা করেছে বেশ্যা বলেই। আজ তার মৃত্যুতে টনক নড়ল হিন্দু বাসিন্দাদের। তারা মনে বড় ব্যথা পেল, তাই স্বীকৃতি দিল—এগিয়ে এল দল বেঁধে।

তাঁতির বাড়ী আজ তাঁত বন্ধ, শানদার বাড়ী থেকে ঢাকের বায়না ফিরল—কুমোর বাড়ীর ঘুরল না চাক। সবাই চিন্তিত, কি লোভে ডাকাত পড়ল উর্বশীর ঘরে, কেনই বা খুন করল এই অতি সাধারণ মুচির মেয়েটাকে ?

থানা এখান থেকে বার মাইল। কে যাবে থানায় ? গিয়েই বা কি এজাহার এরা দেবে ? এরা ঘটনার তো কিছু জানে না, চাক্ষুস প্রমাণও নেই কিছু। কেবল হয়ত গাল মন্দ শুনে আসবে ফিরে। দেশের অবস্থা কি হলো ? ইংরাজ আমলে তো ঠিক এমন ধারা থানার বিচার ব্যবস্থা ছিল না। এমন অরাজকতার ভিতর মানুষ বাস করে কি করে ?

আজ আর দিশা নেই কারুর। সকলে কাদা চরে দাঁড়িয়েই পরামর্শ করতে লাগল। এর একটা প্রতিবিধান করতেই হবে। অবনী শেখরের মনে পড়ল শ্মশানের সেই দৃশ্যটা। ওর পিতার শ্মশানে কত তৎপরতা, কত মমতা দেখিয়েছিল উর্বশী। ইদানীং সদা সর্বদা আসত যেত, ভাল ও সবাইকে বাসত—যেন ছিল ও পণ্ডিত বাড়ীর বিধবা বড় বোন নয়ত মাসী পিসী।

কয়েকজন মুসলমান ও এলো ঘটনাস্থলে। কয়েজন বললে ভুল হবে—এলো অনেকে চারাদিকের গ্রাম থেকে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে সবাই যাবে, স্থির করল, একজন সদাশয় মাতব্বর মুসলমান। সকলেই জানে মন্নু সরিফ জালালের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে চলে, তবু এ অবস্থায় তার কাছে না গিয়ে গত্যন্তর নেই। থানার পুলিশ তার কথায় ওঠে বসে। চৌকিদার দফাদার তো তটস্থ। মুখে কেউ কিছু না বললেও উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বোঝে ঘটনাটা ঘটেছে কোন দলের মারফতে। মন্নু সরিফের হাতের মুঠায় জালাল—তার কি শাসন হবে না ? একজন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের হাতে রাখতে হয় সব রকম লোক—একথা এরাও স্বীকার করে, কিন্তু সে কি করবে দেশের মধ্যে খুন খারাপি ? এই কি ন্যায় ধর্ম ?

আধুনিক রাজ্য শাসন এক গোলক ধাঁধাঁর পথ। আশ্চর্য এই যে, অপরাধীর দলের একজনই থাকে সেই ধাঁধাঁ পথের শেষ প্রান্তে বিচারের কর্তা হয়ে। তার কাছেই চলল ভেড়ার দল বিপাকে পড়ে। হিন্দু মুসলমান একত্র হয়েই চলল। অন্যায়ের প্রতিবিধান চাই।

মন্নু বলল, 'আমি বইস্যা নাই, পাঠাইছি চৌকিদার থানায়। আপনারা আমারে ঠাহার করেন কি ?'

কাজ তবে এগিয়েছে ? মন্নু সরিফের লক্ষ্য আছে—এ না হলে প্রেসিডেণ্ট ! মন্নু সরিফ পাবালিক সারভেণ্ট, কিন্তু এরা জানে যে সাতগাঁয়ের জনসাধারণের সে ক্ষমতায় পিতা। এবং পিতৃ তুল্যই কাজ করেছে সময় মত। দেরী বা গাফিলতি করে নি ঘটনার গুরুত্ব বুঝে।

'একটা কথা—পুলিশ আইলে ক্যাবল হিন্দু ভাইরা যেন নাচানাচি না করেন —মুসলমান ভাইদেরও এখান থিকা যাওয়া ভাল।' মুরুব্বিয়ানা চালে মন্নু বলে, 'ঘটনাটা অতি জটিল—সময়ডাও বড় বেয়াড়া।'

'কেন ?'

দুদল একত্রে দেখলেই নাকি পুলিশে ঠাহর করে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। সত্য সত্যই সেদিকে যদি কোন ক্রমে ঘটনাটা গড়ায় তবে সর্বনাশ। একটা বেওয়ারিশ মেয়েলোকের জন্য চারদিকে হুহু করে জ্বলবে আগুন। সে আগুন প্রেসিডেণ্টের পিতার ক্ষমতাও নেই যে থামাবে। মুসলমানরা এবং হিন্দুরা শিউরে ওঠে— সাম্প্রদায়িক দাংগা !

তবে কি করা যায় ? বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে শুভবুদ্ধির মানুষগুলো।

মুখ মুচ্‌কে মন্নু হাসে।

উভয় সম্প্রদায়ের লোক বলে, 'তবে আমরা যাই।'

মন্নু জবাব দেয়, 'দুনিয়ার যে হালচাল তাতে আমরা আছি সুখে সদ্ভাবে —এ সদ্ভাব রাখতে হইলে সকলেরই যাওয়া উচিত। তারপর দরকার হইলে সকলেই তো আইতে পারবেন, কি কন ?'

হ্যাঁ, কথাটা সত্য।

ভীড় ভাঙে তাড়াতাড়ি।

রকমান বলে, 'ওর, ঐ উর্বশীর মায়া ছিল মায়ের মত প্রিছিডিং। উপারে ধম্ম আর নীচে আপনে।' সে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। তার ওপর মনে

পেল একটা দারুণ চোট। ও খাল পার হয়ে যাওয়ার সময় বিবস্ত্রা উর্বশীর দেহের ওপর ওর নতুন কোরা গামছাখানা ফেলে দিয়ে যায়।

পুলিশ এলো খেয়ে-দেয়ে দুলকি চালে। দারোগাটি নতুন। কিন্তু মন্নু শরিফের কাছে যেন ঠেকল পুরান এক বন্ধু। ঠিক তেমনি ভাবেই আলাপ পরিচয় হলো।

অবনীশেখরকে ডেকে পাঠান হলো—আর ডাকা হলো একজন মৌলভী গোছের মাতব্বরকে। তাদের নিয়ে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল লাসের মাথা নেই। কেমন করে এখন সনাক্ত করা হবে? দেহের অভ্যন্তর ভাগে ঠিক স্তনের নীচে একটা দাগ আছে। দাগ নয় ঠিক, একটা জটের চিহ্ন।

দারোগা বলল, 'আপনারা কেউ কি এই চিহ্নটা দেখে মানুষটাকে সনাক্ত করতে পারেন?'

মৌলভী সাহেব চোখে গামছা চাপা দিলেন। 'তোবা, তোবা!' একে পরস্ত্রী দেখা তাদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ—তাতে বিবস্ত্রা। সনাক্ত করতে হবে তারই স্তনের নীচের জটের চিহ্ন! 'তোবা, তোবা!!'

অবনীশেখর উত্তর দিল, 'কেন, উল্কির দাগ—যা হাতে রয়েছে ওর।'

'ওরকম উল্কির দাগ ছোট জাতের ঘরে অনেকের শরীরেই থাকে। তবে স্তনের নীচের ঐ জটটা যদি আপনি সনাক্ত করতে পারেন, তবে এটা যে উর্বশীর লাস আমি তা স্বীকার করে নিতে পারি। তা কি পারবেন পণ্ডিত মশায়?'

কি যে জবাব দেবে তা অবনীশেখর বুঝে উঠতে পারে না।

মন্নু শরিফ হেসে মোলায়েম স্বরে বলে, 'আপনে যে কি কন দারোগা ছাহেব! উনি বিখ্যাত এক পণ্ডিতের ছেইলা—নিজেও পণ্ডিত—উনি কি করইয়া জানবেন ভানুমতীর উরুর তিলের খবর?' মন্নুর মনে হয় কিছুতেই এ লাস উর্বশীর নয়। বেশ্যা মাগী নিশ্চয় গেছে কারুর সংগে বেরিয়ে। এ একটা ভাস-লাস এসে ঠেকেছে নদীর চরে।

অবনীশেখর একটা দস্তখত দিয়ে বোকার মত বাড়ী ফেরে। মৌলভী সাহেব আগেই ভেগে পড়েছেন। জেনে শুনেও কেউ কিছু করতে পারে না।

মস্তকহীন দেহটা পরদিন জেলার বেওয়ারিশ লাস ঘরে গিয়ে জমা হয় সাক্ষী প্রমাণ ও সনাক্তের অভাবে।

দারোগা সাহেব যখন নৌকায় উঠল তখন মন্নু যেন তার হাতে কি দিল।

'এসব কি ?'

'পাকিস্তানের দীন সেবকের যদ্‌কিঞ্চিৎ নজর। আমরা সোনমান না করলে আপনারা কাম করবেন ক্যামনে ?'

'দারোগা কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ হয়ে বলে, 'আদাব মৌলভী ছাহেব, আদাব।'

(১৬)

বাড়ী ফিরে অবনীশেখর স্তব্ধ হয়ে থাকে। সব বুঝল অথচ কিছু যে বলতে পারল না সেই ক্ষোভে নিজেকে পীড়ন করতে ইচ্ছা করে তার। ইচ্ছা হলো দেশ ছেড়ে এখনি পালাতে। কিন্তু কেমন করে কোথায় যাবে ? কি করেই বা এতগুলো লোকের আহার জোগাবে ? সমস্ত পাড়া প্রতিবেশীকেই বা ফেলে যাবে কি করে ? আচ্ছা হিন্দুস্থান তো বিস্তীর্ণ পরিধি নিয়ে একটা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বলতে গেলে ওদের ভাইয়ের বাড়ী। তারা ওদের কথা কি ভাবে না ? তারা যখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিঃসংকোচে আনন্দ করে তখন ওরা যে শংকায় দিন দিন শুকিয়ে মরে। এত বড় পৃথিবীতে ওদের কি কেউ নেই—এই পূর্ব বাঙলার হিন্দুদের ? ওরা কি স্বাধীন হয়নি ? ইংরাজ, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা একত্রে যুক্তি করে কি ওদের এই লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম তুলে দিয়েছে চিত্রগুপ্তের খাতায় ?

উর্মিলা এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবছ ? সন্ধ্যাহ্নিক করতে যাবে না ? আজ আর বেশী রাত না করে তাড়াতাড়ি বৈকালীটুকু দিয়ে ঘরে এসে বস।'

'শালগ্রাম তো বাইরে থাকবেন।'

'তাঁকেও না হয় মণ্ডপ থেকে ঘরে নিয়ে এসো। আজকার অন্ধকারটা যেন ভাল লাগছে না।'

'সকলেরই মন খারাপ কিনা! স্বরূপ মুদীর প্রেম-ধ্বনি তো শুনলাম না।' ঠিক সন্ধ্যা হলেই স্বরূপ দীর্ঘ ছন্দে টেনে টেনে প্রেম-ধ্বনি দেয়। সে এক শোনার জিনিষ।

'সে আজই দোকান বেচেছে ফজলুর কাছে।'

'কত টাকা পেল ?'

'ইসমাইল বলল তো সোয়াশ'। ঐ টাকা নিয়েই নাকি সে কলকাতায় যাবে।'

'ধন্য এদের সাহস—খাইয়ে তো পাঁচ পাঁচটি।'

'মহাজনের ঘর থেকে বাকী বকেয়া কেন নগদ টাকায়ও মাল পাচ্ছে না—এদিকে যা গ্রামে ছড়িয়েছে, তাও আদায় হচ্ছে না—স্বজাতিরাই নাকি ফাঁকি দিচ্ছে বেশী।'

'কি করবে, চালের দর যে চল্লিশ। চাল কিনবে, না মুদীর দেনা শুধবে ? শুনলাম তাঁতিরাও নাকি আর দু হপ্তার বেশী তাঁত চালাতে পারবে না—সুতো নেই পাকিস্তানে। জেলে পাড়ার সংবাদও ভাল নয়।'

'তা হলে তুমি তো সবই জান—এ অবস্থায় স্বরূপ মুদীর প্রেম-ধ্বনি দেওয়ার কি কোন ন্যায় সংগত কারণ থাকতে পারে ? হিন্দুস্থানে নাকি চালের কালো বাজারেরও উঁচুর দর মাত্র পঁচিশ – মানুষ ছুটবে না কেন কলকাতায় ?'

'আমি আর কাউকে বাধা দেব না।'

'দিও না—দিলেও রাখতে পারবে না।' উর্মিলা বিরক্ত হয়ে বলে, 'মানুষ সাত পুরুষের বাস ভেঙে কখন যায় ? যখন নিতান্ত অনন্যোপায় হয় তখন।'

উর্বশীর মৃত্যুটা যে ভাবেই ঘটে থাকুক—এরা সঠিক কেউ কিছু জানে না—কিন্তু পরোক্ষে এদের বুকের বল অনেকখানি কমিয়ে দিয়ে গেছে। খেতে বসে অবনীশেখর প্রস্তাব করল, 'তোমরাও যাবে নাকি কলকাতায় ?' সে উর্মিলার কাছে খুব জোর দিয়ে বলতে সাহস পেল না তবু ধীরে ধীরে বলল, 'আজ বিগ্রহ ঘরে আনলাম—কাল গরুটাকে বাধ্য হয়ে ঘরে তুলতে হয়েছে—এভাবে মানুষ কি করে বাঁচে ? আর যে ঘরকে সুরক্ষিত বলে মনে করছি, তাও তো দুর্ভেদ্য নয়—সহজদাহ্যও বটে।'

বাইরের গাঢ় অন্ধকার আজ যেন কৃষ্ণ মেঘের মত সর্বত্র জমাট বেঁধে গেছে। উঠানে এবং গাছের গায় যেন লেপটে লেপটে জড়িয়ে রয়েছে। পুকুর ঘাটে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সাহস হলো না উর্মিলার। ঐ অন্ধকারের যেন অসংখ্য কালো কালো কুৎসিত হাত আছে—কেউকে একটু বাগে পেলে জড়িয়ে ধরবে। সে তার ছেলে দুটিকে ঘুম থেকে তুলে এনে রান্না ঘরে বসেই খাইয়ে পাতের ওপর আঁচিয়ে দিল। অবনীশেখর ওদের নিয়ে উঠে দাঁড়াল—যাবে শয়ন ঘরে। একটি ছেলে শীতে একটু কাঁদল, অমনি উর্মিলা তার গালে একটা সজোরে চড় কসিয়ে দিল। এমন সে কখনও অবুঝের মত ছেলেদের শাসন করে না।

'ও কি তোমার হলো কি ?'

'কিচ্ছু হয় নি। তুমি এখন শুতে যাও—আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে থেক না।'

অবনী হতবাক হয়ে একটি ছেলেকে কোলে, অপরটিকে বগলে নিয়ে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্নাঘর নীরব হলো। চাঁপা এবং মাধবী অনেক আগেই খেয়ে গেছে। দূর থেকে যে ছেলেটার কান্নার শব্দ আসছিল তাও ক্রমে ক্রমে থেমে গেল। রান্নাঘরে এখনও কত কাজ বাকী! আবার ভয় করতে লাগল ঊর্মিলার। মনে পড়তে লাগল উর্বশীর বীভৎস মৃত দেহটার কথা।

'বৌদি আমি এসেছি, একটু দেরী হয়েছে আজ আসতে।' ইসমাইল এসেছে পাহারা দিতে। শুধু পাহারা দিতে হলে সে কিছুতেই আসত না এবাড়ী। তার ভাল লাগে এদের কৃষ্টি, সভ্যতা, মিষ্টি কথাবার্তা। তাই ও চেষ্টা করেই চাঁপার মত কথা বলতে শিখেছে। দিন আর রাত কি, সময় পেলেই ও ছুটে আসে এদিকে।

'এসেছিস ভাই, বস ঐ জল চৌকিটায় ঢেঁকি ঘরে। আমি খেয়ে উঠে বিছানা পেতে দেব।'

'বৌদি চাঁপা ?'

'সে ঘুমে। ডাকব ?'

'না—থাক। যে রাগী মেয়ে, কাঁচা ঘুমে উঠলে এক্ষুণি আবার তোলপাড় করে ছাড়বে।'

ইসমাইল একটা গ্রাম্য সংগীত ধরে—

আরে তুর্গি গ্যাখলাম চাচা
এক বেটি সিংগির পরে
অসুরডার টিক্কি ধইরে
সাপ জড়াইয়া বুকে মারছে খোঁচা,
হায়রে কিবা ঠারইন গ্যাখলাম চাচা···

ঊর্মিলা গান শুনতে শুনতে ভাত খেয়ে রান্নাঘরের কাজ-কর্ম সারল। 'এ গান তুই কার কাছে শিখলিরে ?'

'একজন মুসলমান বয়াতী (শির গাইয়ে) এসেছিল দক্ষিণ থেকে চন্দ্রদ্বীপ বড় হিস্যায়—সে লেখা পড়া কিছু জানত না, কিন্তু এমন সব গান রচনা করতে

পারত যে সে একখানা সোনার মোহর পেল ইনাম। তার মুখেই শুনেছিলাম এ গানটা।'

পরদিন ভোর বেলাই শোনা গেল যে নিকটস্থ এক গ্রামে পাটিকর বাড়ী ডাকাতি হয়েছে। লোমহর্ষণ অত্যাচার হয়েছে স্ত্রীলোকের ওপর।

উর্মিলা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, যে একটা পাহারার ব্যবস্থা করা যায় না?

'আমাদের গ্রামে? শীতের রাত্রে জাগবে কে? বলিষ্ঠ যুবক একজনও কি আছে দেশে?'

বিগত ক'বছর ধরে নানাবিধ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের রাহুতে গ্রাস করেছে সক্ষম মানুষগুলোকে। পূজার সময় আগের মত আর আনন্দ হয় না। এমন যে পঞ্চগ্রাম, নাম করা ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাজ ছিল যেখানে—যেখানে কথা হয়েছিল হাই স্কুলের সংগে কলেজ হবে একটা সেই গ্রামটাই আজ জনশূণ্য। বড় বড় বাড়ীগুলো সব শ্মশানের মত ধুঁকছে। আর এতো কুসুমপুর।

পরদিন আবার সন্ধ্যা এলো—কৃষ্ণপক্ষের বিভীষিকাময়ী সন্ধ্যা। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো গত রাত্রির মত। দু' একজন মুসলমান চাষী খাতক কি বর্গাদার ডাকলে পাহারা দিতে আসতে পারত হিন্দু পাড়ায়, কিন্তু তারা তা আসবে না। কারণ নিকটে কোথায়ও ভিন্ন একদলে ডাকাতি করলে হয়ত অযথা হয়রাণ কিম্বা জাবরাণ হতে হবে এদের। উপকার করতে এসে মামলায় জড়িয়ে পড়বে চৌকিদার দফাদার পুলিশের কারসাজিতে।

কুসুমপুরের বাসিন্দারা ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে সন্ধ্যার পরই ঘরে দুয়ার দিয়ে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বসে রইল—যেমন ভীত সন্ত্রস্ত খরগোস মাথাটা মাত্র গুঁজে থাকে নিশ্চিন্ত হয়ে।

খেতে বসে আজও আবার অবনীশেখর বলল, 'কি করবে ভেবে দেখ।'

'কোথায় যেতে চাও অনাহুতের মত? আমাদের কি কেউ কোন উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছে?' একটা অভিমানে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো উর্মিলার। আরও অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা ছিল তা সে বলতে পারল না। অবনী ওতেই সব বুঝল। সে আর অগ্রসর হতে সাহস পেল না। সত্যই তো পূর্ব বাঙলার কোন হিন্দুকে কোনও বন্ধুরাষ্ট্র নিমন্ত্রণ করেনি উৎসবে যোগ দিতে।

ইসমাইল আজ সন্ধ্যা বেলা এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ঘরের ভিতর এক বারান্দায়।

সকাল সকাল উর্মিলাও গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিল। এই দুদিন ধরে বাতিটা নিভায় না অবনী শেখর। ঘরে আলো আছে, কিন্তু মনের এদের গভীর অন্ধকার। তাই স্বামী-স্ত্রীতে কথা হয় না—অথচ ঘুমও আসে না কারুর চোখে। বাইরে কৃষ্ণ পক্ষের বিভীষিকাময়ী রাত্রি নিঃশব্দে সহস্র আশংকা নিয়ে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে গড়িয়ে যেতে থাকে। মাঝে মাঝে শোনা যায় শুধু শিশির পড়ার একটু আধটু শব্দ। সময় সময় পেচকের পক্ষ-বিধূনন।

অনেকক্ষণ বাদে উর্মিলা বলে, 'গাংগুলী খুড়ো বড় ফ্যাসাদে পড়েছেন বড় মেয়েটাকে নিয়ে।'

অবণীশেখর অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

'সমস্ত জেনে-শুনেও এই প্রশ্ন করছে?'

'না, উর্মিলা, তা নয়।' যেন দশ হাত জলের তল থেকে উঠল অবণী। বলল, 'গরীবের উপায় কি—সুন্দরী মেয়েও তার পক্ষে অভিশাপ যেন। এখন খুড়োমশাই কি করবেন?'

'নিতান্ত অভাব—তিনি তো কোথায়ও যেতে পারবেন না। পাঁচ কাঠা জমি নগদ খাজনায় লাগিয়ে কিছু চাল ও উগ্র বিষ সংগ্রহ করেছেন।'

'আমাদেরও তো করা উচিত ছিল। আমরা তো বসে থেকে ভুল করেছি।'

'হ্যাঁ তা তো করেছ।'

'এখন উপায়?'

'উপায় শ্রীমধুসূদন। তুমি অত অস্থির হয়ো না।'

'তুমি কি কিছু স্থির করেছ উর্মিলা?' অবনীশেখর অসহায় বালকের মত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। বাইরে একটা পণ্ডগোল শোনা যায়। স্বামী-স্ত্রীর কথা তখনকার মত ঐখানেই শেষ হয়। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে কান পেতে থাকে।

ঠিক এমনি সময় রাত জেগে মাধবী পত্র লিখছে।

কিরণ দা,

ভেবেছিলাম তোমার কাছে পত্র লিখব না কিন্তু কেন জানি আজ হঠাৎ সখ হলো। তুমি তো গিয়ে অবধি একটা সংবাদও জানাও নি—তার জন্য আমরা বিস্মিত হইনি। শুনলে বোধ হয় আশ্চর্য হবে যে, দুঃখিতও হয়নি এতটুকু। তাই আজ যে পত্র লিখছি তা প্রেম-পত্র নয়—চরম-পত্র। কিছুদিনের মধ্যে হয়ত

খবরের কাগরের ছোট্ট চারিটি লাইনে দেখতে পাবে অভিনয়ের শেষ অংকের ক্ষুদ্র একটি সংবাদ। হয়ত তাও ছাপা না হতে পারে।

কুসুমপুর, কার্তিকপুর, চন্দ্রদ্বীপ সব খালি। কোথায়ও কোথায় ভদ্রাসন ভরে গেছে জংগলে। রোজ রাত্রে চুরি ডাকাতি হচ্ছে—উৎপীড়ন চলছে যারা আছে তাদের ওপর। সাধারণ লোক নিষ্পাপ - মাঝে মাঝে শুধু স্ফুলিংগ জ্বলছে—আর সেই আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে সহজদাহ্য এই তোমাদের অবহেলার মানুষগুলোর বাড়ী-ঘর কীর্তি এবং ঐশ্বর্য। নারীর মান সম্মান তার তো কোন মূল্যই নেই কুকুরের কাছে।

খুন হয়েছে উর্বশী, কিন্তু সনাক্ত হয়নি তার শব।

যে কোন মুহূর্তে আমাদেরও সেই দশা ঘটতে পারে। তার চেয়ে মর্মান্তিক কিছু হলেও তোমরা আশ্চর্য হয়ো না—'এ নাকি অনিবার্য এবং অনস্বীকার্য' এ ছাড়া নাকি গত্যন্তর ছিল না আমাদের।

আমরা এখানে রইলাম, লাঞ্ছনার ভয়েও যে পালালাম না—এতে কি তোমরা সুখী নও? আনন্দ পাও না?

ভাবছ, আমরা বোকা?

তা নয়। আমরা মরলে, বাঁচব শহীদ হয়ে। তোমাদের জন্য তাই বলাৎকার, ধর্ষণ, উৎপীড়ন আমাদের সইতে হবে। আমরা যে ক্লীবের মাতা, ভগ্নী, আত্মীয়া! আমরা মরে হব স্বাধীনতার ইতিহাস।

চিঠি লিখতে লিখতে চোখ ঝকঝক করে উঠল মাধবীর। তারপর এল জল—উষ্ণ ফোঁটাগুলি গড়িয়ে পড়ল কাগজের ওপর। আর কিছু শত চেষ্টা করেও লিখতে পারছে না মাধবী। গুলিয়ে যাচ্ছে যত চিন্তার সূত্র। হারিয়ে যাচ্ছে শৃংখলা।

নিকটেই চাঁপা বসে। এমন ভাবে চুপ করে রয়েছে যেন তার কত বয়স হয়েছে এই কদিনে। সে দিদির চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'কাঁদিস নে দিদি। তোর কান্না দেখলে যে আমারও চোখে জল আসে।'

'না, না, কাঁদব না চাঁপা, আমাদের কান্না শুনবে কে?' মাধবী চোখ মুছল। তবু ছাই আজ চোখের জল কেন জানি বারণ মানে না, যেন প্লাবন এলো। যেন সহস্র নারীর অশ্রু আজ ঝরতে লাগল মহা অভিমানিনী এই একটি নারীর চোখ বেয়ে।

চাঁপাও সামলাতে পারছে না।

আজকাল জাহ্নবী নিজেকে একেবারেই মগ্ন করে দিয়েছেন পূজা অর্চনা ও আহ্নিকে। তার মুখের দিকে আজকাল চাওয়া যায় না। কি যেন একটা অপার্থিব গাম্ভীর্য এসেছে নেমে। এত যে ডামাডোল, তিনি এ বিষয় একটি কথাও বলেন না বা মন্তব্য করেন না। উচিত ছিল ওঁরই বেশী উতলা হওয়া, স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা কিছুটা ছিলও ওঁর—কিন্তু এখন যেন পরম নির্ভয়। এ অভয় একমাত্র হিন্দু শাস্ত্রই হয়ত ওঁকে দিয়েছে।

ঘরখানা টিনের দোতলা।

জাহ্নবী সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন। দুটি মেয়ের কপালে দুটি রক্ত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন। বলে গেলেন, 'ওরে তোদের ভয় নেই। তোদের কেউ কেশ স্পর্শ করতে পারবে না।'

এমন সময় দেখা গেল প্রায় পঞ্চাশটা মশাল জ্বলল মাধবীদের উঠানে। পত্র আর সমাপ্ত হলো না। তবু খামে ভরল মাধবী। ঠিকানা সে শেষ মুহূর্তে ভুলে গেল—তবু খামের ওপর কি বুঝে যেন একটা অদ্ভুত ঠিকানা লিখল—'বাপুজী' c/o আনন্দবাজার। তারপর ফেলে দিল জানালা গলিয়ে একটা পায়ে-চলা পথের ধারের ঝোপে। হয়ত এমন কারুর হাতে পড়তে পারে, যার সাহায্যে যেতে পারে কলকাতা। হয়ত ছাপাও হতে পারে—অসম্ভব নয় কিরণের চোখে পড়াও।

মাধবী একটা কঠিন ব্যংগ হাসি হাসল। এ সময়ে এ হাসির অর্থ বোঝা অনেকের পক্ষেই দুসাধ্য। টেনে তুলল চাঁপাকে। সে চীৎকার করে উঠতেই তার মুখ চেপে ধরল মাধবী। 'ছিঃ দিদি অমন করে না· মনে নেই কি শিখিয়ে দিয়েছে সেদিন বৌদি ?'

নীচের তলায় কাঠের দরজার ওপর ততক্ষণে কুড়াল পড়ছে, একটা গোলমাল হৈ-চৈতে পূর্ণ হয়েছে অবনী শেখরের কোঠা। বাইরেও শোনা যাচ্ছে হট্টগোল।

দুঃসাহসী ইসমাইল ঠেলে ধরেছে কপাটের খিল। প্রতিরোধ করতে হবে এই পর্যন্ত সে জানে—পরিণাম কি হবে তা সে জানে না।

মাধবী চাঁপাকে নিয়ে দোতালায় যেখানে ছিল তাল পাতার বহু কালের সঞ্চিত হাতে লেখা পুঁথি পুস্তক সেখানে গেল। কত বেদ বেদান্ত, কত পূজা পার্বণ ন্যায়

শাস্ত্রের টিকা টিপ্পনী, কত মহাকাব্যের অন্বয় ব্যাখ্যা যে ওখানে থাকে থাকে সঞ্চিত রয়েছে! আছে অতি প্রাচীন কামশাস্ত্র, মারণ মন্ত্র—রাগ রাগিণীর ধ্যান। আর ছিল নানাবিধ পাতি পত্রের পাণ্ডুলিপি—পণ্ডিত বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস —বহু শ্রমের কত মন্ত্র তন্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, সামুদ্রিক বিজ্ঞান। এ সব ছিল শশিশেখরের বুকের ধন, মাথার মণি। সবই মাধবী জানত। তাই ক্ষণকাল ইতস্তত করল। তারপর কতখানি কেরোসিন ঢেলে দিয়ে, ওর মধ্যে গিয়ে চাঁপাকে কোলে করে বসে রইল। বিশুষ্ক পুঁথির স্তূপ অগ্নি স্পর্শের জন্য যেন অপেক্ষা করতে লাগল।

ঐ ডামাডোলের মধ্যেও মাধবীর কানে গেল রকমানের ও আরও কয়েকজন মুসলমানের কণ্ঠ। মাধবী, উর্মিলা এবং বাড়ীর সবাই সব বুঝল। এসেছে অক্ষম হিন্দুরাও লাঠি সোটা নিয়ে। প্রতিরোধ করতে চাইছে উভয় সম্প্রদায়ের সৎবুদ্ধির মানুষগুলো কিন্তু ঠেকাতে পারছে না ওপর তলার কূট বুদ্ধির প্রশ্রয় পাওয়া গুণ্ডা ডাকুর শাণিত কুঠার।

ইসমাইলের বাপকে ডেকে নিয়ে তারই সাহায্যে সাঁকো পার হয়ে এসেছিল রকমান। শশিশেখরের বাড়ীর কাছে এসে সুপারি বাগে হারিয়ে গেল পথ। অনেক কষ্টে যদিও বা পথের সন্ধান পেল কিন্তু আর এগোবার জো নেই। কেবল বন্দুক চলছে, শব্দ হচ্ছে বিষম।

এতগুলো বন্দুকের আওয়াজ হওয়া অসম্ভব। শব্দ হচ্ছে বড় বড় 'গোমের' (হাত বোমার)। ঐ শব্দেই বিভ্রান্ত হয়েছে রকমানের মত দীনেশ কর্ম্মকার, রজনী দাস হারাণ কৈবর্ত প্রভৃতি।

উজ্জ্বল মশাল এক একবার ঝলমল করে উঠল নৈশ আঁধারে, এল বিশৃংখল হট্টগোল, শোনা গেল কুৎসিৎ গালাগালি সাহায্যকারীদের কটাক্ষ করে—তবু রকমান এগিয়ে যেতে চাইল ওর মামাতো ভাইকে সংগে নিয়ে।

সবাই মিলে বাধা দিল।

'এ পাগলামী কইর‍্যা লাভ কি ?'

'কও কি কম্মকারের পো, কও কি! ছাড় আমার হাত, আমারে ছাইড়া দেও।' রকমান ঘেমে উঠল প্রকৃতিস্থ বন্ধুবান্ধবের দৃঢ় বন্ধনে।

কিন্তু তার মামাতো ভাই এগিয়ে গেল হাত ছাড়িয়ে। অতর্কিতে গাবগাছটার আবডাল থেকে পড়ল লাঠির বাড়ি তার মাথা লক্ষ্য করে।

লক্ষ্যটা ভ্রষ্ট হল গাছের একটা নীচু ডালের কৃপায়। ও ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে।

নীচের তলা থেকে অবনীশেখরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'কোথায় আমার বিগ্রহশীলা, কোথায় আমার বিপদবারণ নারায়ণ উর্মিলা? যতক্ষণ জীবিত থাকব, ততক্ষণ কিছুতেই কলুষিত হতে দেব না দেবতা। তোমরা শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ কর, বিপদবারণ শ্রীমধুসূদনকে।'

উর্মিলা জানে, হয়ত অবনীশেখরও মনে মনে বিশ্লেষণ করলে বোঝে যে মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্বিপাক দেবতারও আয়ত্তের বাইরে, তবু তারা তাদের রক্ত-মাংসে জড়িত চিরপুরাতন সংস্কার ত্যাগ করতে পারে না। তারা উচ্চ কণ্ঠে শ্রীমধুসূদন-নাম আবৃত্তি করতে থাকে।

সংগে সংগে চাঁপা ও মাধবীর অশ্রুসিক্ত গলা শোনা যায়। জাহ্নবী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের সমবেত কম্পিত কণ্ঠের সংগে গলা মিলিয়ে দেন—শ্রীমধুসূদন, শ্রীমধুসূদন, শ্রীমধুসূদন······

সবাই ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, পরিস্থিতি অবর্ণনীয়—তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য শশিশেখরের গৃহ যেন দেবমন্দিরে পরিণত হয়। যেন শামগীতি শোনা যাচ্ছে, কি গম্ভীর, কি সংবেদনশীল—অথচ ভাবতে গেলে কি ভয়ংকর!

চাঁপা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

মাধবী দেখল যেন পুঁথির পাতাগুলি কাঁপছে।···

টলমল করছে যত গ্রন্থ গীতা, টলমল করছে এক প্রাচীন সভ্যতা।···

একটা অহেতুক উল্লাস জাগে মাধবীর মনে—পুড়ে যাবে তবুও ধরা দেবে না—কিন্তু ক্ষমা করতে পারে না কিরণের মত মিত্রকে।

মাধবী নীচে আর্তনাদ শুনে আগুন জ্বালায়। পলকে তার মনে বিদ্যুতের মত যেন ঝলক মারে, 'দেখ, দেখ, তোমরা চেয়ে দেখ—বিচার কর ধীর চিত্তে—অপরাধী কি কেবল ঐ নীচের তলার ডাকুগুলো? ওরা কি শুধু এক সম্প্রদায়ই ছিল বিভাগের মন্ত্রণা সভায়?'

*　　*　　*

পরদিনের সংবাদ বলছি।

অবনীশেখর খুন হয়েছে। উর্মিলাকে ধরে নিয়ে গেছে ডাকাতেরা।

৯

ইসমাইলের একখানা হাত ভেঙে দিয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় রকমানকে পাওয়া গেছে নিকটের এক বাগানে। আর শশিশেখরের ঘর যখন পুড়ে গেছে তখন চাঁপা ও মাধবীর কথা না বললেও চলে। মায়ের আশীর্বাদ মর্মান্তিক ভাবে সত্য হয়েছে —সত্যই তাদের কেউ কেশ স্পর্শ করতে পারে নি। অবনীশেখরের ছেলে দুটিকে দেখা গেল এক মাঠে কাদা মেখে ভূত হয়ে কাঁদছে।

এবার এই ঘটনার পর কদিনের মধ্যেই ভাঙল কুসুমপুর। তবে দু' এক ঘরও কি রইল না? রইল বটে কয়েক ঘর তারা অতি নগণ্য। থাকল প্রেতপুরী পাহারা দিতে প্রেত প্রেতিনীর মত।

(১৭)

একখানা নৌকা চলেছে।

সশব্দে যাচ্ছে না, যাচ্ছে নিঃশব্দে—যাচ্ছে যেন বড় লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে যাত্রীগুলো মাথা নত করে। ছৈ, ছাপ্পর পাটাতনহীন অদ্ভুত একখানা লম্বা টালাই নাও। মজুর, কামলায় বাইছে না, বাইছে শ্লথ হাতে আরোহীরা। সচরাচর এ নৌকা ব্যবহার হয় ধান টানতে কিম্বা আম কাঁঠাল সুপারি বেগুণের ক্ষেপ দিতে, এখন ওতে চড়েছে মানুষ! আশপাশের মাঝি মল্লা যাত্রাদের একটা ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রীলোক আছে, ছেলে মেয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে হাঁড়ি কলসী মায় পানের ডিবা পর্যন্ত। লটপট সংসারী ডেক্স-বাক্স জ্বালানী কাঠকুটাও রয়েছে প্রচুর। বিড়াল একটা ঝিমাচ্ছে একটা বিছানার গাদায়। ছত্রিশ জাতির লোক আছে নৌকাখানায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমশূদ্র, ভুঁইমালী, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি।

এরা ষ্টীমারে উঠতে পারেনি। যারা উঠতে পেরেছে তাদের অনেক প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় মাল-মাত্তা বিসর্জন দিয়ে গেছে ভীড়ে, ধাক্কায়, গাঙে—নয়ত উৎসর্গ করে দিয়ে যেতে হয়েছে ঘাটরক্ষী একদল বিদেশীর হাতে।

যারা পল্লীগ্রামের লোক তারা স্বভাবত সামান্য জিনিষের মায়ায় অস্থির। একটি কুটাও তারা সহজে ত্যাগ করতে রাজী নয়। তৃণ হতে কাজ হয় রাখিলে যতনে—এ প্রবাদ বাক্যটি সকলেরই প্রায় মুখস্থ। এমনি কয়েক জনে মিলে একখানা নাও জোগাড় করেছে, যাবে নৌকা পথেই কলকাতা। নানা গ্রামের অপরিচিত আত্মীয়রা একস্থানে সমবেত হয়েছে, পরামর্শ করে উঠেছে এই নায়ে। বৃদ্ধ আছে,

শিশু আছে, আছে কটি যেন যুবতী। দু'জন গেরুয়াধারী বৈষ্ণব বৈষ্ণবীও রয়েছে—হাতে তাদের একতারা। এ কুসুমপুর ভাঙনের দৃশ্য নয়, বৃহত্তর কুসুমপুর ভাঙারই একটা দৃশ্য।

দেখলে মনে হয় এরা কেউই তেমন অবস্থাপন্ন নয়। তবু সামাজিক মান-মর্যাদা ঐতিহ্য আছে সকলেরই। এরা গরীব হলেও কলের কুলী নয়, আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ নয়, প্রাচীন সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির শেষ চিহ্ন। কে কি জন্য দেশ ছাড়ছে এ প্রশ্ন কেউ কারুর কাছে করছে না—কারণ ওর পিছনে একটা হাহাকার রয়েছে, চিতা জ্বলছে সকলের বুকে। এ কথা প্রত্যেকেই জানে যে তারা একই যজ্ঞের আহুতি, একই ক্ষয় ক্ষতি স্বাধীনতার নিষ্ঠুর পরিণতি।

এরা এদেশের জনসাধারণ।

এক বৈঠার একখানা ডিঙি এদের টালাই নৌকার পাশাপাশি যাচ্ছিল। মাঝিটা তো ভেবেই স্থির করতে পারল না, এরা যাচ্ছে কোথায়? হিন্দুরা সাধারণত বড় নৌকায় বাজি পুড়িয়ে, বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করতে যায়, নয়ত বৌ তুলে আনে। কেউ কেউ বা কুমোর বাড়ী থেকে দেব-দেবীর প্রতিমাও নিয়ে আসে ধুমধাম করে।

এদের তো সে আনন্দ নেই।

অনেক ভেবে চিন্তে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা কি তীর্থে যান?'

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ ভাই যাই গংগায় তর্পণ করতে।'

'ভাল।' তারপর সে দুঃখ করে যে তাদের মত গরীবের উপায় নেই এমন দল বেঁধে মক্কায় যাওয়ার।

শশিশেখরের বাড়ীর ঘটনার পরদিনের রাত্রির কাহিনী। রকমান একটু সুস্থ হয়েই অবনীর ছেলে দুটোকে এক বাড়ী থেকে কুড়িয়ে এনেছে। কিন্তু উর্মিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্বিৎ থাকলে মা অতটুকু দুটো ছেলেকে ফেলে কি করে থাকে নিখোঁজ হয়ে? হাজারও লাঞ্ছনা যন্ত্রণায় তো মায়ের মন বেঁধে রাখতে পারে না। তবে কি উর্মিলা নেই? কেঁদে ওঠে রকমানের বুকটা। সে সন্দেহের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে পারে না। একখানা ডোঙা নাও নিয়ে রাত্রেই মন্নু সরিফের বাড়ীর দিকে ভাটা দেয়। উর্মিলাকে খুঁজে বের করতেই হবে। যদি ধন সম্পত্তি তার সমস্ত নষ্ট হয়, প্রাণটা পর্যন্ত যায়, তবু তাকে কেউ নিরস্ত করতে পারবে না। মন্নু যে কোন শ্রেণীর মানুষ, কতখানি

যে তার ছোবলের বিষ, রকমান তা জানে এবং জেনে শুনেই শক্ত হাতে বৈঠা টানে।

রকমান খাল ছাড়িয়ে গাঙে পড়ল। গাঙ ভাটিয়ে আবার একটা খালে ঢুকল। এটা ছোট খাল, দুপার চাপা। উজানে নাও বাওয়া দায়। তাতে আবার ঝোপ ঝাড় আছে মাঝে মাঝে। দু একটা বেতের লতায় কাঁটায় রকমানকে অতিষ্ঠ করে তুলল। ভয়ও আছে সাপ-খোপের।

উর্মিলাকে ওরা কোথায় 'গুম' (নিখোঁজ) করে রেখেছে ? নিশ্চয়ই মন্নুর হারেমে। সে পুলিশ কেন, পুলিশ স্যাহেবকেও অল্পই গ্রাহ্য করে।

কেমন করে, কি ভাবে যে উর্মিলাকে এই অসুরের খপ্পর থেকে রকমান উদ্ধার করবে তা এতক্ষণ সে চিন্তা করে দেখেনি। ঝোঁকের মাথায় সে কেবল বৈঠা মেরে এগিয়ে এসেছে। এইবার তার আশংকা হলো। সে একা, তারা হয়ত অনেকে। যদি একটা ল্যাজাও সংগে করে আনত। এসেছে শুধু হাতে বাঘের বাসা থেকে শিকার ছিনিয়ে নিতে।

এই তো ল্যাজা। সুতীক্ষ্ণ ফলক ঝলক মারছে অন্ধকারে। তার বয়রা বাঁশের লাঠির মাথায়ই তো ফলক লাগান। সে বারবার চেপে ধরে লাঠিটা।

নাও এঁকে বেঁকে মন্নুর বাড়ীর পিছনে এসে ঠেকল এক বিরাট ছৈলা গাছ তলা। রকমান কূলে উঠল। যদি পাঁচটা খুনও হয়, রকমান আজ গ্রাহ্য করবে না তার দেহে যেন বন্য সিংহ এসে ভর করল। কোথায় যেন ছুটে গেল তার সমস্ত রোগের দুর্বলতা।

রকমন পা টিপে চলেছে।

ও কার গলা ? রকমান থামল। কিন্তু সতর্ক রইল পিছন থেকে কেউ এসে না আবার আঘাত করে তার মাথায়।

কথা হচ্ছে, জালালের স্ত্রী ও ফতেমা বিবির মধ্যে।

'তারপর কি হইল বান্দী ?' গর্জে উঠল ফতেমা।

ফতেমার শিয়রের কাছে বড় একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে। টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, বৃদ্ধা অসুস্থ হলেও উঠে বসল একটা প্রবল উত্তেজনায়। আজ কদিন ধরে ফতেমার হাঁপানিটা খুব বেড়েছে। বহুদূরের এক গাঁয়ের একজন গ্রাম্য ডাক্তারকে আনিয়ে মন্নু সরিফ মাকে সাধ্যমত চিকিৎসা করাচ্ছে—ইনজেকসন দেওয়া হয়েছে মরফিয়া। ডাক্তার আপত্তি করেছিল—'এক্ষেত্রে'…

মন্নু হেসে বাধা দিয়েছিল, 'যা দরকার তুমি তা বোঝবা না ডাক্তার—শত হইলেও আমার মা, আমি জানি ওনার হৃদ্‌রোগের দাওয়াই।'

'তা জানবেন না কেন, আপনে এগেরদের প্রিসিডিং – আইন-কানুন সবই জানেন আপনে। দেখেন যেন শ্যাষ কালে আমি না মরি।'

'সে ভয় তোমার নাই—তুমি নির্ভয়ে ইন্‌জেকসন দেও। মায়ের এ কষ্ট আমি আর দেখতে পারি না।'

ফতেমার ঘুম ভেঙেছে ডাকাতি হওয়ার পরদিন রাত্রে। এর মধ্যে সে সজাগ দু' একবার হয়েছিল কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্যই।

জালালের বৌ খানিকটা দুধ গরম করে এনেছিল। মন্নুর নির্দেশ ছিল ঘুম ভাঙলে তার মাকে যেন আবার শিশির ওষুধ খাওয়ান হয়। ইন্‌জেকসনের উপকারিতা দীর্ঘ-মেয়াদী করার জন্যই নাকি এ বন্দোবস্ত।

জালালের বৌ শিশির ওষুধ না খাইয়ে ইচ্ছা করেই নিয়ে এসেছিল দুধ। আম্মাকে তাজা করতে হবে, নইলে আর উপায় নেই। একি নিষ্ঠুরতা! এমন নৃসংশতা তো ডাকাতের বৌ হয়েও সে কল্পনা করতে পারে না। সেও এক গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। না হয় ভাগ্যদোষে পড়েছিল জালালের মত মানুষের হাতে। ভাগ্যদোষ নয়—গরীব বাপ অর্থ লিপ্সায় দিয়েছিল নাম করা ডাকুর ঘরে বিয়ে। জালালের বৌ আলেয়া ছোট থাকতে যা বুঝতে পারেনি, এখন সে তা সঠিক ভাবতে পারে। তলিয়ে বুঝতে পারে কোথায় রয়েছে পাঁক। এই যে টাকা পয়সা সোনাদানা এ বিলকুল পঁচা মাটি। এতটুকুও খাঁটি নয় খোদার দরবারে। তার আপশোষ হয়—সেও তো ঐ পঁচা পাঁকের লোভে জালালকে ছেড়েছে। লাভ হয়নি, শুধু খেটে মরছে! জালালের তুলনায় মন্নু যে কত বড় বেপরওয়া নির্মম তা চিন্তাও করা যায় না। সোনার গয়না যা আনার তা না হয় লুট করে এনেছিল,—আবার স্ত্রীলোক কেন? আলেয়ার বুকে বাজল বিষের শর। শান্ত সাম্য বাঙলা দেশের চাষী-গৃহীর মেয়ের সহজাত বিবেক-বুদ্ধি অর্থলিপ্সায় ডাকাতি করাটা বরঞ্চ সহ্য করতে পেরেছিল, কিন্তু অসহ্য হলো ঊর্মিলার অবরোধ। এ অবরোধ শুধু অবরোধ হলেও কথা ছিল। আলেয়ার হুকুম নেই ঊর্মিলার ঘরে যাওয়ার, অথচ কড়া নির্দেশ রয়েছে তার ওপর নজর রাখার। আর একটা উপদেশও আছে, যেন আম্মা না এসব টের পায়। তার মেজাজ শরিফ ভাল নয় কিনা! মন্নু একটু মুখ মুচকে হেসেছিল

আলেয়াকে খুসি করার জন্য। যখন আলেয়া বুঝতে পারল ফতেমাকে ওষুধের নামে কি খাওয়ান হচ্ছে এবং উর্মিলাকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে তখন যেন তার মাথায় ভেঙে পড়ল আকাশটা। উর্মিলার আগমনে আলেয়ার প্রথম একটা ক্রোধ ও আক্রোশ হয়েছিল—হিংসায়ও জ্বলেছিল রূপবতী যুবতীকে দেখে। তার পরিচয় সঠিক সে জানত না, উর্মিলার সংগে কথা বলারও আলেয়ার সুযোগ হয়নি মোটেই—তবু অন্তর্লীন একটা নির্মল নিষ্পাপ সহানুভূতি কেঁদে উঠল উর্মিলার চীৎকার ও আকুতি শুনে।

সহসা তার চোখ খুলে গেল, সে দেখতে পেল শাহানশার আসল রূপ।

নারী অপরের দৈহিক লাবণ্য ও রূপকে হিংসা করে—ঈপ্সিত জনের নিকট উপস্থিতি তো তার মৃত্যুতুল্য—কিন্তু আলেয়ার অপূর্ব পরিবর্তন ঘটল। কোথায় গেল তার হিংসা, কোথায়ই বা তার দ্বেষ! কামনাকে ছাড়িয়ে বহু উর্দ্ধে চলে গেল এই ডাকুর বৌ আলেয়া। মহৎ আবেগে মহিমান্বিত হয়ে উঠল এর হৃদয়। তাই উচ্ছ্বাস এলো অন্তরে বন্যাধারার মত। সে তো একা পারবে না মনুর সংগে, তাই সুস্থ করতে এসেছে আম্মাকে। তার সাহায্য চাই।

প্রদীপের আলোতে চকচক করছে ফতেমার সাদা চুলগুলো। রুগ্ন মুখেও যেন একটা অম্লান দীপ্তি খেলা করছে মনুষ্যত্বের। রকমান টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কান পেতে শুনতে লাগল কি কথা হয়। হাতের ল্যাজার ওপর সে ভর করে টিনের বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘন ঘন পড়ছে তার শ্বাস।

এক একটি করে সব কথা বলল আলেয়া। ডাকাতি থেকে এখানে উর্মিলাকে নিয়ে আসা পর্যন্ত যতদূর সে জানত সমস্তই খুলে বলল। তবে সে মাঝে মাঝে বৃদ্ধা সিংহিনীর গর্জনে গুলিয়ে ফেলতে লাগল দু একটা সংবাদ।

'হুঁ. বাঁদী, জানো সবই ক্যাবল কও নাই আমার কাছে।'

'না আম্মা···আমি ··' পা জড়িয়ে ধরতে গেল আলেয়া।

'চুপ হারামজাদী। তোরও খাল (চামড়া) খোলার দরকার—দরকার কুত্তা দিয়া খাওয়ান।'

আলেয়া কেঁপে উঠল। সে ফতেমাকে ভাল করেই চিনত। তার রুক্ষ মেজাজের কাছে সোজা হয়ে জবাব দেওয়ার ক্ষমতা নেই এ গেরদের ভাল ভাল মর্দেরও।

গরম দুধটুকু খেল ফতেমা। আরও এক পেয়ালার ফরমাস করল। তাও

লো এবং খেল সে। ভাবল অনেক কথা। এখন একটু যেন সবল মনে হচ্ছে দুর্বল দেহ। আলেয়াকে হুকুম করল তামাক সাজতে। বড় লিপ্সা হচ্ছে এক ছিলিম তামাক খেতে।

কিছুক্ষণ বাদে একটা ডাব্বা হুঁকো নিয়ে হাজির হলো আলেয়া।

রকমান অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কোথায়, কোন ঘরে, এখন কিভাবে রয়েছে উর্মিলা তা তো সে সঠিক জানতে পারল না। বৌদিদি তার সজ্ঞানে না অজ্ঞানে রয়েছে এখন?

চিন্তায় ফতেমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। পরিস্থিতি এমন কঠিন যে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে ফতেকারও সাহস হচ্ছিল না। মন্নু তাকে দেখলে চুপ করে থাকে বটে, কিন্তু আদপে সে কারুকে গ্রাহ্য করে না। লোভ এবং লাভের জন্য এ দুনিয়ায় এমন কোনও কাজ নেই যা সে না করতে পারে। তার কবল থেকে উর্মিলাকে উদ্ধার করা এক দুরূহ কাজ। তবু তাকে এ কাজ করতেই হবে। সে জীবিত থাকতে তার ঐতিহ্য ও গৌরব কিছুতেই ক্ষুন্ন হতে দেবে না। সে প্রাচীন পন্থী—এখানে সে কিছুতেই অনুমোদন করতে পারে না বর্তমান নবীন পন্থীদের। তাদের এ মনভাব মনুষ্যত্বের দরবারে অচল।

'ও ঘরে এহন কে আছে?'

'কেও নাই আম্মা—ক্যাবল ঠারইনে।'

'সত্য কও তো বাঁন্দী?'

নীরব হয়ে থাকে আলেয়া। আঘাতে তার অন্তর পুড়ে যায়। এখনও অবিশ্বাস!

উঠে দাঁড়ায় ফতেমা।

'তামাকু · ?' আলেয়া জিজ্ঞাসা করে, 'তামাকু খাইবেন না?'

'এখন না। শোন আলেয়া, আমি বৌডিরে মাঠের পথে লামাইয়া দিমু, এই সুযোগে তুইও চইল্যা যা, নাইলে কিন্তু বাঁচাবি না। আমি রইলাম জান-কোরবানী দিতে। বুড়া বকরীর এই তো আইছে বখ রঙ্গদের সময়।'

আম্মা ফতেমা টলতে টলতে এলো উর্মিলার ঘরে। তার বন্ধন উন্মুক্ত করল। নীরবে তার ললাটে একটা চুমো খেল। উর্মিলাকে কোন কথা বলতে দিল না। সময় সংক্ষেপ। তাকে দেখিয়ে দিল অন্ধকারে মাঠের কর্দমাক্ত পথ।

দেরী করে না মা, খোদা মশাল দেখাইবে—এ আঁন্দার (অন্ধকার) আঁন্দার না।'

উর্মিলা পথে নামল। ইতস্তত করতে লাগল আলেয়া।

'তুই যে গেলি না—দূর হ' হারামজাদী আমার স্মুমুখ থিক্যা। ছিচ্-কান্দণ্যা বজ্জাত্! দেখ মজা হারামজাদীর চক্ষু ভরা বিলকুল ঝুটা পানি।'

এবার আলেয়াও উর্মিলার পিছু পিছু এগিয়ে চলে। সে চোখ থেকে কিছুতেই আঁচল সরাতে পারে না। কেন তার এ কান্না সে নিজেই কিছু বুঝতে পারে না। কেউই তো তাকে চায় না, তবে এ সব কি তার দুর্বলতা?

বুড়ী ফতেমা কেমন করে যেন চেয়ে থাকে। সেও বুঝতে পারে না কেন ঝাপসা হয়ে আসছে তার দৃষ্টি।

মশাল হাতে নিয়ে খোদা এলো না, কিন্তু খোদ রকমান যেন দেবদূতের মত হাজির হলো। বিস্মিত হল ফতেমা। কে এ?

'হাজার হাজার আদব তোমারে—তুমি ক্যাবল আমাগো না, সারা দুনিয়ার আম্মা।' তারপর রকমান অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

উর্মিলা প্রশ্ন করল, 'কে, রকমান না?'

'হয় বৌদিদি আমিই।'

'ওরা আছে তো?'

'হয় আছে বাইচ্যা।'

এতক্ষণে বোঝা গেল উর্মিলা কি আশায় জীবিত রয়েছে। স্ত্রীলোকের এর চেয়ে বড় আশা বোধ হয় আর নেই এজগতে।

(১৮)

তখনই উর্মিলা ও আলেয়াকে নিয়ে রকমান একটু ঘুরে নায়ে এসে উঠে, নৌকা খুলে দিল। আলেয়ার সংগে দুচারটা কথা হল পথে। বেশী কিছু বলার সময় নয়, আকারে প্রকারেই যা কিছু বলতে হয়। কিছুদূর এগিয়ে আলেয়াকে তুলে দিল তার এক মাসীর বাড়ী। বলে দিল, আজ রাত্রেই সে যেন চলে যায় তার পিত্রালয়।

তারপর যত দ্রুত সম্ভব রকমান বাড়ীর ঘাটে এসে নাও ভিড়াল। এমন ভাবে ঘুমন্ত ছেলে দুটোকে তুলে নায় নিয়ে এল যে একটা কাক প্রাণীটিও টের পেল না। অবশেষে ওদের রকমান উঠিয়ে দিয়ে গেল তার এক আত্মীয়ের বাড়ী।

তাদের অবস্থা কতকটা ভাল এবং বাস তাদের ভিন্ন থানায় এলাকায়—মন্নুর নাগালের বাইরে, একটা বড় নদীর ওপার।

এরা মুসলমান হলেও অল্প কথায় সব বুঝল এবং মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বাধ্য হলো দায়িত্ব নিতে।

যাওয়ার সময় রকমান বিশেষ কিছু আর বলে যেতে পারল না—গেল কেমন যেন আমতা আমতা করতে করতে। তখন তখনই সে চলে গেল কারণ মন্নু টের পেলে দেবে তার ঘর দুয়ারে আগুন ধরিয়ে। মন্নুর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। যখন মন্নুকে না জানাবার সুযোগ রয়েছে তখন এ সুবিধা গ্রহণ করাই উচিত।

সেই যাত্রীবাহী টালাই নাও এগিয়ে চলেছে শেষ রাত্রের জোয়ারে। কনকনে শীতে কুয়াশায় এগিয়ে চলেছে বহর ছাড়া যেন বন্ধুবান্ধবহারা একখানা নাও। রাত্রে সচরাচর এমনধারা নিঃসংগ নৌকা চলার রীতি নেই এদেশে। যায় একত্র হয়ে অনেক নাও, তাকেই বলে বহর। কিন্তু বহর এরা হারিয়েছে, দল এদের ভেঙে গেছে তাই চলেছে একা একা এগিয়ে।

শীতের হাওয়ায় বয়স্করা আড়ষ্ট হয়ে আছে, অতি প্রাচীনেরা ঠকঠক করছে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে ছেলে মেয়েগুলো। কাঁথা কাপড়ে শীত মানছে না বুঝি তাদের।

ঝিমাচ্ছে নাও-বাইয়ে যাত্রীরা। তাই দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে পাতলা এবং হাল্কা। এগোচ্ছে সামান্যই—জোয়ারেরও যেন জোর নেই, তোড় নেই মোটে।

'কারা ভাই যাও, আমাগো একটি মাইয়া লোকনি সংগে নেও—যাইবে কইলকাত্তা?'

সকলে সচকিত হয়ে ওঠে।

অনেক কথাবার্তার পর এরা রাজী হলো উর্মিলাকে সংগে নিতে। পথ খরচা, খোরাকী খরচা কে দেবে? রকমানের আত্মীয় মুসলমানটি পঁচিশটি টাকা এনে দিল একজনের হাতে। ধবধবে দুখানা পরিষ্কার কাঁথাও দিল এই বস্ত্র সংকটের বাজারে।

তখন পর্যন্ত উর্মিলার তেমন চৈতন্য বোধ হয়নি। জ্ঞান, মন, বিবেক, বিচার যেন তার অসাড় হয়ে গেছে। অত্যাচার সে সয়েছে বিস্তর। ভাইএর কথা তার মনেও হয়নি। আর মনে হলেও পংগু ভাইয়ের গলগ্রহ হতে সে কিছুতেই যেত না এসময়ে। কলকাতা যাওয়ার কথাও যে সে চিন্তা করে ঠিক যাচ্ছে, তা নয়। রকমানের আত্মীয়রা এই ব্যবস্থাই ভাল বলে বিবেচনা করল তাই সে উঠল নায়ে।

জগত তার কাছে আজ অসার। সে যে একটা নৈতিক আদর্শের বলি, একটা কঠোর নিষ্ঠার পরিণাম—তার জন্য তার মনে এখন আর অবকাশ নেই সুখ হর্ষ কিম্বা অহংকারের। না আছে কোন আনন্দ। স্বামীর মস্তক ছিন্ন হয়েছে, ননদেরা আত্মাহুতি দিয়েছে—একথাও সে ভাবছে না। শূণ্য আকাশের মত ফাঁপা হয়ে গেছে তার মন। যেদিকে সে তাকাচ্ছে, দেখছে শুধু—নেই, নেই, কিছু নেই! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রিক্ত, আকাশ বাতাস বিষাক্ত।

উর্মিলার মাথা ঘুরতে লাগল। সে কাত্ হয়ে রইল ছেলে দুটোর একপাশে। দুরন্ত শীতের রাত্রির কুয়াশায় ভিজে যেতে লাগল কাঁথা কাপড়।

সকাল বেলা একটু রোদ উঠতেই একজন যুবতী স্ত্রীলোক তাকে ডাকবে ভাবল। স্বল্পপরিসর স্থানে উর্মিলাকে এক অনাহুত আপদ বলে মনে হল তার।

বিনোদ সামন্ত তার স্ত্রীর মনের ভাবটা বুঝে তাকে নিষেধ করল, 'আহা থাক, থাক।'

স্ত্রীলোকটি গজগজ করে চুপ করে রইল। খরচ দেবে সকলেই সমান, একজনে সুবিধা ভোগ করবে কেন ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী?

বেলা একটু বেশী বাড়ার সংগে সংগে যেন উত্তুরে হাওয়াটা বাড়ল। ঘুম ভেঙে গেল উর্মিলার। সে সোজা হয়ে উঠতেই সবাই দেখল যে তার কাপড় চোপড়ে চাপড়া চাপড়া রক্তের দাগ। নিকটের সেই স্ত্রীলোকটি ঘৃণায় সরে গেল। কে যেন দাঁত বের করে হেসে একটা ঠেলা দিল নিকটের সংগিনীকে।

পুরুষেরা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে ছিল। উর্মিলা যেমন উঠেছিল তেমনি আবার কাঁথা কাপড় জড়িয়ে বসে পড়ল। সংগে তার তো আর একখানাও বাড়ন্ত শাড়ী কিম্বা ছেঁড়া নেকড়া নেই।

বিনোদ সামন্তের সবই নজরে পড়েছিল, সে বলল, 'বাতাসীর মা চাবিটা দে।'

'কেন?'

'কাজ আছে।'

কাজটা কি সে অনুমানে বুঝে জবাব দিল, 'পাচ্ছিনে। রাত্রে কোথায় রাখলাম যে চাবির থোকাটা!'

'ভাল করে একটু খুঁজে দেখ।'

'কেমন করে এর মধ্যে খোঁজে বলতো? জায়গা একটু মানুষ একুশটা।'

ইংগিতটা বুঝে একেবারে জড়োসড় হয়ে বসে উর্মিলা।

'দেখ বাপু সকাল বেলা আমাকে আবার স্নান করিও না।' বাতাসীর মার কথায় উর্মিলা মরমে মরে যায়।

বিনোদ সামন্ত একটা লোহার শলা নিয়ে ওঠে বাক্স ভাঙবে বলে। অমনি চাবি পাওয়া যায়। 'এই যে ছড়ানি।' এগিয়ে আসে সামন্তের বৌ। বিনোদ একখানা লাল পেড়ে ভাল শাড়ী কাপড় বের করে। উর্মিলা তা দেখে বলে, 'দিলেনই যখন তখন বদলে দিন ওখানা।'

'কেন মা?'

'আমি বিধবা।'

অথচ কপালে সিন্দুর রয়েছে—হিন্দু এয়োতির সুস্পষ্ট ছাপ। এর অর্থ কি? কেমন সুন্দর মুখখানা কিন্তু বড় বিশুষ্ক। যেন একটা করাল কাল বৈশাখী বয়ে গেছে ওর দেহ ও মনের ওপর দিয়ে। মুসলমানরা সবই বলেছিল, তবে কিছু খুলে বলেনি এই ভয়তে পাছে এরা অস্বীকার করে মামলা মকর্দমার আশংকায় উর্মিলাকে সংগে নিতে। এখন তো আর এদেশে আইন-কানুন নেই। আসামী তো দূরের কথা ফরিয়াদীকেও সাহায্য করলে অপরাধ হতে পারে সরকারের চোখে।

নৌকার সমস্ত যাত্রীরা বিস্ময়ে কৌতূহলে উর্মিলার দিকে চেয়ে রইল। উর্মিলা সংক্ষেপে তার সমস্ত কাহিনী এদের জানাল। বিনোদ সামন্ত থান কাপড় আর খুঁজে সময় নষ্ট করল না—পাড় ছিড়ে ঐ শাড়ীই পরতে দিল।

বাতাসীর মা পায় ধরে ক্ষমা চাইল। উর্মিলা সামান্য কথায়ই সান্ত্বনা দিল তাকে। স্তব্ধ হয়ে রইল বাইয়ে ক'জন। অক্ষম আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল বুকের পাঁজর। নৌকা এগিয়ে না গিয়ে প্রায় রশি দশেক পিছিয়ে এলো। তখন জ্ঞান হলো আবার বাইয়েদের। ওরা ভাবতে লাগল যে ওরা কেউ অক্ষম নয়। ওদের বাহুতে এখনও শক্তি আছে বন্য বরাহের। তবু ওরা কেন জানি পারল না ঠিক আঘাত করতে, ন্যায্য প্রতিশোধ নিতে অন্যায়ের। ওদের কেমন যেন কারা গাছে তুলে দিয়ে কেড়ে নিয়েছে মই—করে ফেলেছে দুর্বল অসহায়। অথচ ওরা সত্যি তা নয়।

দেখতে দেখতে দুটো দিন গত হয়ে গেল। রান্না-বান্না হলো কোন পরিত্যক্ত হাটখোলার বাচারিতে নয়ত কারুর দরজার বড় গাছতলায়। সকলের এক সংগেই খাওয়া-দাওয়া হলো উন্মুক্ত আকাশের তলে। ছোঁয়া-পানির আর অত

বাছ-বিচার রইল না। বিপদ এবং দুঃখে যেন বৈষম্যমুক্ত হতে চলেছে সমাজের ছত্রিশ জাতি।

জোয়ার এলে, নৌকা আবার এগিয়ে চলল।

শুধু অন্নস্পর্শ করল না উর্মিলা। জলও সে স্পর্শ করত না, যদি জীবন ধারণের ভিন্ন কোন পথ থাকত। নৌকার সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বাতাসীর মা একেবারে পা দুখানা জড়িয়ে ধরে তাকে অনুরোধ করল, একটু দুধ আর কটি কলা খেতে হবেই। দুধ এবং কলা পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করেছিল বাতাসীর মা। সন্তানের মংগলের জন্যই তার অনুরোধ রাখা উচিত। সব গেছে ওরা তো রয়েছে।

'এগার দিনের আর চারদিন বাকি—শ্রাদ্ধান্তে তো সবই খাব।'

'না দিদি—প্রাণে না বাঁচলে শ্রাদ্ধ করবে কে? চার চারটা দিন কম নয়।'

'এখনও যখন বেঁচে আছি, সহজে এ জীবন যাওয়ার নয়।' অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি করার মত শক্তি ও উদ্যম ছিল না উর্মিলার। অগত্যা তাকে কিছু আহার্য গ্রহণ করতে হয়।

এই দুদিনের মধ্যে এমন একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছে যে লাঞ্ছিতা অপমানিতা উর্মিলাই হয়েছে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী। ওর কঠোর নিষ্ঠা অবাক করেছে সকলকে।

উর্মিলা কারুর সংগেই যেচে কথা বলে না। নিতান্ত ঠেকা না হলে ছেলে দুটোর কাছেও থাকে নির্বাক। কেবল বিনোদ সামন্তের কাছে মাঝে মাঝে খোঁজ নেয়, সময় মত কলকাতা পৌছান যাবে তো?

আকাশ পরিষ্কার, মেঘ বৃষ্টির কোন চিহ্ন নেই, এ অবস্থায় এগার দিনের পূর্বেই আশা করা যায় যে গন্তব্য স্থলে পৌছান যাবে।

উর্মিলা চায় স্বামীর শেষ কাজটুকু গংগা জলে সারতে।

আর একটা দিনও বেশ নিরাপদে কাটল। নৌকার আরোহীরা ভাবল তারা জাহাজে না গিয়ে ভালই করেছে। বিদেশে নতুন একটা সংসার পাতাতে হলে কত কি টুকি-টাকির দরকার। তা তো কিছুই নিতে পারেনি জাহাজের যাত্রীরা, ওরা বরঞ্চ নিয়ে যাচ্ছে সব।

সেদিন নৌকা আর কিছুদূর অগ্রসর হলে চারজন মুসলমান যাত্রীদের ডেকে নৌকা থামাল। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল বন্ধুর মত, কিছু ফল-মূল এনে দিল যাত্রীদের খেতে। অবশেষে তারা কাকুতি মিনতি করতে লাগল যে তারাও

যাবে ওদের সংগে কলকাতা। দেশে চালের দর অত্যধিক—বিদেশে না গেলে আর চলে না। কম খেয়ে উপোষ করে শুকিয়ে গেছে ছেলে মেয়ে। একজন বলল যে, এই তো দেখেন বার বছরের মেয়েটির শ্রী কি! মনে হয় যেন ছ বছরের খুকি। এমনি গাঁয়ের অধিকাংশ ছেলে মেয়ে। রায়টের আগে ওরা নাকি কুলি এবং দপ্তরীর কাজ করত বড়বাজারে। এখন আবার সেখানেই যাবে। টালাই নায়ে মাঝি নেই, ওরা যাবে মাঝি হয়ে বেয়ে-ছেয়ে।

বিনোদ সামন্ত একটু আশ্চর্য হল।

জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা দেশ ছেড়ে যেতে চাও? পাকিস্তান ছেড়ে?'

'পাকিস্তান দিয়ে মজুর মুটের কি হবে যদি ভাত কাপড় না মেলে?'

বিনোদ এ মন্তব্যে খুব খুসি হল না। সে খুসি হত অন্তত এদের সুখ-সমৃদ্ধির কথা শুনলে।

'যদি যেতে হয় চল ভাই, কিন্তু সেখানে গেলেও তোমার আমার শ্রীবৃদ্ধি নেই বুঝলে।'

কি করবে, তবু ওরা সংগে যাবে। ওরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে জোগাড় হয়ে নায়ে উঠল।

বাতাসীর মা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—দেখতে শুনতে ফিটফাট। ছেলে মেয়ে বিনোদ সামন্তের আগের দু' পক্ষের গর্ভেও জন্মায়নি, বাতাসীর মাও বন্ধ্যা। তবু বৃদ্ধ সামন্ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল নিজের রোজগারে, তাই সখ করে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে ডাকত বাতাসীর মা বলে। বুড়োর ছেলের চাইতেও কেন জানি বেশী সাধ ছিল মেয়ের।

বাতাসীর মার বড় ইচ্ছা কলকাতা যখন যাচ্ছে এবং স্থায়ীভাবেই সেখানে যখন বসবাস করবে তখন কিছু অভিজ্ঞতা পথে বসেই সঞ্চয় করে। অভিজ্ঞতাও সে সঠিক সঞ্চয় করতে চায় না, চায় বর্ণনা শুনতে। এই মটরগাড়ী, ট্রাম, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর ইত্যাদির। হাতে তার কিছু পয়সা আছে, নাভিমূলে সোনাও সে কিছু গোপন করে নিয়েছে, বয়সও নেহাৎ মাত্রা ছাড়ান নয়—এমন মানুষের মন চঞ্চল হওয়া কি অস্বাভাবিক? এতগুলো যাত্রীর মধ্যে কেউ তেমন সৌখীন নয়—গেঁয়ো ভূত, কেউ কখনও নামেনি বাড়ী ছেড়ে। শুধু নাকি তার স্বামী ক'বার কলকাতা গিয়েছিল, আর সে শহর দেখেছে কেবল উর্মিলা। স্বামী কটূক্তি করে উঠবে অসময়ে এসব কথা শুধালে আর উর্মিলা তো পাথরের মত

নির্বাক। তাই বাতাসীর মার মনটা আঁকু-পাঁকু করতে থাকে। গেঁজিয়ে ওঠে কথার ভিয়ান।

আরও একটা দিন গত হলো—নৌকা এবার ঠেলে চলেছে উজান জল। গতি মন্থর। বাতাসীর মা একেবারে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কেউ কিছু না বলুক, কলকাতা ও যদি পৌঁছতে পারত!

নৌকার অন্যান্য আরোহীরা ম্রিয়মান। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশংকায় সংকুচিত। মুখে হাসি নেই, বেশী কথা-বার্তা নেই কারুর মুখে। সকলেই এসেছে অল্প বিস্তর কিছু হাতে নিয়ে, কিন্তু সংগে এক একটা সংসার। শুধু স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যার সংসার নয়, গলগ্রহ এবং পোষ্যও আছে দু' একজনার। দেশে বসে যারা মুখের দিকে চেয়ে থাকত, বিদেশে আসার সময় তাদের উপেক্ষা করে আসে কি করে?

সন্ধ্যার একটু পূর্বে পাকিস্তানী একদল দৈত্য সংগিন উঁচিয়ে টর্চের আলো ফেলে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর যাত্রীদের নাও ঘিরে ধরল। তারা স্ত্রীলোক কেড়ে নেবে, না সোনার গয়না ছিনিয়ে নেবে, না এদের সবাইকে ডুবিয়ে মারবে বোঝা গেল না।

বাতাসীর মার মুখ এতটুকু হয়ে গেল। বয়স তো তার বেশী নয়।

(১৯)

কয়েকটা দিন পরের কথা বলছি।

পরাণ এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী তারপর আবার এক গ্রামে রোগী দেখতে দেখতে প্রায় সাতদিনের পথে চলে গিয়েছিল। ফিরে যখন এলো তখন তাকে একখানা ডোঙা নায় করে এক রোগীর আত্মীয়েরা দুপুর রাত্রে উর্বশীর বাসার কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল।

'অপ্সরী, অপ্সরী—ও অপ্সরী, সজাগ আছনি?' বড় আনন্দে ডাকতে ডাকতে এলো পরান। ঘর দোর উন্মুক্ত। কেবল পালিত কুকুর দুটো ঘেউ ঘেউ করে পরাণের কাছে ছুটে এসে কাঁদতে লাগল। পরাণের বুকটা ছ্যাক্‌ করে উঠল। সে কিছু জানে না, তবু একটা অজ্ঞাত আশংকা তাকে অধীর করে ফেলল। হঠাৎ কি হতে পারে উর্বশীর? সে একটা দিয়াশলাই জ্বালল। যদি ওর ওপর রাগ

করে গুম্ মেরে থাকে, যদি লুকিয়ে থাকে দোরের আবডালে ও তাকে খুঁজে বের করবে।

ঘরের একটা শ্রীহীন ভাব দেখে ওর আশংকা আরও দ্বিগুণ হলো। 'ও অপ্সরী, অপ্সরী!' কেউ সাড়া দিল না। বাড়ীটা সত্যই জনশূণ্য।

পরাণ আবার ভাল করে খুঁজল উর্বশীকে। ডাকল সপ্তমে গলা চড়িয়ে। ক্রমে তার স্বর খাদে নেমে এল। সে তন্ন তন্ন করল ঘর দোর। উর্বশী কোথায় কখন কি ভাবে বসে থাকত, চুল এলিয়ে দাঁড়াত, ঘাট থেকে ভরা ঘড়া কাঁখে ফিরে আসত সব তার মনে পড়তে লাগল। ঘাটে বাটে, উঠানে, ঘরে সর্বত্রই যে তার স্মৃতি জড়িত। এ কিসের স্মৃতি--কামনার না প্রেমের? কামনা কোথায়? এ যে শুধু প্রেম। দয়িতার জন্য গভীর আকুতি। পরাণ যত খোঁজে, তত তার বুক জ্বলতে জ্বলতে প্রেম হেমে পরিণত হয়। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া তুচ্ছ করা স্বর্ণের সে তো সন্ধান পায় না। মনে যে রয়েছে, রক্ত মাংসের দেহে এবং রূপে তাকে দেখতে চায় পরাণ। 'অপ্সরী, অপ্সরী!' কোন জবাব আসে না।

পরাণ দাওয়ায় বসে পড়ে। কুকুর ছানা দুটো ওর পায়ের কাছে এসে কাঁদতে থাকে। সেই কাঁদনে যেন কেঁদে ওঠে রাত্রির আকাশ, খাল, বিল মেঠো হাওয়া, ফলবতী নারকেল সুপারি গাছগুলো পর্যন্ত।

কত শঠতা করেছে পরাণ, তাই আসে অনুতাপ। মর্মে বেঁধে শানিত আঘাত। নীচ কূলে জন্ম বলে করেছে কত তুচ্ছ! এখন যদি সেই তুচ্ছ অচ্ছুৎ মেয়েটাকে সে পেত তবে সাপের মাথার মনির মত করে সে তুলে রাখত। ওর উর্বশী যে স্বর্গের অপ্সরী! আজ যদি একবার সাক্ষাৎ পেত, তবে নিশ্চয়ই পরাণ পায় ধরে ক্ষমা চাইত।

পরাণ অন্ধকারেই চলল কুসুমপুরের দিকে।

ও কত বার্তা, কত ব্যাকুলতা যে বহন করে নিয়ে এসেছিল! একটা নয় দুটো নয়—সাত সাতটা দিনের পুঞ্জীভূত কথার অর্ঘ্য!

বেশ খানিকটা মেঠো পথ ভেঙে, লম্বা লম্বা জংলা ঘাসের শিশিরে কাপড় -চোপড় ভিজিয়ে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে পরাণ এসে উঠল সরকার বাড়ী।

'কান্তি, কান্তি ও সরকার!'

সে দেখল বাইর থেকে বড় বড় দুখানা ঘরে তালা মারা। এরা কি কোথায়ও কোন আত্মীয়-বাড়ী বেড়াতে গেল? কিন্তু এদের খড়ের গাদাগুলো কই?

গোয়ালখানা যে খালি। গরু-বাছুর তো আর মানুষের মত নিমন্ত্রণ খেতে যেতে পারে না এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে।

জনশূণ্য লাগছে এমন বনেদী গৃহস্থবাড়ী।

পরাণ একটা প্রাচীন শিবমন্দির ও বোসদের নবরত্নতলা ছাড়াল। এবার তাঁতি বাড়ী। 'যোগন ও যোগেন!'

পরাণ ডাকছে কাকে? বাড়ীর ওপরের ভিটিগুলিই তো শূণ্য। কোন দৈত্য এসে ভেঙে নিয়ে গেল নাকি ঘর দুয়ার? সে তো ভুল করেনি? কুসুমপুর তাঁতি বাড়ী না এসে সে অন্ধকারে অন্য কোথায়ও এসেছে নাকি? না—ঐ তো তাঁতিদের বড় চরকাটা পড়ে রয়েছে। একটা শৃগাল বের হলো মনসামণ্ডপ থেকে। ওরা ঘর দোর ভেঙে নিয়ে ছেড়ে গেছে দেশ, তবু ভাঙতে ওদের মন সরেনি চোদ্দ পুরুষের স্থাপিত দেবীমণ্ডপ।

এগিয়ে চলল পরাণ। কোথায় যাবে? কার কাছে সংবাদ পাবে এই বাস্তু ত্যাগীদের?

আরও কয়েকখানা ছোট ছোট জনহীন বাড়ীর ওপর দিয়ে হেঁটে গেল পরাণ। রামু রজকদাস নেই, নেই মণি শীল। খিলহীন এক জোড়া কবাট হাঁ করে রয়েছে।

একটা তক্ষক সজোরে ডেকে উঠল একটা মৃত পত্রহীন গাছের কোটর থেকে। পরাণ একটু যেন ভয় পেল। 'সমস্ত মানুষকে কি ঐ একটা ক্রুরবুদ্ধি সর্প ধ্বংস করে এখন পরম আনন্দে ডাকছে? পরাণ গাছটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল জোর কদমে।

সে পণ্ডিত বাড়ীর কাছাকাছি হলো। টিনের ছোট বসতি আটচালাখানা কই? মৃত জ্যোৎস্নায় লক্ষ্য করল কাঠ কপাট টিনের একটা ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। চেনা যাচ্ছে না গোঁসাইমণ্ডপ। আগুন দিল কে? ঐ তো পোড়া খুঁটি, গাদা গাদা ছাই। মরা শকুনের মত ডানা মেলে যেন পড়ে আছে টিনের চালের পাঁজর।

পরাণ হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

এই কি শশিশেখরের বাড়ী? এ তো বিশ্বাস করতে পারে না পরাণ।

কে যেন কাঁদছে ঐ ভাঙা পাঁজরের তলে বসে। একটা প্রদীপও জ্বলছে যেন।

পরাণ আর একটু এগিয়ে এলো। সে ভাল করে কান পেতে শুনে বুঝতে পারল, এ তো ঠিক ক্রন্দন নয়। জাহ্নবী দেবী মহাভারতের নারীপর্ব পড়ছেন।

যেন বিলাপ করছেন গান্ধারী—ক্রন্দন নয়, বিলাপ। হস্তিনার প্রাচীন সেই ঐশ্বর্যের কথা মনে পড়ল পরাণের। কাশীরাম দাসের পয়ার করুণ নিক্বণে বেজে উঠল এই গ্রাম্য চিকিৎসকের বুকে। অভ্রংলিহ প্রাসাদ, দরবার, হস্তিশালা মুহূর্তে ভেসে এল চোখের সুমুখে। সকলই শূন্য। রথী নেই, সারথি নেই, নেই কর্ণ দ্রোণাচার্য। কোথায় স্থির প্রতিজ্ঞ পিতামহ? কোথাই বা অভিমন্যু, ঘটোৎকচ—দুর্যোধনের অমিতবিক্রম শত ভাই?

কুরুক্ষেত্র শবাকীর্ণ।

কিন্তু কুসুমপুরের বাসিন্দারা তো ভাই ভাই কলহ করেনি—নিশ্চয় ওরা সবাই আর মরেনি, কিন্তু, কিন্তু ওদের কি হয়েছে?

পরাণ আকাশের দিকে চেয়ে যেন জিজ্ঞাসা করে, বলতে পার হে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল এই কুসুমপুরের বাসিন্দাদের কি হয়েছে? তোমরা তো শুধু আজকার সাক্ষী নও, সাক্ষী যুগযুগান্তের—তোমরা কি বলতে চাও, এই একসপ্তাহ কাল ছিলে ভয়ে আতংকে চোখ বুজে? জেনেছ, বুঝেছ সবই কিন্তু চোখ মেলনি সাহস করে। কেন, এমন কি ঘটেছিল, যা কুরুক্ষেত্রের চেয়েও হৃদয় বিদারী? বল, বল জ্যোতিঃপুঞ্জ কি হয়েছে কুসুমপুরবাসীদের?

যেন কেঁপে ওঠে তারা স্তোম।

পরাণ ঘাসগুল্ম বৃক্ষলতার কাছে জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করে কীটপতংগটির কাছে পর্যন্ত—ওদের সংবাদ কি কেউ জানো না? এই নানা বয়সের লোক, গৃহস্থের গরু ছাগ মেষ, কৃষকের ধান, ব্রাহ্মণের মান, কারবারীর কারবার, কুমোর কামারের গড়ন, সমস্ত কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? না প্রলয়ংকর মহামারী এসে উজাড় করে নিয়ে গেল এই ক'দিনে?

কেউ কিছু জবাব দেয় না, ঝিঁঝিরা শুধু করুণ সুরে বেহাগ বাজায়। কেন জানি জাহ্নবী দেবী থেমেছিলেন তিনি আবার স্পষ্ট করে নারীপর্ব পড়তে আরম্ভ করলেন। পরণের মনে হল এ যেন যুদ্ধান্তেরই কুরুক্ষেত্র—না, না তার চেয়েও বুঝি বা ভয়ংকর শ্মশান।

পরাণ একটু দাঁড়াল। এ তো শত পুত্রহারা মাতার শোক নয়—সহস্র সহস্র পুত্রহারা এক জননীর বিলাপ।

সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥

একেকালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবা কিরূপে হে তোমারে মুরারি ॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্র শোক তুল্য শোক নাহি তার এক ॥
গর্ভধারী হয়ে যেই করেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ ॥

পরাণ কত মাতা, পুত্র, প্রেমিক, প্রেমিকার চিরবিচ্ছেদ দেখেছে—সে শৈল্য চিকিৎসক, কিন্তু এমন রোদন শোনেনি। জাহ্নবী দেবী পড়ছেন না তো যেন কাঁদছেন। উঃ কি মর্মভেদী!

সে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ঐভাবে বলা যায় না। এবার শোনা গেল ক্রুদ্ধা এক হিংস্রা মাতার অভিশাপ।

শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মম ঘুচিবে অন্তরে ॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে খণ্ডন।
জ্ঞাতিগণ হইতে কৃষ্ণ হইবে নিধন ॥

কি ভেবে যেন পরাণ আর ওখানে দাঁড়াল না। সে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলল পূবদিকে। গরীব মনহর দেশত্যাগ করতে পারেনি, আর পারেনি বৃদ্ধা অসহায় কুন্দ ঠাকুরাণী। পরাণ তাদের গিয়ে ডেকে তুলল। জিজ্ঞাসা করার আগেই তারা বলল সব।

সে উন্মত্তের মত বেরিয়ে এলো ওদের বাড়ী ছেড়ে। চলল আবার উর্বশীর বাসার দিকে।...

তার সমস্ত গা বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

সে ঘরে ঢুকে কতখানি মদ খেল। সহজেই পরিশ্রান্ত মস্তকে ক্রিয়া হতে লাগল। যেন আকাশ পথে মেঘলোকে ঝড় উঠেছে। আলুলায়িত কুন্তলা এক নারী যেন এগিয়ে আসছে। হাতে তার ত্রিশূল। পিছনে অগণিত সর্বহারার দল। আজ তারা দুর্বল নয়। আধুনিক নানা অস্ত্রে সজ্জিত। সংগে ঐ আসছে কারা—টুপি ফেজ লুংগি পরা? ওরা তেরশ' পঞ্চাশের বলি, বলি পর পর প্রতি বছরের রোগ শোক দারিদ্র মহামারী মড়কের। একত্র হয়ে আসছে, সবাই আসছে অমিত বিক্রমে।

ও রমণী কে?

উর্বশী। আজ আর সে বেশ্যা বা অস্পৃশ্যা নয় পরাণের চোখে। যেন এক মূর্তিমতী সংকল্প।

এত সামঞ্জস্য রেখে ঠিক চিন্তা করে না পরাণ। তবু সে যেন নেশার ঘোরে দেখে : আসছে, আসছে যেন এক দেবী…।

সে ঘর ছেড়ে আবার বের হয়।

জাহ্নবীকে গিয়ে ডাকে, 'মা!'

জাহ্নবী কিছু জবাব দেওয়ার পূর্বেই সে আবার বলে যে, আসছে, আসছে মা - ওরা আসছে!

আর একদিনের কথা বলছি। ইসমাইল তার ভাঙা হাতখানা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ঝাড়ে অজস্র রসাল বন-বুখরী পেকে, টসটস করছে। কিন্তু একটি ফলও পাড়ার শক্তি নেই তার।

ইসমাইলের চোখ ভরে জল এলো।

নিজের অক্ষমতার কথা ভেবেই যে সে কাঁদল তা নয়, কাঁদল এই ভেবে যে পাড়তে পারলেও এ ফল সে দিত কাকে? চোখের জলে তার হয়ত দৃষ্টি-ভ্রম ঘটল। সে দেখল যেন একটি কনক চাঁপা ফুটে উঠল বন-বুখরীর ঝোপের কাছে। কি তার মিষ্টি গন্ধ!

পরাণ নিজের ব্যবসা ছাড়তে পারেনি। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল যে, ওরে কাঁদে না—ওরা আসছে, আসছে।…ওরা কেউ মরেনি, ওরা কখনও মরে না। ওরা আসছে।

সব ধুয়ে মুছে গেছে। তবু নাতীদের আশায়ই হয়ত নিত্য দীপ জ্বেলে বসে থাকেন জাহ্নবীঠাকুরাণী। নিত্য পরাণ তাকে শোনায় এক দুরাশার বাণী—মা আসছে! আসছে!

গ্রামের মুসলমানরা ভাবে যে পরাণ চিরদিনই অর্দ্ধ উন্মাদ—এখন না হয় তার একটা ফ্যাকড়া বেড়েছে কিন্তু সে বড় মায়াশীল—বন্ধু দীন-দরিদ্রের!

পাকিস্তানী দৈত্যরা টালাই নৌকার যাত্রীদের সংগে যে কি ব্যবহার করেছিল তা আর বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যহই তা জানা যায় খবরের কাগজের মারফতে। তারা রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে নাকি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখ থেকে পর্যন্ত ছিনিয়ে রাখে দুধের বাটি।

এখান থেকে সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বিনোদ সামন্ত বাতাসীর মা ও উর্মিলা এবং তার ছেলে দুটো কলাবাগানে আশ্রয় নিল। বাক্স ডেক্স এদের দক্ষিণা দিয়ে আসতে হলো বিনা প্রতিবাদে। বাদ বাকী যাত্রীদের কথা এরা জানে না। কারণ তখনও তারা নৌকায়—সারা জীবনের সঞ্চিত জিনিষ-পত্রের মায়া ছাড়া বড় দায়। সোনা গয়না না হক, হক গে বাঁশের ডালা কুলা।

কাশবন ভেঙে, ধূলট রাস্তা হেঁটে ওরা এসে একখানা ট্রেণ ধরল।

উর্মিলা সারা পথটা এলো যেন নেশায়। সময় মত তাকে কলকাতা পৌছতে হবে—সময় মত করতে হবে শ্রাদ্ধ। স্বামী এবং ননদদের আত্মার শান্তিই এখন তার একমাত্র কাম্য।

বিনোদ সামন্ত সকলকে নিয়ে ট্রেণ থেকে নেমে একেবারে গংগার ঘাটে গিয়ে হাজির হলো।

আজ শ্রাদ্ধের দিন।

বিনোদ বলল, 'বাতাসীর মা দেও তো কটা টাকা।'

'একি! একটি টাকাও যে নেই!' বাতাসীর মা তার কোমরে হাত দিয়ে একটা পোঁটলা বের করল। 'না, না আছে, আছে।' ঘাটের বহুলোক দেখল যে বাতাসীর মা মোড়ক খুলে এক বাণ্ডিল নোট ও কিছু সোনা বের করল।

বিনোদ ওদের বসতে বলে বাজারে গেল। কিছু সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং একজন পুরুত নিয়ে হাজির হলো।

সুমুখে উন্মুক্ত গংগা, পিছনে সরকারী রাস্তা - সহস্র প্রকার যানবাহন চলাচল করছে। এত মানুষ, এত অদ্ভুত বৈচিত্রময় যন্ত্র এবং তার নানাবিধ শব্দ ও রঙ কোনদিন বাতাসীর মা দেখেনি, কল্পনাও সে করেনি কোনকালে। সে একবার এদিক আবার ওদিক করতে লাগল। ধন্য সহর কলকাতা! ধন্য তার রঙ বে-রঙয়ের জৌলুস! কতক্ষণ ছুটোছুটি করে বাতাসীর মা শ্রান্ত হয়ে গংগার ঘাটে নেমে আঁজল ভরে জল খেল। সে দেখল যে তার স্বামী, পুরুত ঠাকুর ও উর্মিলা

ব্যস্ত। কতগুলো জিনিষের বিষয় সে আর না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না। ট্রাম চলে কি করে? ওটা তো হাওয়া গাড়ী নয় যে হাওয়ায় ঠেলে নিয়ে যাবে। মাথার ওপর দিয়ে যে উড়ো জাহাজখানা উড়ে গেল সেখানা নামবে কোথায়? থামবে গিয়ে সহরের কোন পাশে? পয়সা দিলে কি ওঠা যায় ওতে চড়ে আকাশ পথে?

সে পাণ্ডা ঠাকুরকে মহা ঠাণ্ডা দেখে তার কাছে গিয়ে হাজির হলো এক আনা পয়সা নিয়ে। সারা দেহে হরিনামের ছাপ লাগিয়ে নেবে, সংগে সংগে করবে প্রশ্ন। তার এক সংগে ইহকাল ও পরকালের কাজ দু-ই হবে। বাতাসীর মা স্নান করে এলো।

পাণ্ডা ঠাকুরকে যা যা প্রশ্ন বাতাসীর মা করছে তার উত্তর দিচ্ছে এক বাঙালী বাবু, হিন্দুস্থানী হওয়াও আশ্চর্য নয়। লোকটা ধীরে ধীরে জেনে নিল বাতাসীর মা এবং তার সংগীদের দুরবস্থার কথা।

লোকটা এগিয়ে বসল বাতাসীর মার কাছে। সে প্রস্তাব করল যে তার নিজস্ব হাওয়া গাড়ী প্রস্তুত। যদি বাতাসীর মা ইচ্ছা করে একটু চড়ে ঘুরে দেখতে পারে এই সহর, যতক্ষণ শ্রাদ্ধ সাংগ না হয়।

বাতাসীর মা ইতিমধ্যেই রাঙা হয়ে উঠেছিল—দোমন-দোয়াশায় অধীর হলো তার মন। ডাক দিল বিনোদ—নইলে হয়ত হাওয়ার গাড়ীতে চড়ে হাওয়া হয়েই উড়ে যেত বৃদ্ধ বিনোদের নবযৌবনা বাতাসীর মা।

'তুমি এখানে বস।' ধীরে ধীরে বলল বিনোদ—'পুরুতটার চোখের দিকে একটু দৃষ্টি রেখ, ও মন্ত্রের চেয়েও মুখের দিকে নজর দিচ্ছে বেশী।'

বাতাসীর মা একটা কটাক্ষ করল। 'তোমার যেমন কথা!' সে বিশ্বাস করল না বিনোদের উক্তি।

'তবে আর আমার এখন স্নান করা হলো না।'

শ্রাদ্ধ শান্তির পর ঘাটে বসেই যখন কিছু আহার করে ওরা উঠল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। একি অকস্মাৎ যেন চারদিকে তারা খসে পড়ল—জলে স্থলে বাতি জ্বলল লক্ষ লক্ষ। বাতাসীর মা একেবারে আত্মহারা হওয়ার জোগাড়। উর্মিলার ছেলে দুটি গম্ভীর, কিন্তু বাতাসীর মা অস্থির। উর্মিলার মনের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে তার পায় ধরে হাজারটা প্রশ্ন করল। 'দিদি এসব কি? সত্যিই আজব সহর এই কলকাতা···ওটা কেন এলো হুশ হুশ করে এদিক?'

কিছু সময় বাদে বিনোদ বলল, 'আজ রাতটা কোথায় কাটান যায় ?'

বাতাসী অমনি জবাব দিল, 'কেন এইখানে ? দিব্যি তো রইলাম এতক্ষণ।'

'শিশির পড়তে আরম্ভ করুক, তখন বুঝবে।'

বাতাসীর মার বোঝবার মত এবং কাবু হওয়ার মত বয়স হয়নি। সে বলল, 'কেন একটা রাত ঘুমাব না।'

'কালই বা কোন রাজপ্রাসাদে গিয়ে উঠবে ?'

'কটা দিন এখানেই কাটাই না। গংগা তীরে তো হাজার সাধনা করেও মানুষ আসতে পারে না।'

এখন আর উপায় নেই দেখে একটা রাত এখানে কাটানই সাব্যস্ত হলো।

কিন্তু একেবারে আকাশের নীচে থাকা কি সম্ভব ?

কেওড়াতলা শ্মশানের কাছেই আদি গংগার একখানা ঘাট। তারই এক পাশে কোন এক রাজার যেন শ্মশানমন্দির। নিত্য বিগ্রহ পূজা হয়। সুমুখে স্নানার্থীদের বিশ্রামের জন্য দরদালান। নিকটেই বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান।

রাত্রির বিশ্রামের জন্য বিনোদ সামন্ত, বাতাসীর মা ও উর্মিলা ছেলে দুটিকে নিয়ে দরদালানে আশ্রয় নিল।

বাগানে কি যেন দু একটা ফুল ফুটেছে—গন্ধ তার নৈশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সংগে সংগে নাকে এসে প্রবেশ করছে শ্মশানের দুর্গন্ধ।

উর্মিলা ঘুমাতে পারছে না। একটু তন্দ্রা এসেছিল চোখে তা হঠাৎ ভেঙে গেল। কলকাতা পা দিয়েই সে অনুমান করে নিয়েছিল এখানের সংখ্যা লঘিষ্ঠদের অবস্থা। মুসলমান রিক্সাওয়ালা নেই, কোনও ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা ফিটন ছিল না শিয়ালদা ইষ্টিসনে। ওরা কি জীবিত আছে ? যদি বেঁচে থাকে তবে মরমে মরেই রয়েছে। রুজি রোজগার বৃত্তি যদি বন্ধ হয় গরীবের, তা হলে সে বাঁচায় লাভ কি ? মৃত্যু আসছে ধীরে ধীরে, কিন্তু তারা নাকি সরকারী নিরাপত্তার পূর্ণ অনুগ্রহ পাচ্ছে! তবু মৃত্যু আসছে—পলে পলে, তিলে তিলে, কালো কফিন পরে।

বড় আশা করেছিল জনসাধারণ স্বাধীনতার সৌরভে ভরে যাবে চতুর্দিক, এলো উগ্র গন্ধ শ্মশানের—মুহুর্মুহু হরিধ্বনি।

ফুলের প্রকাণ্ড বাগানটা উর্মিলার কাছে ঠেকল যেন গোরস্থান। তার পাশেই ঐ তো আবার শ্মশান। সারি সারি শবাধার এসেছে। এ স্বাভাবিক

মৃত্যু নয়, নিতান্তই অপমৃত্যু। কাঁদছে হিন্দু, কাঁদছে মুসলমান। ওরা জান দিয়ে লড়েছে—কিন্তু পরিণামে ভাইকেই শুধু হত্যা করেছে।

এখন সব যেন বুঝতে পেরেছে, ওরা তাই যেন গুমরে গুমরে উঠছে। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল উর্মিলার। সে আর চোখের পাতা বুজতে পারল না।

ভোর বেলা দেখা গেল যে একদল লোক চলেছে বিছানা বাক্স পোঁটালা-পুঁটলি মাথায় করে। বিনোদ সামন্ত ছুটে গিয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা করে ফিরে এলো। 'চলো, চলো, তাড়াতাড়ি চলো—ওরা আমাদেরই মত, রিলিফ ক্যাম্পে যাচ্ছে।'

বাতাসীর মার বড় দুঃখ হলো। আজ না গেলেই কি চলত না!

হাঁটতে হাঁটতে যখন দুপুর হল ওরা তখন কাঁচা রাস্তায় এসে পড়েছে। সহর রইল বহু দূরে পিছনে পড়ে। বিনোদ সামন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এক গাছ তলায় বসে পড়ল। উর্মিলার নাভী-শ্বাস হওয়ার জোগাড়। তার কোলে একটি ছেলে, হাত ধরে যাচ্ছে আর একটি। ওদের দেখাদেখি আরও জনকতক বসে পড়ল, ক্রমে ক্রমে সকলে।

সংগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে দুজন লোক। তারা কংগ্রেস ভলান্টিয়ার না কোন সরকারী কর্মচারী তা কেউ জানে না। এখানে বসে সকলের সংগে এবার একটু সুযোগ হলো সকলের পরিচয় করতে। নানা জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এরা। ইস্কুলের শিক্ষক, পাঠশালার পণ্ডিত, গাইয়ে আছে দুচার জন - তবে বেশীর ভাগই নমশূদ্র কৃষক।

'উঠুন, উঠুন! আমি বিশ্রাম করবেন স্থান মত গিয়ে।'

বসতে না বসতেই এই কথা! প্রমাদ গণে উর্মিলা। তার শরীর আর চলে না।

'দেরী করলে ঘর ভর্তি হয়ে যেতে পারে - আপনাদের মত লোক আছে কত।'

একজন বলল, 'একটু মিষ্টিমুখে বলুন, দেখছেন তো আমাদের অবস্থা।'

'আপনাদের ভালর জন্যই বলছি—তা তো তেতো লাগারই কথা। কলিকাল কি-না! খালি ক্যাম্পের কথা শুনলে দলকে দল লোক যে কোথা থেকে হাজির হয় এসে।' ভলান্টিয়ারটি বলল। 'আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে এতখানি পথ হেঁটে। আমরা আপনাদের চাকর নই, বুঝলেন।'

উর্মিলার পা ও শরীর এমন প্রতিবাদ জানাল যে হাজার বছর নিরাশ্রয়-

ভাবে গাছতলায় কাটালেও সে পারবে না প্রতিযোগিতা করে আশ্রয় নিতে। অনভ্যস্থা কুলবধূ আর কত সইবে!

একটু সময় পরে সকলেই উঠল, যারা পিপাসার্ত তারা পর্যন্ত জলের কথা বলতে সাহস পেল না। শুধু উর্মিলা ও তার ছেলে দুটি সকলের অলক্ষ্যে পিছনে পড়ে রইল। পথের কথা জিজ্ঞাসা করে জেনে রেখেছে, যাবে ধীরে ধীরে।

আকাশে দ্বিপ্রহরের সূর্য, নিকটে দু' একটা ছাড়া বড় গাছ নেই—শস্যহীন মাঠগুলি ফুটি-ফাটা। নদীর স্নিগ্ধ পরিবেশ নেই দশ বিশ ক্রোশের মধ্যেও—চলন্ত মানুষগুলোর ক্লান্ত পাদক্ষেপ ধূলির মেঘ সৃষ্টি করেছে।

দূর থেকে উর্মিলার কেন জানি মনে হলো ওরা তো মানুষ নয়, যেন এক পাল পশু চলেছে, পথের ধূলায় আচ্ছন্ন হয়েছে ওদের সর্ব শরীর। ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর ওরা, তাই চলতে পারছে না ঠিক। মাঝে মাঝে খাচ্ছে তাড়া।

'চল, চল জোর কদমে চল—আমিরী ক'রো ক্যাম্পে গিয়ে।'

কোন দেশে জারের না কার আমলে যেন রাজনৈতিক বন্দীদের এমনি ভাবে নিয়ে যেত দেশের বাইরে তাড়া করে। সেখানে সৈনিক প্রহরীরা সংগিনের খোঁচা মারত বন্দীদের, এখানে এরা মারছে কথার খোঁচা, এই যা তফাৎ। উর্মিলা তার দাদার কথার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ দেখল যেন বাঙলায়।

উর্মিলা ঠিকানা জেনে রাখলেও বেশী সময় পথে বসে বিশ্রাম করতে সাহস পেল না। সে হাঁটতে সুরু করল ত্রাসে। পথে আরও কটি পরিবারের সংগে দেখা—তারাও বড় শ্রান্ত। এই ছোট দলটি প্রায় পূর্বেরটির সংগে সংগেই এসে পৌঁছল। কিন্তু নির্দিষ্ট ক্যাম্প ভর্তি হয়ে গেছে এই মিনিট পাঁচেক আগে। বিনোদ সামন্ত এতক্ষণ চিন্তিত হয়েছিল, উর্মিলাকে আসতে দেখে আশ্বস্ত হলো।

সেই ভলান্টিয়ারটি বলল, 'কেমন, গরীবের কথা তখন বড্ড তেতো লেগেছিল, এখন থাকুন গাছ তলায়।'

'আমরা তো দেরী করি নাই।' একজন জবাব দিল।

'তবে ভর্তি হলো কি করে?'

'পাঁচ মিনিটের অফরাদের এই সাজা? কয়দিন থাকতে হইবে গাছতলা?'

'যয় দিন না আবার ঘর পাওয়া যায়!' তারপর সে মনে মনে বলল, যত সব 'গেঁয়ো অজ কোথাকার।'

দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবকটি বলে, 'রমেন, এসেছ দেশের কাজ করতে কিন্তু মেজাজ

যে বড় সাহেবের মত তিরিক্ষি। এতক্ষণ শুনলাম, এবার আর না বলে পারলাম না—দোষ কি পাঁচ মিনিট দেরীর? আর এঁদের তো তুমি পাঁচ মিনিটও বিশ্রাম করতে দাওনি।'

'তবে দোষ কার?'

'ওপরওয়ালাদের ব্যবস্থার।'

'তুমিই দেখছি সাচ্চা দেশসেবক—নিজের ঘরের কথা নিজেই ফাঁস করছ।'

'নিজেরাও যদি সমালোচনা না করি তবে শোধরাবে কি করে?'

'ধীরে ধীরে – কিবা বয়স তোমার স্বাধীনতার!'

'যতদিনে বিবি বড় হবে, ততদিনে যে বাদশা গোরে যাবে। তুমি কি কিছু ভেবে চিন্তে বল না?'

'যাক!' ক্রুদ্ধ রমেন স্থির করল যে সদর আফিসে গিয়েই ওর নামে একটা রিপোর্ট করবে যে ভূপাল দেশের অযোগ্য সেবক। শরনার্থীদের উস্কাচ্ছে। সে আর না দাঁড়িয়ে হন হন করে হেঁটে চলল। ভূপাল বেটা কংগ্রেসের টুপি পরে নিশ্চয় কমিউনিজম ছড়াচ্ছে।

চতুর্দিকে খোলা মাঠ। মাঝে মাঝে গভীর জংগল। কত কালের ছাড়া জায়গা কে জানে। যুদ্ধের দৌলতে এই ছাড়া মাঠে উঠেছে কয়েকখানা ব্যারাক। টিউবওয়েল ভাঙা। নিকটে জলাশয় নেই কোথাও। স্ত্রী পুরুষের পাইখানা জংগলে। ঘাস দাম ও কচুরি পানা পচা বিলের মতও বুঝি আছে খানিকটা। সেইজন্য দুর্গন্ধ আসছে।

একটু অন্ধকার হতেই ছেলে মেয়েগুলো চেঁচিয়ে উঠল।

ক্ষুধায়?

না, না—মশার তাড়ায়, সুতীক্ষ্ণ হুলের জ্বালায়।

উর্মিলা যতটা সম্ভব তার আঁচল দিয়ে ভীরু ছেলে দুটোকে জড়িয়ে রাখল। এখন ওদের রক্ষা করাই ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ওরা যে আজ খায়নি! প্রথমে যেটার প্রয়োজন সেইটাই তো পেল না—আশ্রয়। আহার্য পাবে কি করে?

উর্মিলা মহা স্নেহে ও দরদে ওদের বুকের তলে চেপে বসে রইল। যা কিছু কামড় জ্বালা ওর পিঠের ওপর দিয়েই থাক। আহার্য সংগ্রহ করে দিতে পারেনি কিন্তু ওর যা সাধ্যায়াত্ব তা তো ও না করে থাকতে পারে না। যতক্ষণ উর্মিলার

দেহে এতটুকুও বল আছে, মনে এতটুকুও সংজ্ঞা আছে, ততক্ষণ ওরা থাকবে ওর সমস্ত অনুভূতি জুড়ে। পিতৃহীন অভিভাবকহীন সন্তানের মা হওয়া যে কত বড় দায়—একমাত্র বাঙলা দেশের নিরালম্ব উর্মিলার মত বিধবাই তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে!

ভূপাল এদের সংগ ত্যাগ করতে পারল না। সেই বলল যে সকলেরই কষ্ট এবং পরিশ্রম যথেষ্ট হয়েছে—কিন্তু সুফল ফলে নি কিছু। আর একটু হাটতে পারলে সে একটা চমৎকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। নিকটেই একখানা খালি বাগান-বাড়ী রয়েছে যেন কোন বড় লোকের।

কথাটা শুনে সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'জল আছে তো?' পিপাসার্ত মানুষগুলোর চোখ যেন ঠিকরে বাইরে আসার জোগাড় হয়েছে। উঃ। কতখানি তারা হেঁটেছে!

'দিব্যি সরোবরের মত পুকুর। টলমল করছে কাক-চক্ষু জল। রাজ বাড়ীর মত একটা বাড়ী প্রায় বার মাসই থাকে শূণ্য পড়ে। আপনারা কোন বাধা নিষেধ না শুনে ঢুকে পড়বেন। পরে যা হক একটা ব্যবস্থা হবেই। সরকার বড়-ওয়ালাদের ঢিট্ করবার সুযোগ খুঁজছে—সহানুভূতি চাচ্ছে জন সাধারণের।'

বাগানবাড়ী বেশী দূর নয়। সেখানে একজন দারোয়ান এবং একটি মাত্র মালী আছে। সকলে এসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। ঢুকে পড়েই আগে জলে নেমে গরুর পালের মত চোঁ চোঁ করে জল খেল।

'কোন লোকের কথার ভয়তে আপনারা দখল ছাড়বেন না। সরকার রিকুইজিসন করে, আপনাদের ন্যায্য ভাড়ায় কোঠাগুলো বণ্টন করে দেবে! এখনকার মন্ত্রী মশায়দের আসল প্রাণের কথাই এই। নমস্কার চললাম আমি।

সকলেই ভাবল, হ্যাঁ, এ না হলে আর তাদের হিন্দুস্থান! এই তো রাম রাজ্যের পূর্বাভাস।

থাক, না-খাক বাস্তুহারারা বহুদিন বাদে নাক ডাকিয়ে ঘুমাল।

সুধীর পণ্ডিত বলে, 'এখানে বসে ইচ্ছা করলে কানাই তোমার মেয়ের বিয়েও দিতে পারবে। কি সুন্দর বাড়ী, কেমন সব চওড়া ঘর। আসবাবেরও কি অভাব।'

কানাই জবাব দেয়, 'মাইয়া তো আমার নাই। আছেন যিনি তিনি রাড়ী হইবেন তবু আর এ বয়সে বিয়া বইবেন না।'

আর একজন বলে, 'বইবেন, বইবেন—আগে বসন্ত কালডা আইতে ছাও।'

হো হো করে হাসে সকলে।

'যাক্, ও সব কথায় এখন প্রয়োজন নেই। রিলিফের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তো সকলে কিনে খাবে—সেই চেষ্টা দেখ। আর কে কি করতে চাও?' সুধীর পণ্ডিত বলে, 'সরকারের আর পরিকল্পনার অভাব নেই। তোমরা তো সে সব স্থানে যাওনি, একেবারে ছবি এঁকে সব জলের মত বুঝিয়ে রেখেছে। চোখ ফিরান যায় না একবার তাকালে।'

'আমরা আর কিছু চাই না; চাই চাষার ছাওয়াল চাষ করতে।'

'এই শক্ত বন্ধ্যা মাটি···'

'একেবারে সূক্ষ্ম কইরা ধান ফলামু। পণ্ডিত, আমরা বাঙাল—শত্‌কে একটি বন্ধ্যা নারীও কি দেখছ আমাগো ছ্যাশে?'

'বসুন্ধরা জননীরে এই কথা কও পাঁঠা?' একজন চটে ওঠে।

'না মূখ্যো, না—বসুন্ধরা মায়ের পায় শত কোটি প্রণাম—কই আমাগো তেজ বীর্য্যের কথা।'

'তুমি কি করবে অমূল্য?' পণ্ডিত আর একজনকে প্রশ্ন করে।

'যামু হালে-লাঙলে কামারশালে, যেখানে দেয় আমারে। পেটে-ভাতে খাটতে রাজী যদি বৌ পোলাডি কেও ছ্যাখে। আইছি যখন সব ছাইড়া, এখানে আবার গইড়া তুলুম সোনার সিংহাসন।'

সকলের আশার নায়ের সংগে ধীরে ধীরে কোন রকমে এগিয়ে চলে উর্মিলারও মনের ভাঙা বানচাল হওয়া নাও। ওরা নানা দফা ভাগ হয়ে নানা কাজে যায়। রিলিফের ব্যবস্থা করতে হবে, হাট-বাজারও আছে, কাজ-কর্মের চেষ্টায়ও নামতে হবে কতক লোককে। এমন লোকও অনেক এসেছে যাদের পুঁজি

একেবারেই শূন্য। তাদের সংখ্যাই বেশী, তাই রিলিফ ও রেশনের কথাই ওঠে বারম্বার।

বুড়ো সামন্তও এই দলের সংগে উর্মিলার পিছু পিছু এসেছিল।

বাতাসীর মা একটু বোকা কিম্বা আহ্লাদে প্রকৃতির মেয়ে মানুষ হলেও তার নগদ পয়সার অভাব নেই। চটপট করে সব সংগ্রহ করল। তাড়াতাড়ি খেয়ে বুড়ো বিনোদকে গুঁতিয়ে নিয়ে বের হলো। অবশ্য স্বামী স্ত্রীতে আহার করার পূর্বে বাতাসীর মা উর্মিলা ও তার ছেলে দুটিকে আগে ভাগে খেয়ে নিতে বলেছিল। গতরাত্রে বাতাসীর মা পায়ের ব্যথায় তেল মালিস করেছে, তবু তার সখ কমে নি।

উর্মিলার কাছে প্রস্তাব করল, 'যাবে নাকি দিদি?'

জবাবটা যে কি উর্মিলা দেবে তা বুঝতে পেরেও নিজেকে দমন করে রাখতে পারেনি বাতাসীর মা।

ওর দোষ ত্রুটি অনেকই ছিল, তবু ও যে সরলা কর্ত্তব্যপরায়ণা তাই এর মধ্যেই মায়া জন্মে ছিল উর্মিলার। সে যাওয়ার সময় বলে দিল, 'একটু সাবধান মত চলো ফিরো, আর বেশী রাত করো না কিন্তু—আমার সম্ভব নয় কোথায়ও যাওয়া।'

'সে আমায় বলতে হবে না দিদি।' হাসির চোটে বাতাসীর মার গালের টোলটি জেগে উঠল। কত আনন্দ, যাবে সহর দেখতে।

পরেরদিন বাতাসীর মার চাইতেও বেশী গরজ দেখা গেল বুড়ো বিনোদের। ব্যাপার কি? উর্মিলারও একটু কৌতুহল হলো। সে জিজ্ঞাসা করবে করবে ভেবেও চুপ করে রইল।

এমনি পর পর দুদিন ওর যায়—স্বামী স্ত্রীতে ঘন হয়ে বসে, কেবল পরামর্শ করে।

একদিন সামন্ত বলল, 'একখান' বাড়ী কিনেছি কালীঘাট।'

'কত টাকা?'

'সে একেবারে জলের দর।'

'কে জোগাড় করে দিল?'

'কেউকে বলো না মা'—কাছে এসে সামন্ত বলল, 'বাতাসীর বাবু।'

'বাতাসীর মা জবাব দিল 'না দিদি, ওই বুড়োর এক বাপ।'

এই লোকটা সেই ঘাটের পরিচিত বাবু, যে বাতাসীর মাকে হাওয়া গাড়ীতে চড়াতে চেয়েছিল।

'এসব লোক কিন্তু প্রায়ই গুণ্ডাষণ্ডা হয়।' উর্মিলা বলল, 'সাবধান।'

'বায়নাপত্র যে হয়ে গিয়েছে!'

'শুধু বায়না নয় দিদি, সব দামটাই আগাম দিয়ে দিয়েছেন। আমার সোনা-গয়না টুকুও বেচে কাবার। এখন সস্তার তিন অবস্থা ভোগ কর—আমি বেরিয়ে যাব একদিকে।'

'সন্ধ্যা পর্যন্ত আজ অপেক্ষা করেই দেখ না। দলিল নিয়ে তো আসবে। তুমি তো দেখেছ, অত বড় যার বাড়ী, অমন একখানা যার গাড়ী, সে কি টুনটুনি পাখীকে ঠকাতে পারে?' জোর করে মনে বিশ্বাস পুষে রাখতে চায় সামন্ত।

বাতাসীর মা জবাব দেয়, 'দলিল যদি নিয়ে আসে তবে শাঁখ বাজাব, নইলে বুঝলেই তো বেরিয়ে যাব।'

বিনোদ মনের অশান্তিতে বলল, 'যেও।'

কথটা ছড়িয়ে পড়ল ক্যাম্পে। সকলেই বিনোদকে বলল, 'মূর্খ।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন দলিল এলো না, তখন বিনোদ ভাবল, কাল ভোর বেলাই যাবে সন্ধানে। হয়ত অসুখ-বিসুখ করতে পারে বাবুর, কাগজ পত্রের মারপ্যাচের জন্য একটা দিন দেরী হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

বাতাসীর মাও সংগে গেল। টাকার মায়া তারও ছিল। বিশেষ করে গয়না বেচা টাকার—স্ত্রীধন তো। যুবতীর যৌবনের চাইতে একটুও কম মমতার নয় নিশ্চয়।

বাবু নিত্যকার মত যত্ন করল।

দলিলের মুসাবিদাও দেখাল একটা। আজ অফিস বন্ধ, কাল রেজিস্ট্রী হবে। চিন্তার কোন হেতু নেই। বাবু চা খাওয়াল, সিগারেট নিয়ে যাচাই করল—হেসে লজ্জায় মুখ ফিরাল বাতাসীর মা।

বিনোদ ভাবল—মিছামিছি উৎকণ্ঠিত হচ্ছে ক্যাম্পের লোকগুলো। তার বিষয় আর যাতে ওরা উচ্চ-বাচ্য না করে, ঈর্ষায় নাক না গলায় ওর নিজস্ব বৈষয়িক লাভালাভে, তা ওদের ভাল করে সমঝে দেবে সামান্ত। 'কি বলো বাতাসীর মা?'

'হ্যাঁ।' সে পরখ করে দেখছিল বাবুর চেয়ার খানা। যার চেয়ারখানা এত

নরম, তখন তার বিছানাখানা না জানি আরও কত নরম এবং গরম। কথাটা ভেবে সে মনে মনে একটু লজ্জা ও ধিক্কার বোধ করল।

বিনোদ এবং বাতাসীর মার স্নানহারের ব্যবস্থা ওখানেই হলো।

'কে বলে কলকাতার লোকের দরদ নেই বাতাসীর মা—এরপরও কি নিজের চোখ কানকে অবিশ্বাস করতে হবে?'

ঠিক সেই সময় কতকগুলো অল্প বয়সী স্ত্রীলোক হৈচৈ করতে করতে এই বাড়ীতে এসে ঢুকল। বাবু যেন তাদের কি ইংগিত করল পিছন ফিরে। তারা চলে গেল। তাহাদের ব্যবহারটা খুব পছন্দসই হলো না বাতাসীর মা ও বিনোদের কাছে।

'যাক গে, বাবু তো ভাল। ওদের সংগে আমাদের কি সম্পর্ক?'

খাওয়া দাওয়ার পর স্থির হলো আজ একটা নূতন জিনিষ বাবু সামন্তকে দেখাবে। বাড়ী হলো, গাড়ী একখানা ছোটখাট করেই দিতে হবে বাকী বকেয়া কিস্তিবন্দীতে, কিন্তু আজ নগদ দেখাবে সিনেমা।

বিনোদ সামন্ত খুশির চোটে প্রথমটা খুবই না-না করল, বলল, 'আপনি একাই যান বাতাসীর মাকে নিয়ে, আমি বুড়ো মানুষ যেয়ে কি করব?'

বাতাসীর মা একটা ঠেলা দিল।

অগত্যা সামন্ত সন্ধ্যার পর সিনেমায় ঢুকে চুপ করে বসে রইল। সে রাতকানা।

হট্টগোলের মধ্যে যখন সিনেমা ভাঙল, আলো জ্বলল, তখন এত আলোর ভিতরেও সামন্ত অন্ধ হয়ে রইল।

বাতাসীর মা কই?

সিনেমা হল খালি হওয়া পর্যন্ত বিনোদ অপেক্ষা করে রইল, তারপর রাস্তায় বের হলো। চীৎকার করতে লাগল, 'ও বাতাসীর মা, ঐ।'

'কি হয়েছে মশাই কি হয়েছে?' ভীড় জমে গেল, ট্রাফিক বন্ধ হওয়ার উপক্রম। একজন পুলিশ এগিয়ে এলো। সামন্তকে তুলল একখানা পুলিশভ্যানে, নিয়ে যাবে থানায়। পুলিশটি আগাগোড়া সব শুনেছে।

সামন্ত নামতে চাইল, ধমক খেল। বাড়ী হলো না, গাড়ী চড়ে সে করবে কি? প্রলোভনের চোটে আবার খোয়া গেল তার বৃদ্ধ বয়সের নারী! সে মর্মভেদী স্বরে ডাকত লাগল, 'বাতাসীর মা, বাতাসীর মা ঐ।'

হৈ হৈ করে উঠল রাস্তার চ্যাংড়া অসভ্যরা।

পুলিশভ্যানে ষ্টার্ট দিল ড্রাইভার।

কয়েকদিন বাদে রক্তশূন্য পাণ্ডুর অবস্থায় সর্বস্বান্ত হয়ে বাতাসীর মা ফিরে এলো। সামন্ত ফিরে এসেছে অনেক আগেই। সহজ গ্রাম্য সারল্যই এদের কাল হলো।

বাস্তহারারা এ দুঃখও ভুলে যায়। বাধ্য হয়েই তারা এর চাইতে অনেক গভীর ক্ষতর কথা যখন ভুলতে পেরেছে, তখন এ আর একটা বেশী কি ?

কৃষক সম্প্রদায় বসে থাকতে পারে না। তারা পরের বাড়ী হলেও ফসল ফলাবে। কত জায়গা অকর্ষিত পড়ে রয়েছে বাগান বাড়ীর চতুর্দিকে। জলের অভাব নেই। তারা সংগের কাস্তে কাটারী বের করে। এখন এখানে আছে, হয়ত কিছুদিন থাকবেও—আর যদি না ও থাকে, অন্য কোথাও যেতে হয় ভাগ্য বিপর্যয়ে, তবু চির পরিশ্রমী লোক ওরা ফসল বুনে রেখে যাবে আনাগতের জন্য। কেউ না কেউ নিশ্চয় আসবে—তারা তো তৃপ্ত হবে ফল ও গাছ-গাছালি দেখে। ওরা বসন্তের প্রারম্ভে বর্ষাতি ফলের বীজ বুনবে, চারা পুতবে ওল বেগুনের। ওরা বেগার দেবে তবু বসে বসে খাবে না।

লাঙল জোয়াল নেই। তবু কোদালের সাহায্যেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় ভাগে ভাগে—কচু কুমড়া কলার। টানা টানির হাত হলেও অল্প অল্প করে আজ এটা কাল ওটা কিনে আনে নানা প্রকার বীজ ও চারা। মনে পড়ে শস্য শ্যামল দেশী উর্বর মৃত্তিকার কথা, মনে পড়ে মৃত্তিকার দাক্ষিণ্য—ওরা খাটে মিলে মিশে মনের আনন্দে।

কারুর কারুর বিগত দিনের বাড়ী ঘরের কথা যখন স্মরণপথে ঠেলে ওঠে তখন তারা তা চাপা দেয়, খাটে আরও জোর করে, ঘাম ছুটিয়ে। মত্ত থাকে পরিশ্রমের নেশায়।

অমূল্যারা কয়েক জন একত্র হয়ে অপেক্ষা করে। অবশ্য কৃষি কাজ যে তারা না করে তা নয়। অপেক্ষা করে, কবে ডাক আসবে তাদের কামার শালায় নাম লেখাবার। সদাশয় সরকার নাকি ওদের কথা চিন্তা করছে।

কিছু দিনর জন্য ফ্রী রেশনের একটা বন্দোবস্ত হয়েছে। হাতের টাকা পয়সা তার জন্যই ফুরিয়েও ফুরায় নি। ওরা এর মধ্যে স্বাবলম্বী হতে চায়। নিজের

আয়ে নিজের পোষ্য পালন করার মধ্যে যেমন গর্ব তেমনি গৌরব নিহিত রয়েছে, এ কথাটা কেউ ভুলে যায় না।

ইস্কুল মাষ্টার এবং পণ্ডিতেরা ভাবছে, এদেশের লোক না পড়ুক, যারা দেশ ছেড়ে এসেছে, তাদের ছেলে মেয়েরা অন্তত পড়বে। একটু গুছিয়ে নেওয়ায় যা দেরী। তা হক—এরা সবুর করবে।

খুব শক্ত করে ধরে রাখলেও হাতের সামান্য পুঁজি নানা অজুহাতে ব্যয় হয়। এ সহরগুলী পোড়া রাজ্য, পয়সা ছাড়া কিছু মিলান অসম্ভব।

কোথায় তাদের দেশের সেই বাড়ীর কোলে গৃহস্থের পানের বর, মাগনা সুপারি, অজস্র ডাব? কে খায় ঢেঁকির শাক, চালতা ডুমুর। কোথায়ই বা সেই গাঙের টাটকা ইলিশ? পুকুরের স্বচ্ছ জলে বাটা মাছের ঘন মিছিল?

তবু দিন যায়। সপ্তাহ কাটে। মাসও ছুটো গত হয়। যে দেশে থাকতে হবে সেই দেশেরই শ্রীবৃদ্ধির কথা ভাবে। এইখানেই গড়তে হবে নূতন করে রত্ন-সিংহাসন।

একদিন ওরা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে যে চারদিকে পুলিশ। কারণটা যে কি তা ওরা ঠাহর করতে পারে না।

ওরা কয়েকজন ঘটি হাতে বেরিয়েছিল, কে একজন যেন হুকুম করল, 'গুলি চালাও।' ইনি বিলাসী ধনী বাড়ীওয়ালার খাসমুন্সী। 'ক'দিন ধরে বাবু বাগানবাড়ী আসতে পারেন না—এমনিতেই তাঁর ইনসম্নিয়া, তার ওপর এই অত্যাচার। তিন তিনটা বাইজীর বায়না ফিরল লক্ষৌ দিল্লী আগরতলার।'

পুলিশের মধ্যে একজন জবাব দিল, 'আপনার খেয়াল খুশি মত কি পশ্চিম বাংলার পুলিশ চলবে? এ পাকিস্তানী ফৌজ নয়।'

পুলিশেরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগল। 'অনিদ্রার রোগী রাত কাটাবে নাচ দেখে—ব্যবস্থা যে-কবিরাজের তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ডাক্তার উপাধিটা ডেকে দেওয়া।'

অন্য একজন বলে, 'শুধু চিকিৎসককে নয়, পয়সাওয়ালা রোগীকেও দেওয়া উচিত। পয়সা ছিল বলে এবং তার কালচার করছে বলেই তো এ রোগের স্বত্বাধিকারী হয়েছে। হায়রে কি রোগ, যার একমাত্র ওসুধ হলো নাচ!'

বাস্তুহারার দল ভয় এবং আশংকায় বাড়ীর ভিতর ঢুকেছিল। কিছুক্ষণ বাদে তারা নানা তাগিদে বেরিয়ে এলো। দৈহিক, বৈষয়িক তাগিদের কি অন্ত আছে?

কেউকে একেবারে বাড়ী ছেড়ে বের হতে দেওয়া হবে না। যদি বণ্ড লিখে দিয়ে কেউ তল্পিতল্পা নিয়ে বের হয়, তবে তাকেই শুধু বাইরে যেতে দেওয়া হবে—নইলে থাকতে হবে বাড়ীর ভিতর আটক।

'আমরা যাব কোথায় ?'

সুমুখের উন্মুক্ত অফুরন্ত ধুলোট পথটা দেখিয়ে দেয় পুলিশেরা।

ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে বাড়ীর ভিতর আবার প্রবেশ করে।

'গুলি করুন মশাই গুলি করুন।'

'এসব কথা বলতে বা নির্দেশ দিতে আপনি কে ? থামুন। আমাদের ওপর যাঁরা তাঁরা আর পাবলিকের বুদ্ধিতে চলবেন না। হাজার হলেও এটা হিন্দুস্থান, ব্রেণ-এর রাজত্ব—বাহু বলের নয়।'

'তবে কি রাজা সাহেব আজও ইনসমনিয়ায় কষ্ট পাবেন ?'

'আমরা কি করব ? আমরা হুকুমের গোলাম হুকুম মত কাজ করে যাব।'

এক সংগে এক বাড়ীতে এতগুলো পরিবার—এদের প্রয়োজন আছে বহু রকম। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ যুবা—জল জ্বালানী পানীয় চাকরী বাকরীর চেষ্টা, এক একজনের প্রয়োজন এক একটা। কত সময় আর অবরুদ্ধ থাকা যায়।

তবু সমস্ত প্রয়োজন তুচ্ছ করে তারা দখল করে রইল সম্পূর্ণ একটা দিন।

রাত্রি গভীর হলো······

উর্মিলার ছেলে দুটো শুধু পিঠালী খেয়ে ঘুমিয়েছে। বয়স্কদের অনেকেরই আহার্য জোটেনি। চাল থাকলেও জল জ্বালানীর অভাবে রান্না হয়নি।

শেষ রাত্রে সবাই একটু ঘুমিয়েছে। আগামী কাল কি করে কাটবে সেই আলোচনায়ই এতক্ষণ ধরে হয়েছে। কেউ যদি একবার এক ফন্দীতে বের হতে পারত তবে কলকাতার রিলিফ অফিসে গিয়ে খবরটা জানাত। ওদের ধারণা নিশ্চয় একটা কিছু ব্যবস্থা হতো এ বড়লোকী জুলুমের। ভূপাল কি ওদের একটা মিথ্যা ভাঁওতা দিয়ে গেছে ? অনেক সময় নীচের কর্ম্মচারীরা যা করে, তা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারেন না হৃদয়বান জনসেবক মন্ত্রীরা। জানে ওরা অনেক কিছু, কিন্তু কেমন করে যাবে বাইরে ?

উর্মিলা ভাবে, এরা মমু সরিফের আর একটা সংস্করণ নয় তো ? রেখেছে অবরোধ করে, দেবে না তো আগুন ধরিয়ে ? তন্দ্রার মত একটা জড়তা কাটতেই সে চতুর্দিকে লক্ষ্য করে একটু সুস্থ হয়। হঠাৎ তার হৃদ্‌স্পন্দন অত্যন্ত বেড়েছে।

এ আর যাই হক হিন্দুস্থান! এখানে প্রাণ মান অত খেলো নয়!

আর ও একটা দিন কাটল—গত হলো আট চল্লিশ ঘণ্টা। ওরা যুদ্ধ করল মন বলে।

তারপর আর পারল না। দল বেঁধে এসে আত্মসমর্পণ করল—চাইল বহিরাগমনের পথ। দেবে সেই বণ্ডই লিখে। আর সইতে পারে না ছেলেমেয়ের কান্না।

ডিউটি বদলে গেছে। বাঙালীর পর এসেছে হিন্দুস্থানী পুলিশ।

'বণ্ড দিজীয়ে।'

'বেরিয়ে যাব তবু বণ্ড দিতে হবে?' একজন পণ্ডিত আবার বেঁকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ জী।'

কাগজ এলো, কলম এলো, উঠল মনের ভিতর ঝড়। সেই পণ্ডিত লিখল—

'আমরা বাস্তহারা। ঈশ্বর আমাদের করেছে গৃহহীন লক্ষীছাড়া। আমরা অপরের পরিত্যক্ত প্রাসাদে আশ্রয় নিয়ে নিশ্চয়ই আইন অমান্য করেছি। গাছতলায় থাকব, রৌদ্রে জলে কাটাব তবু মহামান্য সরকারকে জ্বালাতন করব না। অপরের কোন বিলাস ব্যসনে ভুলে করেও কখনও বাধা জন্মাব না।

আমরা সর্বহারা—সর্বহারার মতই কাতার দিয়ে কাঁদব। পথে পথে চলব।

আজ আমরা সবাই মিলে অংগীকার করছি, আমরা কস্মিনকালেও ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, মাথার ওপর আচ্ছাদন দাবী করব না।

ঈশ্বরই আমাদের বিরুদ্ধবাদী। আমরা বাস্তবিক আইন এবং শৃংখলার চোখে অপরাধী।...

পণ্ডিত কম্পিত কণ্ঠে পড়ে শোনাল সবাইকে। হিন্দুস্থানী জমাদারটি মন্তব্য করল, 'বড়ি আচ্ছা হুয়া।' হয়ত সে কিছুই বুঝল না।

সবাই নত মস্তকে দস্তখত দিল। কেউ কেউ দিল টিপ সই।

যেমন সবাই একত্রে হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল, তেমনি সকলে একত্র হয়ে পথে এসে দাঁড়াল, যে যার পোঁটলা পুঁটলি হাতে।

ভাবল: মন্ত্রী মহোদয়দের জানালে নিশ্চয়ই এমন জুলুমবাজী চালাতে পারত না সাধারণ পুলিশ। ওদের একটা কোন ব্যবস্থা হতই।

তাঁরা মহাপ্রাণ, নিশ্চয় মায়াশীল!

ওরা বেশী দূরে যেতে পারে না। পশ্চিম বাঙলার রিলিফ কেন্দ্রগুলি সদা জাগ্রত। সচকিত থাকে হিতৈষী বন্ধুর মত।

কোথা থেকে যেন ট্রাক আসে। বহুক্ষণ ধরে ওদের বুঝিয়ে, অভিমান ভেঙে, নানা ক্যাম্পে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়।

কে যেন বলে, 'এসব তো অভিনয় নয় ?'

কেউ কিছু জবাব দেয় না।

ওরা ক্ষুধার্ত। ওদের মাথা মগজের ঠিক নেই। ট্রাকে তুলে ওদের সমবেত শক্তি বিচ্ছিন্ন করে বন্ধুরা আশ্বস্ত হয়।

'রোজ পঁচিশ লক্ষ টাকা আপনাদের জন্যই ব্যয় করছেন বাঙলা সরকার। কে কোথায় একটা অন্যায় করেছে, সেজন্য যদি আপনারা সরকারকে দায়ী করেন, তবে নিতান্তই ভুল করা হবে নাকি ? চলুন, আপনারা আপনাদের জন্য স্থিরিকৃত সাহায্য গ্রহণ করবেন।'

একটা মটর গাড়ী থেকে এমনি আরও অনেক কথা রিলে করা হতে থাকে।

বৃদ্ধদের চোখ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। তারা একটু আগে ক্ষুব্ধ হয়ে কি ভুলই না করেছে !

মটর গাড়ীর ভিতর থেকে এই সব কথা যে বলছিল তাকে না দেখেও উর্মিলা যেন কণ্ঠস্বর শুনে চিনল। একবার সে উৎগ্রীব হলো মুখখানা একটু দেখবে বলে। আবার ভাবল কে না কে—থাকে গে! তার অহেতুক ঔৎসুক্যের এমন প্রয়োজনই বা কি ?

অনেক ঘুরতে ঘুরতে উর্মিলা ও তার ছেলে দুটিকে নিয়ে মটরট্রাক একস্থানে এসে থামল। জায়গায়টার পরিবেশ দেখেই উর্মিলার বিষণ্ন মন আরও বিষণ্ন হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পূর্বে বৃদ্ধ সামন্তকে ও বাতাসীর মাকে একটা ক্যাম্পে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাতাসীর মা উর্মিলার পায়ের ধুলো নিয়ে কেঁদে বিদায় হয়েছে।

বাতাসীর মার ক্রন্দন দেখে একজন ড্রাইভার বলেছিল, 'আপনিও না হয় ওঁর সংগেই চলুন। দুজন যখন পরিচিত, এক ক্যাম্পেই না হয় থাকবেন।'

আর বুড়ো বুঝি বাতাসীর মার অপরিচিত! বাতাসীর মার মুখে একটা ত্রাসের ভাব ফুটে ওঠে।

'স্বামী স্ত্রীতেও কি থাকতে হবে আলাদা?' উর্মিলা প্রশ্ন করে ভয়ে ভয়ে।

ড্রাইভারটি লজ্জিত হয়ে জবাব দেয়. 'না, না—ক্ষমা করবেন, বুঝতে পারিনি আমি তা।'

ক্যাম্পের চারিদিকে উন্মুক্ত দগ্ধ তামাটে প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথায়ও লোকালয় যে আছে তার চিহ্ন নেই। জনশূন্য মাঠের মধ্যে একটা বাড়ী, একেবারে উলংগ মানুষের দেহের মতই বর্বর বলে বোধ হচ্ছে। একটা গরু নেই একটা ছাগল পর্যন্ত চড়ে না। এ কেমন দেশ? এতো বনবাসের চাইতেও কঠিন সাজা - মরুবাস।

জল আছে তো?

স্ত্রী পুরুষের পাইখানা?

সাধারণ জীবন ধারণে যে দুটো জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন সেই দুটোরই কথা প্রথম মনে পড়ে উর্মিলার। একবার জল কষ্টও সে খানিকটা পেয়েছে।

সে যে ঘরখানা পেল তা মন্দ নয়। ঐ একখানা মাত্র ঘরই অবশিষ্ট ছিল। এখানে একটা ভাল টিউবওয়েল আছে, অন্য ব্যবস্থাটা ও দশাচল।

একঘর থেকে একটা তোলা উনান চেয়ে এনে সংগের পোঁটলা খুলে চারিটি চাল চড়িয়ে দিল উর্মিলা। যার উনান চেয়ে এনেছিল সে তিন চারবার এসে পইপই করে সাবধান করে দিয়ে গেল যেন ও বস্তুটি ভাঙে না। এখানের বেলে মাটিতে উনান তৈরী করা বড় কঠিন। ভেঙে ফেটে চৌচির হয় দুদিন গেলেই।

উর্মিলা পোঁটলা খুলতেই দুতিন জন এসে দাঁড়াল। ধার চাইল চাল।

কাল প্রত্যুষে নাকি রেশন আসবে। যে চাল ওরা ধার নেবে সেই চালই ফেরৎ দেবে অর্থাৎ আতপ হলে আতপ, সিদ্ধ হলে সিদ্ধ।

উর্মিলা ভাবল, এখানে এত স্বার্থপরতাও বাসা বেঁধেছে! যা নেবে তাই দিতে হবে! এমন তো ছিল না দেশে। সংগে তার একটি মাত্র পোঁটলা, ওতেই যাবতীয় সংসারী সামগ্রী, যেন বৈরাগীর ঝুলি। আবার এসে ভিড়ল কাদের সংসর্গে? উর্মিলা একটু অধীর হলো। চকিতে মনে পড়ল তার বাড়ী ঘর দেশী মর্যাদার কথা। একজন অতি সাধারণ লোকেরও যা সুখ সুবিধা ছিল দেশে, তা এখানে নেই একজন বড় লোকেরও।

সে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে রান্নার কাজে মন দিল।

একদিন আন্দোলন করে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বসান হয়েছিল বাঙলা দেশে।

এখন তেমনি একটা বিভাগ তদন্ত কমিশন কি বসান যায় না? সে কমিশনের ন্যায্য মানদণ্ডের কাছে কি উপস্থিত না হয়ে পারবে অপরাধীর দল?

কিন্তু এ ক্রোধ তার কেন উদয় হয় মনে? যে ক্ষতি তার পূর্ণ হবার নয় সে বিষয় তার চিন্তা না করাই উচিত। এত ভাবলে সে পাগল হয়ে যাবে।

উনান যে স্ত্রীলোকটির সে উর্মিলাকে একান্তে ডেকে নিষেধ করেছিল চাল ধারে দিতে। ওরা নিলে আর কিছুতেই ধার শোধ করবে না।

ওদের ছেলে মেয়েগুলোর দুরবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত কিন্তু উর্মিলা না দিয়েও পারল না। এই কদিন আগে সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—আজ চলেছে অকূলে ভেসে। এ সময় অত হিসেব নিকেস চলে না।

কিছুক্ষণ বাদে সেই স্ত্রীলোকটি এসে বলল, 'যা বলছিলাম—চাউল কয়ডা আমারে দেও—এখন ধার নিমু, আবার ভোর না হইতেই দিয়া যামু।'

'সে তো ওরা নিয়ে গেছে।'

'কও কি! এত কইরা নিষেধ করলাম তবু তুমি শোনলা না—দিলা ঐ লক্ষীছাড়িগো ধার?' সে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আধফোটা ভাতের হাঁড়িটা টান মেরে নামিয়ে রেখে উনানটা নিয়ে গেল।

উর্মিলা অবাক হয়ে থাকে।

পরদিন উর্মিলা দগ্ধ প্রান্তরের দিকে চেয়ে বসে আছে। রৌদ্রে ঝলসে যাচ্ছে তার চাউনি। অপরাহ্ন শেষ হয়ে এলে তবু সায়াহ্নের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। বেলা কি ফুরাবে না? দিন কি গত হবে না? সন্ধ্যা হলেই তো ছেলে দুটো ঘুমিয়ে পড়বে, আর খাইখাই করবে না।

কে যায় সাইকেল চড়ে? গেল না তো, ভিতরে ঢুকল এক বাঙালী সাহেব।

'রিলিফ অফিসার, রিলিফ অফিসার।' হল্লা শোনা গেল প্রতি ঘরে ঘরে। কেউবা বলল, 'রিলিফের দারোগা।'

উর্মিলা বেরিয়ে না এসে বরঞ্চ একটু ঘরের মধ্যে ঢুকে সামান্য একটু মাথায় কাপড় টেনে বসে রইল। যা বলার তা পুরুষেরাই বলবে।

আগন্তুক সাহেবটি ঠিক রিলিফ অফিসার নয়—বোধহয় এদিকের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী। কিন্তু ক্যাম্পের অজ্ঞ অধিবাসীরা তাকে মৌমাছির মত ঘিরে ধরল। তাকেই তারা ঠিক করল যেন এসেছেন এই স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রচালক নেহেরুজী। দেবেন অন্ন, বস্ত্র ও বৃত্তির সংস্থান করে। দেবেন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর

একটা ক্ষুদ্র অংশকে আজই সুখী গৃহী করে—যে গৃহের স্মৃতি এখনও ভোলেনি এই অবোধ মানুষগুলো, যাদের বাড়ী ছিল স্নিগ্ধতোয়া নদীর পারে, ধানের দেশে।

কেউ কেউ তার কথা শুনে বলল, 'সরকার যখন এতগুলা বিভাগ খোলছে, মোটা মোটা ব্যাতন দিয়া আপনা গো সব রাখছে তখন আর আমরা ভাবি না। খাই না খাই পথ একটা হইবেই।'

তাদের চোখের সুমুখে ভাসছে নানা স্থানের ত্রানের সাজান আফিসগুলি। রাজেন পণ্ডিত এবং আরও কে কে যেন দেখে এসে সব বলেছে। কি না সেখানে আছে! কি না কর্তারা ওদের জন্য করবে! রোগ শোক জন্ম মৃত্যু—কোনও সমস্যাই ওদের অমীমাংসিত থাকবে না। হাজার হাজার কেরানী, বেয়ারা, সাহেব সুবা খাটছে গলদ ঘর্ম হয়ে। তবে অধীর হলে চলবে না—সবুর না করলে নাকি মেওয়া ফলবে না।

'নিশ্চয় হবে।' আপনাদের জন্য আমাদের কারুর চোখে ঘুম নেই। কাগজ পড়েন না? বড় বড় নেতাদের বিবৃতি দেখেন না? প্রত্যহই তাঁরা আকুল ভাবে স্থির থাকতে বলছেন সবাইকে। মাত্র এই কটা মাস হয় তো বিভাগ হয়েছে।'

'আমরা তো অস্থির হই নাই। তয় চাউল নাই আইজ তিন দিন কিনা?' বিষাদ ক্লান্ত কণ্ঠে একজন বলল, 'আমরা অস্থির হই নাই তো সাহেব—কেবল পেটটা আমাগো কথা শোনে না।'

'এসে পড়ল বলে, গুদাম খালি ছিল এতদিন। সদরে থাকলে কি আর আমরা পাঠাই নে।'

একজন বৃদ্ধ একটি রুগ্ন ছেলেকে এনে দেখাল। ডাক্তারে নাকি ওষুধ খেতে বলে। সব ওষুধের সেরা যে ভাত ওষুধ।

অফিসারটি হেসে বলে, 'তা ঠিক, তা ঠিক।' তার মধুর ভাষায় অনেকটা স্বস্তি বোধ করে ক্ষুধার্ত জনতা।

কিন্তু একজন অতি প্রাচীন লাঠিতে ভর করে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'একটি গুরুতর কথা আছে মশাই। আমরা এমন কি অফরাদ করেছি খাবার চাইয়া?'

'না—সে কথা কে বলল? তবে হৈ হল্লা করবেন না কালকের মত।'

'তা কইতে পারেন!' প্রাচীন নিস্তেজ ফুসফুসে যেন কয়েকটা হাপর টেনে নিল। 'তয় যে একটা কথা শুনি—খুন ডাকাতি রহাজানী করলাম না, তবু আপনার গোসা হন নাকি আমাগো মত উদ্বাস্তুর উপর!'

'কেন, কি করে বুঝলেন তা ?'

'কালাপানি (দ্বীপান্তর) পাঠাইবেন নাকি আমাগো—আন্দামান ? দাইমূল হইবে খাওন চাওনে ? কংগ্রেসের জন্য আমরও তো যুগ্য ছাওয়ালডা মরছে গুলি খাইয়া মেদিনীপুর।' তারপর সে সুর বদলে বলে, 'বাইচ্যা থাকলে পাঠাডারে আইজ কানে ধইরা দেখাইতাম সব। মশাই অনেক মানা করছি, অনেক বুঝ বুঝাইছি। আইজ বুকটা আমার জইল্যা যায় !'

ইতিমধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কাঁদতে আরম্ভ করল। সেই বুঝি মা।

'আপনি সরকার কে জানান খেসারত পাবেন। আর আন্দামান যাওয়ার কথা মিথ্যা। যে স্বেচ্ছায় যাবে একান্ত তাকেই পাঠান হবে—সরকার জোর জবরদস্তি করবেন না। আপনারা ভুল করছেন কেন ?'

'জোর করার আর কি আছে ললিত !' একজন অতি খিন্ন কণ্ঠে মন্তব্য করল, 'পায় আর ভর দেওয়া যাইবে না এভাবে সপ্তাহ দুই গ্যালে।'

অফিসারটি যেন শুনতে পেল না এমনি ভান করে সে কাজের কথা পাড়ল। 'সন্ধ্যা নাগাদ চাউল এসে পড়বে—গাড়ীর অসুবিধায়ই দেরি হয়ে গেল। আপনারা এখন নিশ্চিন্ত মনে সে যার ঘরে যেতে পারেন।'

এসব কথা উর্মিলা লক্ষ্য করছিল না। করলেও তা তার মর্মে প্রবেশ করছিল না। সে ভাবছিল মানুষ কতখানি নির্লজ্জ হতে পারে !

হঠাৎ রাখাল দাস বলল, 'কাল এখানে একটি স্ত্রীলোক এসেছে অন্য ক্যাম্প থেকে। তার বাড়ী আমাদেরই এক জেলায়। গ্রামের নাম কুসুমপুর।'

'কুসুমপুর ! কার স্ত্রী ?' প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য অতিষ্ঠ হয়ে রইল বাঙালী সাহেব।

'তা তো ঠিক জানিনে। তবে শশিশেখরের নাম শুনেছেন, সপ্তগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত…'

'শুনেছি শুনেছি, বলো, বলো—তিনি তো আমাদের বাড়ীর পাশের লোক—স্বনামধন্য ব্যক্তি, মারা গেছেন এই কয়েক মাস আগে।'

রাখাল রিফিজি হলেও সাহেবের পরিচিত লোক। বহুদিন ধরে ক্যাম্পে ক্যাম্পে টক্কর খাচ্ছে। সরকারী, বে-সরকারী কোন ক্যাম্পই তার অপরিচিত নয়।

'তা হলে তো আপনি সবই জানেন।'

'না, না কিছু জানিনে রাখাল, বলো ভাই, তারপর…'

'শশিশেখরেরই পুত্রবধূ।'

অবনীশেখরের স্ত্রী, মাধবীর ভ্রাতৃবধূ, বলতে গেলে চাঁপার এক রকম মা!' সমৃদ্ধির দিনের কলকোলাহল মুখরিত কুসুমপুরের ছবি নিমেষে উড়ে গেল কিরণের মাথার ভিতর দিয়ে। সে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়াল।

'একা এসেছেন দুটি ছেলেকে নিয়ে, বাকী সব নাকি মারা গেছেন এক ডাকাতিতে। খুন হয়েছে তাঁর স্বামী।'

'উঃ চুপ কর।'

'ননদ দুটি মরেছে নাকি আগুনে পুড়ে।'

'থাম রাখাল—থাম। চুপ কর।'

সকলে ভাবল সাহেবের দেশী লোক—তাই একটু আঘাত পেয়েছেন। যাক, উর্মিলা ওদের ক্যাম্পে ভাগ্যক্রমেই এসেছে। ওর জন্য এবার একটু বুঝি সুবিধা হবে সরবরাহে।

কিরণের কিনা মনে পড়ল। শৈশবের সাথী, কৈশোরের প্রীতি, যৌবনের কটি বিমুগ্ধ স্মৃতি কিছুই বাদ গেল না তার চিত্তপট থেকে। যে কুসুমপুর ভেঙে গেছে, যে মাধবী মরে গেছে, যে চাঁপাকে আর সে দেখবে না কখনও, সকলের জীবন্ত ছবি একত্রে হয়ে যেন এগিয়ে এল ঝড়ে-ওড়া ছিন্ন পত্রের মত। যারা বিগত, তাদের অস্তিত্বই যেন বারম্বার পীড়ন করতে লাগল তাকে। কুসুমপুর ছেড়ে, মাধবীদের কথা কিছু না ভেবে সে তো বহুদূর চলে এসেছে, কিন্তু কেন সে আজ অস্থির হয়ে পড়ছে? কেন সে বলিষ্ঠ যুবক হয়েও দাঁড়াতে পারছে না খুঁটিটা না ধরে?

রাখাল কিরণকে বসতে বলল। সে ভিন্ন কথায় চলে গেল। 'সরকারী রেশন পাচ্ছি কবে?'

কিরণ চুপ করে মাথা নত করে রইল।

উর্মিলা এবার দূর থেকে স্পষ্টই দেখল বাঙালী সাহেবকে—চিনল নিমেষে। রাখালের কথা সে শোনেনি, কিন্তু লক্ষ্য করেছে কিরণের ভাবাবেগ। হায়রে স্নেহাতুর মন, হঠাৎ নরম হয়ে উঠল নদী তীরের পলিমাটির মত। কিরণ যতই অবাঞ্ছিত কাজ করে থাক, ও ভুল করেই তা করেছে। মানুষটাকে নিতান্ত অপ্রীতিকর ঠেকলেও, ওর অসহায় বালক সুলভ মনটাকে যে ওর বৌদিদি স্নেহের

চোখেই দেখেছে! নারী চরিত্রের একি অদ্ভুত ঔদার্য! একি বিস্ময়! পদ ও সম্মানের জন্য যে সকলের অপ্রিয়, সেই আবার পরম সহানুভূতির জন্য দাবী করে কেড়ে নিল উর্মিলার হৃদয়। সশরীরী উর্মিলা এগিয়ে গেল না বটে, কিন্তু অশরীরী উর্মিলা বুক পেতে ধরল যেন কিরণের লুণ্ঠিত অবনত শির।

কিরণ ভাবছে, পালিয়ে যাবে। কি করে দাঁড়াবে, কি করে দেখাবে এ মুখ উর্মিলাকে? কোন পথে কেমন করেই বা পালাবে? ক্যাম্পের এতগুলো লোককে কি বলে যাবে, জবাবদিহি করবে কি? ঐ না উর্মিলা? এমন শংকটে কখনও কিরণ জীবনে পড়েনি। জন্ম ও মৃত্যুর দ্বিধা দ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন হাঁপিয়ে ওঠে, জয় পরাজয়ের অনিশ্চয়তায় যেমন ব্যাকুল বিমূঢ় হয়ে কালক্ষেপ করে, তেমনি দোটানায় পড়ে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল কিরণের অন্তর। তার চোখ মুখের রক্তপ্রবাহ বেড়ে গেল। হয়ত সংজ্ঞা হারাণও অসম্ভব নয়।

এর মধ্যে একদিন কিরণ উর্মিলাকে দেখেছিল যেন কোথায়—কোন প্লাটফর্মে না জানি ফুটপাতের কিনারায়।

সমস্ত ঐতিহ্য, বেশ-রিক্ত বিধবাকে সে চিনতে পারেনি। যতটা বা সে চিনেছিল, তার মন মোটেই সায় দেয়নি। পথের সেই অস্বাভাবিক পরিবেশের সংগে, এই অচিন্ত্যনীয় বৈধব্য অসহ্য হয়ে উঠেছিল কিরণের কাছে—তাই সে সরে গিয়েছিল সুমুখ থেকে।

হ্যাঁ হ্যাঁ এখন মনে পড়েছে।—

স্থানটা ছিল একটা প্লাটফর্মের নিকটেরই একটা ফুটপাত। মলিন বস্ত্রে একটা ফুটা মেটে হাড়িতে জল নিয়ে আসছিল উর্মিলা। জলই তো! তাই তো ঝরছিল অবিরল ধারে। আর তারই সংগে হেঁটে চলছিল দুটো ছেলে হাত পায় ধূলো-মাখা। এই কি শশিশেখরের পুত্রবধূ, যাদের গৃহে তামা কাঁসার তৈজসপত্রের অভাব ছিল না? দারিদ্র্য কিছুটা ছিল বটে কিন্তু এ নিষ্ঠুর দীনতা, এ কল্পনাতীত মালিন্য কখনও দেখা যায় নি সেখানে। নিতান্ত কপর্দকশূন্য পল্লীবাসীর গৃহেও এ দীনতা অবাস্তব।

উর্মিলার সংগে হাঁটতে হাঁটতে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছিল ছেলে দুটি। তখন সন্ধ্যাকাল। অজস্র আলো জ্বলছিল চারদিকে, অজস্র সুবেশধারী নারী-পুরুষ ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যাচ্ছিল, নয়ত আসছিল পিছে সরে। সেই আলো ও বেশবাসের চাকচিক্যের মধ্যে যেন হেঁটে চলেছে একখানা অতি ম্লান অন্ধকার—

সংগে তার দুটি সন্তান, তার চেয়েও অস্পষ্ট। চিনতে পারল না কিরণ। সকলের মতই সে তুচ্ছ করে চলে গেল। না, না—তুচ্ছ করে যায় নি সে, গেছে ভয়ে শংকায় এড়িয়ে।

কিছুক্ষণ বাদেই কিরণ আবার ফিরে এল—ফিরে এল বিবেকের কশাঘাতে।

কিন্তু ততক্ষণে উর্মিলা ভীড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে—শুধু ম্লান ধূলি মলিন পদচিহ্ন পড়ে রয়েছে প্ল্যাটফর্মে।···

আজ কি করবে এখন কিরণ? সে অজ্ঞাতে সুকঠোর আক্রমণের ভংগীতে প্রশ্ন করে নিজেকে।

জবাবদিহি করতে হবে। হক, এড়াতে যখন পারা যাবে না তখন আজই যা কিছু হয় ভাল। সেদিনের মত আজ সে আর ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না। তা হলে আর আপশোষের শেষ থাকাব না।

কিছু সময়বাদে কিরণ এসে উর্মিলার ঘরে প্রবেশ করল। কিছু বলতে তার যেন সাহস হচ্ছে না। অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী এসে যেন দাঁড়াল বিচারকের সুমুখে কাঠগোড়ায়।

উর্মিলার হৃদয়ে যা-ই হক সে তাকে বসতে বলল। ভাঙা জানালাটার পাশে একখানা ছেঁড়া কাপড় বিছিয়ে দিল।

'বৌদি—আপনি, এখানে!···'

'অসম্ভব বলে মনে হ [illegible] ক ভাই? উর্মিলা কথার স্রোত অন্য দিকে ঘুরাল। আমাদের আর কি ছিল বিষয়-আশয়! ঐ নমশূদ্র বুড়োর—যার ছেলে মারা গেছে তেরশ বিয়াল্লিশে মেদিনীপুরে, তার বাড়ীতে লাঙল চলত দশখানা। এমন একটা ক্যাম্পের মত পরিবার সে খাইয়ে রাখত বারমাস।'

কিরণ আশ্চর্য হয়ে গেল। এতবড় একটা দুর্ভাগ্যের পরও যে মানুষ কি করে এমন স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে! তাদের দেশের মেয়ে, তাই কলিজায় এখনও এত বল। ভেঙেছে তবু গুঁড়িয়ে যায়নি। সংগ্রাম করছে অস্তিত্বের জন্য।

'তোমার মা বাবা ছোট বোনটি?'

'মারা গেছে কলেরায়।'

'সব পরিষ্কার? বেশ! এখন আছ কোথায়?'

'মেসে।'

'কী চাকরী করছ? কত মাইনে?'

'চাকরীর আর নাম শুনে হবে কি—তবে স্বাধীন সরকার আমাকে অগ্রাহ্য করেননি—দরখাস্ত দেওয়া মাত্র ডাক পড়ল। কাজ নিলাম। বসে থেকেই বা করব কি ?'

'মাইনে কত পাও ?'

'সে কথা আর শুনে হবে কি ! বাবা মা বেঁচে থাকতে এর অর্দ্ধেক টাকাও যদি আমাকে কেউ দিত !'

'তখনও তো দেশ স্বাধীন হয়নি।'

'স্বাধীন হয়েছিল বৌদি তবে কি জানেন, নানা ডামাডোলে আমরা যেমন এগোতে পারি নি, তেমনি সরকার ও খোঁজ খবর নিতে পারেন নি। আর পর পর বড়দের জায়গা করে তো আমাদের ডাকবেন।' কিরণ এসব কথা বললেও উৎগ্রীব হয়েছিল যে কথা জানা ও শোনার জন্য তা উল্লেখ করল না উর্মিলা। কিরণও এমন কোন সূত্র খুঁজে পেলনা যে জিজ্ঞাসা করে জানবে কিছু। আবার তার ব্যাকুলতাকে ছাপিয়ে যে একটা তুফান জাগতে পারে দুঃখ তাপ ক্লিষ্ট এই বিধবার মনে সে আশংকায়ও বাধ্য হয়ে সংযত থাকতে হলো কিরণকে। সে পণ্ডিত পরিবারের কার কার কাছে কি কি অপরাধ করেছে তাই খতিয়ে দেখতে লাগল। শুধু ঐ একটি পরিবারের কাছেই সে দায়ী নয়—দেখল হিসাবের শেষ পাতায় অংক কসে, বঞ্চনা করেছে অনেককে—বহু ভাবে। তার জীবন দিয়েও যদি আজ এ বঞ্চনা ঘুচান যেত ! সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিজের ওপর।

উর্মিলার ছেলে দুটি সংবাদ নিয়ে এলো যে চাল এসেছে, এক্ষুণি যেতে হবে, নইলে গোলমাল হবে ভাগের সময়।

উঠতে গেল উর্মিলা। কিরণ তাকে বাধা দিল। 'আমি যাই আপনার আর যাওয়ার প্রয়োজন নেই।'

'কেন বলতো ?'

'এমনি। আমার হাতে তো কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে।'

'তা আমার জন্য এখানে বসে ব্যয় করলে ভাল দেখাবে না। কারুর প্রয়োজনই আমার চাইতে কম নয়।'

ধন্য মেয়ে ! এখনও এতটা মাথা ঠিক আছে।

কিরণ জানে একজন স্ত্রীলোক যতই বুদ্ধিমতী হক, অভাবগ্রস্ত এক দল বুদ্ধি-ভ্রংশ মানুষের আওতা থেকে সে কিছুতেই নিজের প্রাপ্য অংশ বুঝে আনতে পারে

না। আর তাদের বণ্টনের রহস্য ঘাটে ঘাটে—ওজনে, গুণাগুণে, আর ও নানা ফিকির ফন্দিতে। সে সব জেনে শুনেও আজ আর সাহায্য করতে যেতে পারল না কিরণ।

(২৩)

ঘেসে ফিরে রাত্রিটা কিরণ কিভাবে যে কাটাল বলা যায় না। একটা ভুলে যেন গতি পরিবর্তিত হয়েছে একটা সৌর জগতের। ফলে অসংখ্য জীব-জন্তু কীট-পতংগ মানুষ ধ্বংস হলো, উলটে গেল চিরন্ত জল, বায়ু, তেজের ধারা। অথচ এ যেন স্বাভাবিক কিছু ঘটল না। জোর · র ঘটিয়ে দেওয়া হলো, চাপিয়ে দেওয়া হলো মৃত্যুদণ্ড।

আরও অনেক কথা ভাবতে ভাবতে রাত ক্রমে বাড়ল, তারপর ক্রমে কমল —অবশেষে ভোর হলো। ভোরের সংগে সংগে সে শয্যা ছেড়ে উঠল। কাপুরুষের মত মনকে প্রবোধ দিল, এছাড়া আর গত্যন্তর ছিল কি?

এ অনিবার্য এবং অনস্বীকার্য।

কেউ তার কাছে কোন বিষয় কৈফিয়ত চায়নি। এমন যে মৃতা মাধবী তার আত্মাও না। ভাঙা হাতখানা নিয়ে বিদ্রোহ জানায়নি ইসমাইল—তবু সে নিজের কাছে নিজেই যুক্তি খাড়া করল বারম্বার, এ অনিবার্য এবং অনস্বীকার্য।

দেবতুল্য কোন গোষ্ঠীকে সে খাটো করতে পারে না। তবু তার শান্তি নেই। যুক্তির ইন্দ্রজাল আবার তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে সরে পড়ে। মনুষ্যত্বের কশাঘাতে তার চিন্তা হয় ভিন্নমুখী।

প্রায় প্রত্যহই সে শিয়ালদা ষ্টেসন দিয়ে তার কার্যস্থলে যায়। হাজার হাজার মানুষে ভরে আছে প্লাটফর্মগুলো। বৃদ্ধ যুবক শিশু বালক বিধবা যুবতী, নানা দেশের নানা বয়সের মানুষ। এদের নিত্য দেখে কিরণ—নিত্য এদের কাকুতি মিনতি ক্রন্দন শোনে। কিন্তু আজ তার মর্মে একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে এরা হাজির হয়।

এরা কি যাত্রী?

সুখের, আনন্দের, নয় গৌরবের?

এরা তো যাত্রী নয়। অথচ চিরযাত্রা করে এসেছে মাতৃভূমির কোল থেকে। কোন সভ্যতার ইতিহাসে কি এর তুলনা মেলে? যে দেশ স্বাধীন হয়, সে দেশ

ছেড়ে কি বিনা যুদ্ধে, প্রত্যক্ষ কোন রক্তপাত না হলে, এমন দলে দলে মানুষ বাস্তু-ত্যাগ করে? প্রতিষ্ঠা মান মর্যাদা নিশ্চয় এদের বিপন্ন। নইলে সামান্য একটু চোখ রাঙানির ভয়ে কেউ ছেড়ে আসে না বাড়ী ঘর একটি মাত্র পুঁটলি নয়ত, দুটি বোঁচক সম্বল করে স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে।

কে এদের পুনর্বাসন করাতে পারে? কার এমন স্পর্ধা আছে? তাদের মত বেতনভূক কর্মচারীর? সে যত বড় শক্তিমানই হক, তা পারে না। পারে শুধু বিবৃতি দিতে। আর পারে মাসান্তে নিজের খাতা কলম নথিপত্র ঠিক রেখে নিয়মিত বেতন নিতে।

বিভাগের পূর্বে যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তা এরা জানে এবং মনে মনে একটা কিছু আশা পোষণ করে। তা না হলে কিছুতেই সংগে করে আনতে পারে না ঝাঁটার কাঠি এবং লক্ষ্মীর আসন। এই আবেষ্টনের মধ্যেও দু একজন বৃহস্পতিবার পাঁচালী পড়ে, প্রদীপ জ্বালে নিত্য সন্ধ্যাকালে। অপরিচিত মেয়েরা একত্র হয় প্ল্যাটফর্মের তলে। শোনা যায় হুলুধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ।

কেউ হয়ত তলিয়ে ভাববে না, এদের জন্য সত্যি কোন ইতিহাস হয়ত রচিত হবে না এরা ধীরে ধীরে পেটের টানে নেমে যাবে সমাজের নীচের তলায়। হবে চোর, ডাকু, খুনী, নয়ত বেশ্যা পনর আনী।

এক আনীর জন্য একটা কিছু করে, আমরা বাজাব জয়ঢাক—হাসি এবং দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে কিরণ। তার কানে যেন তীব্র শ্লেষের মত ঠেকে যত জ্ঞান-কর্তার মিঠা মিঠা বুলি। কত তাদের পরিকল্পনা, কত তাদের ছল! শুধু টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ আর হট্টগোল।

তবু চাকরীর মায়ায় ট্রেনে ওঠে কিরণ।

তার কাছে অনেক নির্দেশ বোঝাইকরা খাম। এ নির্দেশ কাদের? যাঁরা হয়ত কখনও খাস-কামরা ছেড়ে নামেন না, ধূলো এবং জ্বালার ভয়ে কখনও যান না সরে জমিনে। থাকেন চিঠিগুলির মত খামের বুকে, অতি সুখে এবং নিরাপদে—সিলের ধাক্কা, স্টাম্পের চোট যা কিছু উপদ্রব যায় বেচারী খামগুলোর ওপর দিয়ে।

মাঝে মাঝে উর্মিলার মনে পড়ে বাড়ীর কথা। কেউ কি জীবিত নেই? জাহ্নবী দেবী পর্যন্ত কি মারা গেছেন? কিরণের কাছে সময় সময় জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার মনটা যেন কেমন করে ওঠে। কার কাছে জিজ্ঞাসা করবে কুসুমপুরের কুশল প্রশ্ন?

দাদার কাছে একখানা পত্র লিখলে হত। কিন্তু উর্মিলার বর্তমান অস্তিত্ব সে কেউকে জানতে চায় না। উর্মিলা কি জীবিত আছে? যে হেঁটে চলে বেড়ায়, কিরণ এলে কথা বলে, সে উর্মিলা নয়, সে সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শশিশেখরের পুত্রবধূ নয়—তার একটা জীবন্ত শব। অভিনয়ের কিছু বাকী আছে, তাই সে করে যাচ্ছে।

তবে অনেক সময় দেখতে ইচ্ছা করে রকমানকে, মনে পড়ে আলেয়া ও আম্মা ফতেমার কথা, পাগলা বৈদ্য পরাণের কথাও ভুলতে পারেনি উর্মিলা। উর্বশী তো দাগ কেটেছে মর্মে। আর মাঝে মাঝে পাগল করে ইসমাইল। 'বৌদিদি, বৌদিদি চাঁপা বড় জ্বালায়।'

উর্মিলা তার অজ্ঞাতসারে কাল্পনিক ব্যথাহত বালকের অভিযোগের উত্তর দেয়, 'নারে ভাই আর তোকে দুষ্টু চাঁপা জ্বালাব না। আমি শাসিয়ে দেব পাজি মেয়েকে।' তারপর অনেকক্ষণ ধরে কেন জানি তার বুকে শ্রাবণের বারিপাত চলে।

নিজের ভুল বুঝে উর্মিলা অঞ্চলে চোখ মোছে। কোথায় ইসমাইল, কোথায় চাঁপা, কোথাই বা কুসুমপুর? মায়ের বিমর্ষ মুখ দেখে ছেলে দুটি ছুটে আসে। রকমান, আলেয়া, আম্মা, ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে যেন হৃদয়ের কোন অতলে।

এমনি মাঝে মাঝেই ওরা আসে যায়, নিরালায় একা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না উর্মিলা। সে অধীর হয়ে বাতায়নের পাশ থেকে উঠে মানুষের মধ্যে এসে হাঁপ ছাড়ে। অশরীরী প্রেত যেন তাকে অনুসরণ করে। এরা স্মৃতির প্রেত—উর্মিলার ভীতির কোনও হেতু নেই, কিন্তু মর্ম এরা ছাড়ে না।

সেদিন উর্মিলা শুনল যে এ ক্যাম্পের সবাই যাবে কলকাতা। কেন তাদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, তারা আর কতকাল আশায় আশায় বসে দিন খোয়াবে?

সবাই একত্র হল; আরও আশপাশের ক্যাম্প থেকে অনেকে এল। যাবে বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্ট্রীটে। বৃদ্ধেরা হাতে লাঠি নিল, যুবকেরা নিল কাস্তে হাতুড়ি—যা ছিল ওদের পেশার সরঞ্জাম। অতি উৎসাহী মেয়েরা ছাড়া উর্মিলার মত আর সবাই বসে রইল।

এদের কর্ণধার হায়ে চলল রাজেন পণ্ডিত।

রাজেন সারাদিন ধরে ওদের নিয়ে ঘুরে সন্ধ্যার পর ক্যাম্পে ফিরে এল।

খুবই পরিশ্রান্ত হয়েছিল সকলে, কিন্তু একটা প্রবল উত্তেজনা উপলব্ধি করছিল মনে মনে। হেঁটেছে প্রায় দশ মাইল, তাতে এতটুকুও নাকি আজ কষ্ট বোধ হয়নি। কত নতুন সংবাদ যে ওরা বহন করে এনেছে! এখন তাই আবার বলছে বেশ ফলাও করে স্ত্রী কন্যার কাছে।

যেখানে ওদের রাজেন নিয়ে গিয়েছিল, সে তো আফিস নয়, বুড়োরা ইতিমধ্যেই নাম দিয়েছে 'কল্পতরু আশ্রম'। মানবজন্ম ধারণ করে যা কিছু আশা করা সম্ভব, তা নাকি সমস্তই ওখানে পাওয়া যায়—তবে নগদ-ছগদ নয়, একটু কালবিলম্বে।

ফ্রী রেশন চাও, তা পাবে। চাকরী চাও তাও দেবে। বাড়ী ঘর হালের গরু কিছুই ওখানে অমিল নয়। শাড়ী দেবে, সেমিজ, সায়া চাইলেও বরাদ্দ হতে পারে।

'এটা অতিরিক্ত বললে উপেন।' কে যেন বাধা দিল। 'মাঐকে আর শেষ বয়সে সেমিজ সায়ার লোভে নাচিও না, শাড়ী বরঞ্চ একখানা—'

উপেন একটু লজ্জিত হল তার অতিভাষণের জন্য। তবু সে তার গলার উঁচু পর্দা নীচু করে মনের আনন্দে অনেক কিছু বলে যেতে লাগল স্ত্রীর কাছে। পাওয়া যায় নাকি লোমশ কম্বলও—তবে প্রয়োজনের তুলনায় কিছু অল্প। তা নাকি পরীক্ষা করে জেনে এসেছে উপেন। কিন্তু সেজন্য খেদ নেই তার—এমন পর্বত প্রমাণ চাহিদানুযায়ী লোম সংগ্রহ করা নাকি দুঃসাধ্য ব্যাপার শিশু-সম্রাজ্যের পক্ষে।

উপেন নাকি একটু রসিকতা করে প্রশ্ন করেছিল কেরাণীকে, 'নাবালক সাবালক হইবে কবে মশায়?'

কেরাণীটা অত্যন্ত মুখ-তোড় জবাব দিয়াছিল গায়ের রাগে, 'তোমরা মরলে!'

উপেন চমকে উঠেছিল, কিন্তু সে আঘাত মনে রাখে নি। ইত্যাবসরে একটা বিড়াল এসে তার খাদ্যের মধ্যে যেটা উপাদেয় সামগ্রী, অর্থাৎ মাছের টুকরাটা সেইটা নিয়ে চম্পট দিল। উপেন গর্জে উঠল—কিন্তু শ্রীমতী মার্জার ততক্ষণে পগাড় পার। কতদিন পরে কত চেষ্টা করে আজ উপেন দু ছটাক মাছ কিনেছিল!

ঊর্মিলা শুয়ে শুয়ে দেখছিল এবং কানে যাচ্ছিল তার সমস্তই। সে বড়ই দুঃখীত হল—উপেনের গর্জনে নয়, তার সংগে খেতে বসেছিল যে ছেলেটা তার মর্মভেদী কান্নায়। ওদের পুকুরের খানা ডোবার মাছ আজ খায় কে!

পাশের ছোট্ট একটি ক্যাম্প থেকে কথা ছুঁড়ে মারল মোহন দেউড়ি, 'দেখছ পণ্ডিত কাণ্ডডা, দেওয়ালের গায় ক্যামন চোমৎকার সব ছবি রাখছে টানাইয়া—ফসল ফলাও—তুমি যত মুখখ্‌ই হও, তোমার আর আসল কথাডা বুঝতে এতটুকু দেরী হইবে না।'

'সরকারের ঐটা হচ্ছে প্রচার বিভাগ—মোহন, সব বিভাগের সেরা।'

কে কে নাকি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেও নাম লিখিয়ে এসেছে।

সমস্তই সুখবর—সকলে কলরবে সময় কাটায়। রাত হয়েছে দ্বিতীয় প্রহর। শেয়াল ডাকছে বাইরে। মরিয়া হয়ে মশাও ডাকছে ক্যাম্পগুলির ভিতরে। ওরা বুঝিবা টেক্কা দিতে চায় শেয়ালগুলোর ওপর। সময় সময় খানা নর্দমার পচাগন্ধ আসছে, যে গন্ধের সংগে অপরিচিত ক্যাম্পবাসীদের নাসিকা। চটাপট হাত চলে, ঘুম আসে না, তবু রঙিণ নেশায় কাটে রাতটা।

কেবলমাত্র ঊর্মিলা বুঝতে পারে, বুঝতে পারে তার হৃদয় দিয়ে—যে অশ্বত্থ ঝড়ে সমূলে উৎপাটিত হয়, তার ডালে নবকিশলয় সঞ্জীবতার লক্ষণ নয়, তাকে কোনও কৃত্রিম উপায়ে বাচান যায় না, অচিরেই সে মরে, প্রমাণ করে দিয়ে যায় যে যত পরিকল্পনা সমস্তই প্রহসন।

তবু সপ্তাহের পর সপ্তাহ ওরা ব্যাকুল হয়ে থাকে।

কিন্তু পক্ষান্তে কেন মাসান্তেও কোন সংবাদ আসে না। ওরা আবার দলবদ্ধ হয়ে কলকাতা যায়—ফিরে আসে দশ সহস্র মাইল যেন অতিক্রম করেছে এমনি গ্লানি নিয়ে।

অপুষ্টিকর খাদ্য, অমানুষিক দুর্গতিতে ওরা শুকিয়ে যায়, তবু হাঁটে, যায় আসে বারম্বার, কিন্তু ত্রান-সমুদ্রের পরিকল্পনার ঢেউ ঠেলে উঠতে পারে না।

নিমজ্জমান উপেন ভাবে সেদিন যা কেরাণী বলেছিল তা একান্তই বুঝি মিথ্যা নয়।

ডিউটি থাক, কি না থাক কিরণ রোজই যাওয়া আসা করে উর্মিলার কাছে। একদিন সে নিয়ে এলো অনেকগুলো জামা কাপড়। 'এগুলো ওদের জন্য এনেছি।'

উর্মিলা সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করল। 'ভাল করেছ, ওদের জন্যই তো এখন আমার যত চিন্তা।'

ছেলে দুটো জামা কাপড় নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে। বড়টি, নীতুই আমল করতে চায় সব। উর্মিলা ধমক দেয়।

নীতু সন্ত্রস্ত হয়ে জবাব দেয়, 'ও, হ্যাঁ মা বুঝেছি। আয়রে খোকন আয়— আমরা ভাগ করে পরি। এখন আর রাগ করো না, মা।'

একটু হাসি পায় উর্মিলার, কিন্তু সে গম্ভীর হয়ে থাকে।

খোকন জবাব দেয় না। সে গুম মেরে বসে থাকে ঘরের এক পাশে।

ওর রকম দেখে হাসি পায় কিরণের। 'তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমায় আর একটা জিনিষ দেব।' কতগুলো লজেন্স বের করে ধরল সে। 'এখন কি করবে খোকন ? মার কাছে থাকবে, না আমার কোলে আসবে ?'

খোকনের মনটা যদিও কিরণের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হলো, কিন্তু লজ্জাটাই ঘটাল যত জঞ্জাল। সে মুখ গুঁজে রইল মার বুকে। অনেক সাধ্য সাধনায়ও সে কিরণের বশ হলো না। তখন কিরণ হাঁফ ছেড়ে বসে পড়ল। 'না পারলাম না বৌদি—আপনার এ ছেলেটি আপনার মতই পাকা।'

উর্মিলা একটু রাঙা হয়ে উঠে খোকনকে বুকে চেপে ধরে। 'এইটি কিন্তু তাঁর মত দেখতে।'

'বুদ্ধিটি সম্পূর্ণ আপনারই পেয়েছে।'

উর্মিলা কয়েকটা লজেন্স খোকনের হাতে দিল। এইবার সে মার বুকে মুখ লুকিয়ে চুষতে আরম্ভ করল। 'এখন দেখ ও খেতে জানে কিনা ?'

কিরণ খোকনের গালে হাত দিয়ে একটু আদর করে বলে, 'দেখি ?' খোকন প্রতিবাদ করে।

ইতিমধ্যে নীতু তার ভাগের লজেন্স কটা খেয়ে খোকনের জামা এবং নিজের প্যাণ্ট পরে সং সেজে বাইরে বের হওয়ার উদ্যোগ করছিল। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই হেসে ফেলল কিরণ।

ঊর্মিলা বলল, 'একটু বসো কিরণ, আমি আসছি।' কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে একটু সাবান বের করল ঊর্মিলা। ছেলে ছুটোকে স্নান করিয়ে নিয়ে এলো অল্প সময়ের মধ্যে। পরিয়ে দিল জামা প্যাণ্ট জুতা। ভিক্ষুকের উলংগ সন্তান যেন অভিজাত্য লাভ করল বহুদিন পরে। ঊর্মিলা চুল আঁচড়ে দিয়ে দুজনের মুখে চুমো খেল। 'নোংরা করো না কিন্তু।'

বড় তৃপ্তি অনুভব করল কিরণ। এমনি একটা সংসার তারও কাম্য ছিল বুঝি অন্তরের অন্তঃস্থলে।

অবাধ্য খোকনকে বাধ্য করতে কিরণ যখনই আসে খালি হাতে আসে না। তাকে অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, বৃত্তিহীন পংগপালেরা ঘিরে ধরে। জর্জরিত করে তোলে লক্ষ লক্ষ অর্থহীন শানিত প্রশ্নে।

কথাগুলি কি অর্থশূন্য ? তা নয়।

কিরণ একা একা এক এক সময় চিন্তা করে দেখেছে, যেন আসল কোন অর্থ নেই তারই আশ্বাসের পিছনে। গোলা বারুদ না দিয়ে তাকে যেন পাঠান হয়েছে ফ্রণ্ট লাইনে!

রোগ আসে। খানিকটা ভেঙে যায় ক্যাম্পের পাঁজার। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক হয় বাঁধা-ধরা খাদ্যের তালিকা। প্রায় সংগে সংগেই রিলিফ আসে কিন্তু জীর্ণ ইমারতে যেমন চুনকাম ধরে না, তেমনি ফাঁপে ফোলে না এদের ভাগ্যের জোয়ার। একটু তরতর করেই আবার আসে বন্যার ভাঁটা—দুর্বার গতি, ঠেকান দায় অনুকম্পার দানে।

একদিন কিরণ এসে বলল, 'মাধব কাকাকে দেখলাম।'

'কোথায় ?' তেমন কিছু ঔৎসুক্য বোধ না করলেও ঊর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ?'

'ডালহৌসি স্কোয়ারে—ঠিক মাধব কাকাই যেন।'

এইবার হাতের সেলাইয়ের কাজ রেখে ঊর্মিলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। 'তার মানে ?'

'হ্যাঁ বৌদি, ঠিক অমনি একজন, একই রকম দেখতে—হুবহু মাধব কাকাই। চেনার কি জো আছে। পরণে শতচ্ছিন্ন কালি-কুষ্ঠি কাপড়, মুখে বড় বড় দাড়ি গোঁফ। পুলিশে কমিনিষ্ট বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'বল কি, মাধব ন্যায়রত্ন হলেন কমিউনিষ্ট! আমি যত দূর জানি তাঁকে তো অতি সাধারণ সুবিধাবাদী বলেই জানি।'

'আমি ও তো জানতাম তাই-ই।'

'কিন্তু পুলিশে ঠাহর করল কমিউনিষ্ট!'

'হাতে নাকি বোমা পেয়েছে, ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন লালদিঘির নিষিদ্ধ এলাকায় সংগে আরও কয়েকজনকে নিয়ে।'

উর্মিলা প্রথম চিন্তা করে কিছু স্থির করতে পারল না—কি করে একজন সাধারণ ব্যক্তি হঠাৎ অসাধারণ হয়ে ওঠে? তারপর বুঝল, এখন আর কিছুই অসম্ভব নয়। আঘাতে আঘাতে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়। মাধবের বেশবাসের বর্ণনাও মনে পড়ল উর্মিলার। এ বেশ কোন স্বাভাবিক মানুষের নয়। সমাজচ্যুত ক্লিষ্ট নিষ্পেষিত জীবনেরই পরিণাম।

'মাধব কাকার তো কোনও ঐতিহ্যও নেই, বিপ্লবীর পিছনে তো একটা পটভূমিও থাকা চাই।' কিরণ বলল।

'ঐতিহ্য এবং পটভূমি তৈরী হতে ভাই আজকাল আর দীর্ঘ সময় লাগে না, রাতারাতি মানুষ বদলে যেতে পারে।'

'কি করে বুঝলে?'

'জীবন দিয়ে।'

ধীরে ধীরে বলল উর্মিলা, কিন্তু বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারল না কিরণ। 'কি বললে বৌদি, জীবন দিয়ে? তবে কি তুমিও বিপ্লব করবে?'

'কে জানে ভাই মুহূর্তে মন বদলায়, মত ও পথ ভিন্ন হয়।' একটু যেন হাসির আভা দেখা গেল উর্মিলার মুখে।

এ কিসের এবং কোন বিপ্লবের হাসি? ধ্বংসের না নবতম সৃষ্টির? মূর্খের মত চেয়ে থাকে কিরণ। হাজারও জিজ্ঞাসা এসে ভিড় করে তার মনে কিন্তু উর্মিলার কাছে আর বেশী কিছু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। সে আপন মনে বলে, 'মাধব কাকাকে ঠিক চিনলাম না, ভীড় ঠেলে যেতেই পারলাম না ভিতরে।'

'তা না পার, কিন্তু একজন যে সংঘ গড়ে বিদ্রোহ করেছে এ তো সত্যি?'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে জবাব দিল কিরণ—যেন বিপ্লবকে অনুমোদন করিয়ে নিল উর্মিলা।

কিরণ একটা সামান্য বিছানার বাণ্ডিলে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল। ভীড় ঠেলে সে একবারটি যদি ভিতরে গিয়ে দেখে আসত!

উর্মিলা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'মাধব কাকা কেন এমন হলেন বলতে পার?'

'উনি তো নিঃসন্দেহে মাধব কাকা নন।'

'তা না হক, জীবনপণ করে তো গিয়েছেন তেমনি যে কোনও একজন। আমার না হয় ধরে নিলাম মাধব কাকাই। কিন্তু কেন তাঁর এ বিচার বুদ্ধি জন্মাল? কেন তিনি ভেবে নিলেন এ ছাড়া গত্যন্তর নেই?'

'অতটা আমি চিন্তা করিনি।'

'কিন্তু অপরাধী তো ভাবতে পার। ধরে নিয়ে আটক করতে পার জেলে। ওঁর মর্মবেদনা তো অনুভব করবে না—একটু হলেই দেবে ফাঁসী কাঠে তুলে।'

কিরণ লেখাপড়া শিখে সাধারণ ভাল পথেই গতানুগতিক নিয়মে চলতে শিখেছে—এই কংগ্রেস, রিলিফ, দেশসেবা, আর উর্মিলা তেমন লেখাপড়া না জানলেও অসাধারণ চিন্তা শক্তির জোরে, বংশের ঐতিহ্যের বলে পেয়েছে নতুন পথ। তাই বারম্বার সংঘাত হচ্ছে। কিরণ এ সংঘাতের সুমুখে ঠিক দাঁড়াতে পারছ না।

'কি মর্ম বেদনায় মাধব কাকা এমন হলেন বৌদি?'

'মাধব কাকা কেন, সমস্ত বাস্তহারা, যারা সর্বহারা হল, তাদের যতই রিলিফ দাও না কেন, তারা একদিন প্রত্যেকেই মাধব কাকার মত হয়ে দাঁড়াবে। তখন তোমরা বলবে, দেখ দেখ এরা কেমন বেইমান?' একটু থেমে উর্মিলা বলল, 'সবাই আর মরছে না এই বিভাগের যান্ত্রিক চাপে।'

কিরণ মহা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বোমা বন্দুক নিয়ে বিদ্রোহ করবে?'

অমনি উর্মিলা উত্তর দিল হয়ত ব্যংগচ্ছলে, 'না না ভয় পেও না, বিড়াল তপস্বী হয়ে করতে বলব মাত্র গোটা ত্রিশেক উপোস, আমরা অবশ্য বলব অনশন!'

'তুমি কি প্রহসন বলে মনে কর এই মহা আত্মশুদ্ধি তথা পরশুদ্ধিকে বৌদি?'

'জগতের সবাই মনে করে, আমার মত মানুষের কথার দামই বা কী!'

ক্ষুন্ন হয়ে কিরণ চুপ করে থাকে। যারা এর মাহাত্ম্য না উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের বোঝান অসম্ভব। এ যে আধ্যাত্মিক ভারতের কী সম্পদ!

উর্মিলা রোদ খাওয়ান কতকগুলো ছেঁড়া কাপড় ভাঁজ করে রাখল। ছেলে দুটি

এসে কি যেন খেলনা চেয়ে নিয়ে গেল। একটা বাবুই হাঁপাচ্ছে কিরণের দিকে চেয়ে। রৌদ্র বেশ প্রখর হয়েছে বসন্তের আগমনে।

'তারপর যা জিজ্ঞাসা করলে তার তো উত্তর শুনলে না?'

'বললে কই?' অনিচ্ছা থাকলেও কিরণ আগ্রহ দেখাল কেন জানি। কি জন্য যেন সে উঠেও বসল সোজা হয়ে।

'মানুষ যখন অত্যাচারে অবিচারে নীচের ধাপে নেমে আসে, তখন সে চোখ খুলে দেখে যে একেবারে বিভিন্ন শিবিরে এসে পড়েছে।' উর্মিলা হাতের কাজ বন্ধ করে বলতে লাগল, 'ধ্বংসের মুখে এলেই মানুষের প্রাণ-কামনা এত উগ্র হয়ে ওঠে যে তা তোমাকে বোঝান দায়। সে তখন ঐ শিবিরে বসে সংঘ গড়ে—আপাতত যে শক্তি মৃত বলে মনে হয় তা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। তখন তারা মাধব কাকার মত আত্মহারা হয়ে পড়ে।'

কিরণ আবার জিজ্ঞাসা করল চোখ কপালে তুলে, 'বোমা বন্দুক নিয়ে?'

উর্মিলা আশ্বাস দিল, 'না হে, না—আমি বলে দেব উপোস করতে—তবে আমার কথা শুনলে হয় তারা!'

কিরণ এবারও লজ্জা পেল তার অহেতুক উত্তেজনার দরুণ। কথা জমলা না তখন। আর কি যেন পীড়াদায়ক একটা বস্তু এসে ওদের দুজনার মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু একটু পরেই উর্মিলা আবার সুরু করল, 'দলিত মানুষের কি যে দুর্বার বাঁচার আকাংখা, যারা পিষ্ট করছে তা তারা বোঝে না। দাদার মুখেই শুনেছি, তারা নাকি অন্ধকারে [illegible] গাপনে একত্র হত, পরামর্শ করত, শপথ গ্রহণ করত এই বন্দী মানবের মুক্তির। বৈপ্লবীক সংঘ ছাড়া কিছুই হয় না কিরণ—মাধব কাকা ভুল বোঝেন নি।'

'আমাদের দেশ তো এখন মুক্ত বৌদি, এখন করে যেতে হবে শুধু সংগঠন। বিপ্লবের প্রয়োজন তো ফুরিয়েছে ইংরেজ শাসনের অবসানের সংগে সংগেই।'

'আমার দেশ তোমার দেশ—সমস্ত মানুষের দেশ কি মুক্ত হয়েছে? দাদার শেষ উপলব্ধি সন্ত্রাসবাদ নয়, সমগ্র মানব চৈতন্যের নিরংকুশ মুক্তি, তা কি আমরা অর্জন করেছি? তবে এত দুঃখ, এত হাহাকার কেন চারদিকে? কেন কাঁদে চাঁপা, মাধবী, ইসমাইল, আলেয়া! তুমি কি তাদের কান্না শুনতে পাও না? তুমি কি বধির হয়েছ ঠাকুর পো?'

নিজের অন্তরের কথা কিছুই বলে না উর্মিলা। তার বুকে কান্না না দশাননের চিতা তা বুঝতেই পারে না কিরণ। কিন্তু অনুমান করতে পারে একটা কিছু যার তুলনা মেলা কঠিন।

কিরণ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে, 'তবে কি তুমি মাধব কাকার মত হতে বলছ সবাইকে? ওটা যে রাজদ্রোহিতা!'

'অভাব জানান এবং তার প্রতিকার করা যদি রাজদ্রোহিতা হয়, তবে তুমি আমি উত্তম অধম আজ কে না রাজদ্রোহী? মাধব কাকা না হয় চরম পর্যায় উঠেছেন, তুমি আমি তো পড়েই এখনও মার খাচ্ছি। এ স্বাধীনতার স্বাদ কেমন লাগছে কিরণ?'

উর্মিলার কথাগুলো যেন অগ্নিময় বেত্রদণ্ডের মত কিরণের বুকে এসে পড়ে। সে মহা মৌন হয়ে চিন্তার সমুদ্রে ডুবে যায়। কখন যেন অন্ধকার এসে গ্রাস করে ক্যাম্প, মাঠ, সমস্ত তল্লাটটা। কিরণ চিন্তা করতে করতে অন্ধকারে নিজের বুক ভিজিয়ে ফেলে। এ তারা করেছে কি?

বিদায়ের সময় উর্মিলা বলে, 'দুরন্ত খরস্রোতা ভাঙনের মোহানায় ঐ মাধব কাকারাই একমাত্র ব-দ্বীপ। কিন্তু তাকে তো চিনলে না কিরণ!'

'বড্ড ভুল হয়ে গেছে বৌদি, যদি ভীড় ঠেলে ভিতরে যেতাম!'

(২৫)

এক একদিন কিরণ খাটতে খাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার ঐকান্তিকতার তো অভাব নেই।

খোকন এখন বাধ্য হয়েছে। সে পরিশ্রান্ত কিরণের কাছে এগিয়ে আসে একটা ভাঙা পাখা নিয়ে। বিনিময়ে কিছু আহার্য নিয়ে কিরণের কাছে বসে খায়, বিলায় নীতুকে ডেকে।

খোকনকে জয় করেই কিরণের মনে একটা চরম দুরাশা জন্মে। সে কি শুধু ব্যর্থতার ইতিকথা রচনা করে যাবে? একটি লোকেরও পুনর্বাসনের ক্ষমতা কি তার নেই? সে তার শ্রম বল অর্থ দিয়ে কিছুই কি করতে পারে না?

উর্মিলার কাছে কোন প্রস্তাব করাই যে দুরূহ। তাকে ভাল করেই চেনে কিরণ—চিনত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাধবীকেও।

হঠাৎ ললিত মারা যায়। ভাতের অভাব হলেও কাঠের অভাব ছিল না মিলিটারী পরিত্যক্ত ক্যাম্পে। রক্তশূন্য হাত পা ফোলা জ'লো রোগীও দেখতে দেখতে জ্বলে যায়। শুক্‌নো বারুদের মত কাঠের কাছে ঘৃত চন্দন লাগে না।

ললিত মরার সংগে সংগেই উধাও হয় রাণীবালা—তার ষোড়শী কন্যা।

দিন কয়েক একটা আলোচনা শোনা যায়। তারপর আবার সব ঠিক—ঠিকঠাক রিপোর্ট যায়, ঠিক মত রেশন ঘাটতি হয়ে আসে দুজনার।

ক্যাম্প ভাঙে আরও খানিকটা ··

শিশু এবং প্রসূতি কমেছে কয়েকজন।

সময় মতই কিরণ সংবাদ পাঠায়, জরুরী নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সে সবই করে। তবে কি যেন গলদের দোষে ডাক্তার আসে কূর্ম পৃষ্ঠে চড়ে—অর্থাৎ রোগীর সংগে সাক্ষাৎ হয় শ্মশানে।

'বড়ই দুঃখের বিষয় কিরণ বাবু।' ডাক্তার মন্তব্য করে।

'তার চেয়েও দুঃখের বিষয় সরকারের। এত খরচা করেও ভেবে দেখুন তার অবস্থাটা জনসাধারণের চোখে কি।'

'অফকোর্স, অফকোর্স্! কিন্তু আমারও এরিয়াটা একবার লক্ষ্য করুন!'

'তা তো আমার দেখার কথা নয়। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি। লোকে আমাদের কি বলবে বলুন তো?'

'দ্যাটস্ রাইট, দ্যাটস্ রাইট! এ কথা সত্য, কিন্তু গলদ কোথায় তা আপনিও ধরতে পারছেন না, আর আমি জানলেও বলতে পারছিনে।'

কিরণ ডাক্তারের মুখে দিকে তাকিয়ে থাকে। 'সব বিষয়ে একটা সৎ ইচ্ছা থাকা চাই।'

'সে প্রতিশ্রুতি না দিলে কি চাকরী পেয়েছি? আই স্যাল স্পেয়ার নো পেইনস্ · '

'সে কথার তো কোন মর্যাদা রাখেন নি।'

'আর শরীরে কুলায় না মশাই। মর্যাদা বোধ টাটকা টাটকা খুবই ছিল, এই প্রথম বয়সে, আপনাদের মত সময়। সত্যি বলতে গেলে কি এখন সব মিয়িয়ে গেছে। বক্‌সি আমার চেয়ে ঢের জুনিয়ার,—কিন্তু ডিঙিয়ে গেল সিনিয়ার হয়ে। খাটুনীর জোরে নয়, তদ্বিরের জোরে।'

আর কিছু বলতেও ইচ্ছা করল না কিরণের। বলবে কি বিষয় নিয়ে? দুই

ক্ষতে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটাই তো বিকল। ওই যন্ত্রটা ইংরেজের সৃষ্ট—কিছুতেই হিতৈষী হতে পারে না ভারতবাসীর কাছে, ওটার আমূল পরিবর্তন না হলে।

তবু কিরণ ভাবে এতগুলো মানুষের ভার সে নিতে পারে না—দায়িত্ব নিতে চায় শুধু একটি ফুল ও দুটি কুঁড়ির! মরুভূমি থেকে কুড়িয়ে এনে রোপন করতে চায় সরস মৃত্তিকায়। তাপ ও শাপমুক্তির জাগে চরম দুরাশা। সে বুঝতে পারে জীবিত অবস্থায় মাধবীকে ভাল যতটা বাসুক আর না-ই বাসুক এখন অন্তর জ্বলছে তুষের আগুনে। সে দাহ নির্বানের একমাত্র পথ এই ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করা!

ভাঙা ক্যাম্পের ফাঁক দিয়ে চৈত্রের মাতাল হাওয়া ঢোকে। বন্ধ দুয়ার সময় মত উন্মুক্ত হয়ে যায়। যারা আছে তারা হাওয়া খায়। কারুর কারুর ঝিম আসে, কারুর কারুর বা পা কাঁপায়।

এক রকম কেটে যায় দিন।

উর্মিলা যেন একটু বিকশিত হয়ে উঠেছে! কিরণ সানন্দে লক্ষ্য করে তার পরিবর্তন। এখন উর্মিলা অনায়াসে নির্ভর করতে চায় যেন কিরণের ওপর। উর্মিলার পরম দায়িত্বের অংশীদার হতে তো কিরণ সর্বদাই উন্মুখ।

নীতু খোকনের দিকে চেয়ে উর্মিলা ভাবে, স্বামীর বংশের ঐ তো শেষ চিহ্ন!

যত আসা যাওয়া বাড়ে, যত আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তত পূর্বের সম্মান ও সমীহের ভ্রাতৃবধু ক্রমান্বয় হয়ে ওঠে আপনার জন। কিরণ এখন ভক্তি করার চাইতেও ভালবাসে বেশী।

উর্মিলা রূপসী ছিল। কিন্তু এখানে এসে তার রূপে যেন একটা আশ্চর্য আভা লাগছে দিন দিন। এর হেতু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কিরণ। সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সময় সময় চেয়ে থাকে। উর্মিলা গম্ভীর ভাবে চোখ নামিয়ে নেয়।

চৈত্রের শেষে এলো যেন কাল বৈশাখী—দুর্বার ঝড়।

ঝড় নয়, দেখা দিল বসন্তের জ্বর।

টিকা দিতে না দিতেই তিন চার জন কাত হলো। বাকী ক্যাম্পটা ভয়ে ভয়ে ভেঙে গেল। ভাল মন্দ বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা কেউ করল না। ছুটল সহরের দিকে, আশ্রয় নেবে উন্মুক্ত আকাশের তলে—ফুটপাতে, নয়ত যে যেখানে পারে

'কিরণ কিছু আর জিজ্ঞাসা করার নেই—ওদের বাঁচাতে হবে।'

'তবে কলকাতা চলো। আমি অনেক আগেই একটা বাসা ভাড়া করে রেখেছি। এমনি একটা আশংকাও ছিল আমার মনে।'

'তুমি বুদ্ধিমান।'

'তোমার জন্য একখানা শাড়ী এনেছিলাম বৌদি।'

'দাও তাড়াতাড়ি। আমার আর দেরী করতে সাহস হয় না।' অনেক দিন বাদে উর্মিলা গলিত বাস ত্যাগ কবল।

একখানা জিপ গাড়ীতে উঠল চার জন। উর্মিলাকে শক্ত করে ধরে রইল নীতু ও খোকন।

কর্মব্যস্ত সহরে এসে সবাই যেন একটু সজীবতা বোধ করল। নীতু খোকন নানা প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তুলল কিরণকে।

'মামা আমরা কিন্তু আর ক্যাম্পে যাব না।'

'না আর যেতে হবে না।'

নীতু বলল, 'ভূতের বাড়ী।'

খোকন বলল, 'নারে, মিলিটারী বাঁদরের বাসা।'

ড্রাইভারটি হাসল খোকনের মন্তব্যে। আজকাল ছেলে ছোকরাদেরও আশ্চর্য জ্ঞান হয়েছে। বুঝতে পারে সবই। সর্বদা যে আলোচনা কানে যায়, যে অসন্তোষ ছাইচাপা আগুনের মত জনজীবনে জ্বলছে অহর্নিশি তার উত্তাপ ওরাই বা এড়াবে কি করে?

নানা রাস্তা ঘুরে মোটর ছুটে চলেছে। · বড় বড় বাড়ী রাস্তা ঘর কয়েক মুহূর্তেই পিছিয়ে সরে যাচ্ছে। দুপাশের দোকান পসারের দিকে তাকালে বোঝা যায় না যে এখানে কোন দারিদ্র আছে। যত দুঃখ ও অভাব যেন পুঞ্জীভূত হয়েছিল ক্যাম্পে। রোগে নিয়মিত ঔষধ নেই, ক্ষুধায় পরিমিত খাদ্য নেই, স্ত্রীলোকের লজ্জা নিবারণের উপায় বিঘ্ন-সংকুল—তবু রাজকীয় নাটকীয় প্রহসন চলেছে। শুধু বাঙলায় নয়, দিল্লীতে নয়, করাচীতেও।

উর্মিলা সমস্ত সংবাদই রাখত, মন্তব্য করল, 'দেখলে তো কিরণ, কেমন চমৎকার আমাদের সমস্যাটা মীমাংসা হল! তোমরা গলদ ঘর্ম হয়েছিলে বিধাতা সাহায্য করল।'

কিরণ অতি বিনীতভাবে বলল, 'এ বিরাট সমস্যাটা শুধু ব্যংগ করে কি সমাধান করা চলে?'

এই কিছুদিন পূর্ব্বে পাঞ্জাবও ভেঙেছে—ভেঙেছে নিদারুণভাবে। পঞ্চ নদের জলধারা পরিণত হয়েছিল হিন্দুমুসলিম রক্তধারায়। ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হয়েছে এ ওর কলিজায় ছুরি মেরে। সব কথাই কানে এসেছে উর্মিলার। সে চুলচেরা ভুল বিচারে বসে না—কে আগে আঘাত হেনেছে, অথবা কে পরে নিয়েছে প্রতিশোধ। কতগুলি হিন্দুর বাড়ী পুড়ল অথবা কতগুলো মুসলমানের মসজিদ ধ্বংস হল সে সংখ্যার গাণিতিক হিসাবও সে সংগ্রহে ব্যাকুল নয়। ব্যাকুল হয়েছে পথভ্রষ্ট কীটদষ্ট প্রাণবন্ত মানুষের হাহাকারে। এ কি আর্তরোলে ছেয়ে গেল সারা ভারতবর্ষ? গগন পবন হলো মুখরিত স্ত্রী বৃদ্ধ বালিকার ক্রন্দনে!

মন্নু সরিফ তো উভয় সম্প্রদায়েই আছে, কিন্তু তাদের ধরে আনবে কে, কে করবে বিচার? কারুর পাপ বা পনরআনী কারুর বা ঠিকঠাক একেবারে একভরি।

একটা হকার ডেকে বলল, 'গুলি চল্ রহা হ্যায়...গুলি...'

কোথায়? জীপ থামালো ড্রাইভার।

কিরণও মুখ বের করে প্রশ্ন করল, 'কোন রাস্তা মে?'

হকার জবাব দিল যে রাস্তায় নয় - কাগজে অর্থাৎ করাচীতে।

একখানা কাগজ তাড়াতাড়ি কিনল কিরণ। 'মুসলিম রিফিউজিদের ওপর গুলি চালাচ্ছে নাকি পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট।'

উর্মিলা বলল, 'অতি চমৎকার সংবাদ। একটু আনন্দ হচ্ছে, না কিরণ? কী সুন্দর মীমাংসা!'

জীপ আবার চলতে লাগল সুমুখের দিকে।

'বৌদি জটিল সমস্যা—এর সমাধান...'

'অত সহজ নয়, কি বল? ইংরেজও তো তা চায় না।'

বিস্মিত হয়ে কিরণ প্রশ্ন করে, 'ইংরেজ, সারা ভারতে এখন আর ইংরেজের কি আছে?'

'দাদা তো বলতেন সবই রয়েছে—পাকিস্তানেও নাকি খুঁটি পুতছে ইংগমার্কিন মিলিত স্বার্থ। তোমরা মিলে গেলে ওরা রস শুষবে কি করে?'

'একথা কংগ্রেস বিশ্বাস করে না।'

'পাকিস্তানও স্বীকার করবে না কিরণ। এ স্বীকৃতিতে তো কোন পৌরুষ নেই। কিন্তু নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে উভয় রাষ্ট্রকেই।'

'এইবার তুমি হাসালে বৌদি, হাসালে মেয়েলী ব্যাখ্যা করে।'

হঠাৎ উর্মিলার চোখমুখে রক্ত উছলে ওঠে। সহস্র বৃশ্চিকে যেন দংশন করছে হৃদপিণ্ড। 'চুপ কর, হেসো না নির্লজ্জের মত।'

তখন আর কথা হয় না। গাড়ী চলেছে বেশ বেগে ছুটে। পথঘাট দোকান পসার ছবির মত সরে যাচ্ছে। কিরণ মহা সংকুচিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বসে থাকে। এ কি জাতের মেয়েমানুষ? এর অন্তঃস্তলের খবর পাওয়া অতি সুকঠিন। কিসে কখন ক্ষেপে ওঠে বোঝা দায়। এ যেন সাগরের মতই ব্যাপ্ত, মহা সমুদ্রের মতই সুগভীর। এর আদি অন্ত কবে পাবে কিরণ?

একটা দগ্ধ বিধ্বস্ত বস্তির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল মোটর। এখন চলল বেশ ধীরে ধীরে। পথের দু'দিকে সারবন্দী সব পোড়া কাঠ, খোলা খাপরা, খাটিয়া চৌকি, বাসনপত্র আরও কত কি!

উর্মিলা যেন রীতিমত অস্বস্তিবোধ করছে। একটু যেন ঘামিয়েও উঠেছে সে। হয়ত রৌদ্র, নয়ত পথ ক্লান্তি—ঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিরণ তাই এতটুকু হয়ে থাকে!

ওদের মোটর দেখে একদল ভবঘুরে থামল—থামল যেন ভয়ে ভয়ে—সবিনয়ে। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—এরা কস্মিনকালেও ভবঘুরে ছিল না। লীলাময়দের ইচ্ছায় এখন এরা সর্বস্বান্ত হয়ে চলেছে পাকিস্তানে। উর্মিলারা এসেছিল নৌকায়, এরা চলেছে এখন হেঁটে। সংগে তেমনি লটবহরা, মুখে তেমনি আতংকের কষাঘাত। বুকে যে কি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে তলিয়ে না দেখাই ভাল! ভাগ্যের কি পরিহাস, যে লীগ কাজ হাসিল করে নিয়ে সরে পড়েছে, সেই লীগেরই আশ্রয় নিতে চলেছে ওরা।

মোটর ঘুরে চলল—আর একটু দূর, মাত্র কয়েক গজ—ওরা মিছামিছি হাত তুলে সেলাম জানাল।

স্বাধীনতার এ সম্মান প্রাপ্তি কিরণকেও বিদ্ধ করল।

'কিরণ ওদের এবং আমাদের ভিতর পার্থক্য কি? আমারাও এসেছি যেমন জেনে শুনে দায় ঠেকে - ওরাও তো যাচ্ছে তেমনি!'

'তা ঠিক বৌদি।' একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে কিরণ।

বেশ বড় একখানা বাড়ীর স্থমুখে এসে গাড়ী থামল। চতুর্দিকে বাগান—দেয়াল ফেরান খুব উঁচু করে। আভিজাত্য ও পারিপাট্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। রেলিং কার্নিশগুলিতেও নানা সূক্ষ্ম কাজ করা। কিন্তু কোন মানুষ নেই নিকটে। আশপাশে বস্তির কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে—স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মনুষ্য বসতির।

'এখানা কি আমাদের বাড়ী? নীতু জিজ্ঞাসা করল, 'মামা, এখন থেকে কি আমরা এখানে থাকব?'

হ্যাঁ, তোমাদের জন্যই তো এসব।'

'মা দেখছ কেমন স্থন্দর দুটো কামিনী ফুলের গাছ? একটা দোলনা বাঁধব আমি খোকনের জন্য।' একখানা পরিত্যক্ত বাড়ী কি করে যেন কিরণ ভাড়া নিয়েছে। স্থমুখে একটা স্থন্দর ফোয়ারা। জল নেই, কিন্তু চিহ্ন আছে জৌলুসের। দেখলে মনে হয় কিরণ যেন রাতারাতি বড় লোক হয়েছে। একটা আম গাছ আছে ঘন পত্র বহুল।

'কিরণ, আমাদের বাড়ীর গাছটাও ঠিক এমনি ছিল তোমার মনে আছে—উঠানের বড় গাছটার কথা?'

'থাকবে না কেন? সব মনে আছে—এ আর কদিনের কথা!'

'আগুনের তেজে সেটা ঝলসে গেছে।' এর আগে আর বাড়ীর কথা এমন করে বলেনি উর্মিলা। কিরণও ইচ্ছা থাকলে কিছু প্রশ্ন করতে পারে নি। সে উৎকর্ণ হয়ে রইল, আর কি কি বলে উর্মিলা তা শোনার জন্য। সে বুঝতে পারল গাছের ছাল এবং পাতার চাইতে ঢের বেশী মনের ত্বক জলে ঝলসে গেছে উর্মিলার। যা প্রকাশ করার তা করুক, একটু উপশম হবে দাহ।

'বড় ঘরখানার কাঠ বারুদের মত হয়েছিল শুকিয়ে—সে যে কী আগুন!' একটু চোখ বুজল উর্মিলা।

ক্রম বরে এলো—কয়েকটা চত্বরের প্রস্তর

কয়েকটা সিঁড়ি।

'এ পরিত্যক্ত বাড়ীটা তো ছিল এক মুসলমানের?'

'হ্যাঁ বৌদি—আমি ভাড়া নিয়েছি।'

'এ বাড়ীটা কি সহজে কেউ ভাড়া দেয়? এ তো বাদসার মঞ্জিল। যারা

এসব ছেড়ে গেছে তারা প্রাণে বেঁচে থাকলেও তো মনে মনে নিশ্চয় মরে গেছে। কী পাপই যে করেছিলাম আমরা! এরা কি কেউ বেঁচে নেই! আবার ফিরে আসবে না?'

'আসবে—সেই চেষ্টাই তো আমরা সবাই করছি। এলে তখন এ বাড়ী দেব ছেড়ে।'

'তোমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না বুঝি?'

'হ্যাঁ, হবে হয়ত।'

'কিরণ বিশ্বাস ফিরিয়ে আন, নইলে আরও সর্বনাশ। পূর্ব বাঙলার দেড় কোটি ঘর শুধু জ্বলে এ আগুন নিববে না—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সব কখানা ঘর পুড়ে ছাই হবে। দাদার মুখে সব শুনেছি, হনুমান খেদাও নইলে ধ্বংস হবে কনক লংকা। এখনও কি শ্বেত এবং স্বার্থবাদী হনুমান চেনো নি?'

এত বড় বাড়ী দেখেও যে উর্মিলা সন্তুষ্ট হলো না কিরণ তা বেশ ভাল করেই বুঝল এবং দুঃখ হলো তার। সে ভারাক্রান্ত মনে এগিয়ে চলল ভিতরের দিকে। তার তো কোন দোষ নেই, সে ন্যায্য ভাড়া দিয়ে বাড়ীতে উঠেছে।

সিঁড়ি ভেঙে সকলে ওপরে উঠতে লাগল। একখানা ঘর পার হয়ে চলল পশ্চিম দিকে। নীতু ও খোকন একটু এগিয়ে গেল। 'ও কি মামা?' নীতু জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি? আগুন?' সে খোকনকে টেনে নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এলো।

দেওয়ালের লাল কাঁচে সূর্য রশ্মি পড়ে জ্বলজ্বল করছে—ঠিক অগ্নি বলে ভ্রম হয়।

কিরণ সভয়ে প্রশ্ন করল, 'কই আগুন? ওতো কাঁচে আলো পড়েছে।'

'কিন্তু কেমন করে ঝলসে গেল চৌকাঠ? কপাট কোথায় কিরণ?' উর্মিলা প্রশ্ন করল তীব্র স্বরে, 'মানুষ কই?'

'হয়ত রায়টের সময়…'

'তোমরা পুড়িয়েছ? 'প্রতিশোধ নিয়েছ সংখ্যা লঘুর ওপর?'

'আমাকে মিছামিছি গঞ্জনা দিচ্ছ কেন বৌদি?'

'দাংগা করে নিষ্কৃতি চাইছ?'

'আমরা তো কোন কুকার্যে লিপ্ত ছিলাম না।'

'হাতে কলমে না থাকলেও মনে মনে অশুদ্ধ ছিলে তো?'

কিরণ একটু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। 'সত্য বলতে গেলে কি, হয়ত ছিলাম।'

'কাদের ওপর আক্রোশ করে এত বড় মনুষ্য নিধন যজ্ঞের আহুতি এগিয়ে জুগিয়ে দিলে ?'

'যারা আমাদের মেরেছে—মুসলমানেরা।'

'চিন্তা করে দেখ কিরণ, তারা দায়ী, না তাদের ধর্ম দায়ী, না তাদের নাম ভাঙিয়ে যারা মোড়লী করছে তারা ? তোমার চেয়ে এমন লোক হয়ত বহু আছে যার ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। কই সে তো ইসমাইল, রকমান, আম্মা, আলেয়াকে আজও শত্রু বলে ভাবতে পারছে না। সভ্যতার শত্রুকে আর একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে খুঁজে বের কর, তারপর তাকে দুর্জয় আঘাত হান—নির্বিচারে মের না কেবল নীচু তলার শিশুরমণী অসহায়কে।' তারপর উর্মিলা একটু থেমে, আর খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, 'তোমাকে কিছু বলছিনে – বলছি তোমাকে উপলক্ষ করে দু দলের গুণ্ডাদের। ঐ যে বেদী দেখছ, ওটা মুসলমানদের উপাসনার ঘর।'

'ঘরের ভিতর মসজিদ ?'

'হ্যাঁ—শেষকালে উনিও বিগ্রহশিলা ঘরে এনে রাখতেন। পূজা করতেন নীরবে। দেবতা কলুষিত হয়েছে – আরও কি যে সর্বনাশ হয়েছে কিরণ, তা তোমায় ভেঙে বলতে পারছিনে। তুমি আমাকে যদি ভালবাস তবে এক্ষুণি এই মুহূর্তে এই ছাড়া বাড়ী থেকে নিয়ে চল।' উর্মিলা আর না এগিয়ে ঐখানেই থামল। 'নীতু এবং খোকনের যদি সত্য সত্যই তুমি ভার নিয়ে থাক তবে আমি ক্যাম্পে ফিরে যাই, ক্যাম্পেই আমার থাকা ভাল।'

'ক্যাম্প তো এখন জনশূণ্য, আছে কটি হয়ত রোগী। নীতু ও খোকনকে ফেলে রেখে কি একা কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে বৌদি ? এ যে প্রলাপ উক্তি !'

উর্মিলা খানিক চুপ করে থেকে সুস্থ হতে চেষ্টা করে। তার দেহে ও মনে অনেক জ্বালা—অনেক গ্লানি এই ভারত বিভাগের।

চড়া রৌদ্র ঝিকমিক করছে আকাশে। বাতায়ন পথে দেখা যায় বস্তিটার পোড়া অপাংগে যেন আরও জ্বলুনি বেড়েছে। ধুঁকছে কাঠ, কজ্জা, মাটির দেওয়াল। মানুষশূণ্য ঘিঞ্জি পল্লীটা সহরের বুকে যেন মরুভূমির চেয়েও ভয়াল। কিরণ চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু কোন দিকে সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে ? একদিকে ঐ মুসলমান বস্তি, অন্য দিকে শুব্ধ উর্মিলা। ঘরে বাইরে কোথায়ও যে তার ঠাঁই-

নেই চোখ মেলে তাকাবার! সে কি একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে গেল? এত দেশ সেবা, যৌবনের প্রারম্ভে জেলে খাটা, কত দুঃখ ক্লেশ গ্লানি বরণ করা—সকলই কি ভুল হয়ে গেল?

হঠাৎ উর্মিলা ক্যাম্পের কথা ভুলে কেন, যেন উঠে দাঁড়ায়। সে এগিয়ে চলে ত্রস্তে বাস্তে।

উর্মিলাকে অনুসরণ করে কিরণ ও খোকন এবং নীতু মহা ঔৎসুক্যে। কয়েকটা কোঠা ওরা পেরিয়ে যায়। এ বাড়ীতে যেন একটা খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে। দৈত্য দানবের তাণ্ডবলীলার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে চারদিকে। বড় বড় মেহগনী ও সেগুন কাঠের আসবাব সব ওলটান, ভাঙা, বিক্ষিপ্ত। একটা লোহার সিন্দুক হাঁ করা রয়েছে সিঁড়ি পথে।

'কিরণ এসব কি?'

'আমি তো জানি নে।' কিরণ মনে মনে বিরক্ত হয়—বারবার এক কথা।

'না জানারই বিষয়। তোমরা কত শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ!'

কিরণ একটা জবাব দেবে ভাবল - আবার ভাবল, না থাক। উত্তরে হয়ত একটা কঠিন কথাই শুনতে হবে। উর্মিলা যেমন স্পষ্টবাদিনী, তাকে খোঁচালে ঘরের কথা আরও ফাঁস হয়ে যাবে। সুমুখে প্রাঞ্জল প্রমাণ পড়ে রয়েছে—এ মামলা থেকে কিছুতেই কেউ এড়াতে পারবে না। উর্মিলা একে একে তর্কের দড়িতে হাত পা বেঁধে আসামীর কাঠ গোড়ায় দাঁড় করাবে সবাইকে।

শোনা যায় অনভিজ্ঞ একদল বিজ্ঞ বলে, পূর্ব বাঙলায় দাংগা হয়েছে হিন্দু বর্দ্ধিষ্ণুদের মর্মান্তিক অত্যাচারে ও শোষণে। তাই যদি সত্য হয় তবে পাইকারী ভাবে পূর্ব বাঙলার অধিবাসীরা কেন করল বাস্তুত্যাগ—বামা ধোপা, শ্যামা শীল কি ছিল ওদেশের বর্দ্ধিষ্ণুদের এক পর্যায়? তাই যদি সত্য হয়, পশ্চিম বাঙলায় মুসলমানরা কি বর্দ্ধিষ্ণু? ঐ বস্তির মুসলমানরা—যারা দিন আনে, দিন খায়। যারা খাজনা ট্যাক্স দিয়ে মরে, কিন্তু পৌরপ্রতিষ্ঠানের আলো জলের জন্য সর্বদাই করে হাহাকার। যাদের আসল পরিচয় হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়—দীন দরিদ্র অপাংক্তেয় অতি সাধারণ।

কিরণ চুপ করে এগিয়ে চলে।

একটা মর্মস্পর্শী চীৎকার শোনা যায়। একটি মেয়ে ছুটে পালিয়ে যায় এমন-ভাবে যেন সে শার্দুলের গ্রাসে পড়েছিল। মেয়েটির পরণে ছিন্ন ভিন্ন পায়জামা,

গায় একখানা গলিত ওড়না জড়ান। দেখে মনে হয় মেয়েটি ঠিক যেন বাঙলা দেশের মেয়ে নয়।

কিরণ চমকে উঠল। যত অসূর্যম্পশ্যাই হক, হক যত পর্দানসিনা, মানুষ কেন পালাবে এমন করে মানুষ দেখে? রক্ত মাংস মেদমজ্জায় এমন কি পার্থক্য থাকতে পারে যে একে অপরকে দেখে ভয়ে শংকায় বিমূঢ় হয়ে পড়বে?

'বৌদি!'

'তুমি বুঝবে না কিরণ—আমি হাড়ে হাড়ে অনুমান করতে পারছি। খোকন এবং নীতুকে নিয়ে তুমি এখানে দাঁড়াও, ভিতর থেকে আমি ব্যাপারটা বুঝে আসি। মনে হয় মেয়েটি পাঞ্জাবী। দেখছ না কেমন বলিষ্ঠ গঠন। আর পাঞ্জাবী যদি হয় তবে নিঃসন্দেহে পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দু এলাকার লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মেয়ে '

'তুমি এত কথা অনুমান করলে কি করে বৌদি?'

উর্মিলা জবাব দিয়ে আর সময় নষ্ট করল না। সে সকলই অনুধাবণ করেছে অন্তর দিয়ে। কি নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা যে তার হয়েছে! কিরণকে সে বলতে পারে না, সন্তানের কাছেও বলা চলে না, এ বেদনা জানান যায় না সমাজপতিদের কাছে। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী পুরুষের কলংকের এ গ্লানি আজও বহন করে চলেছে নারী। আরও কত কোটি বছর পরে যে মানুষ সত্যিকারের সভ্য হবে! নইলে একই ইতিকথার পুনরাবৃত্তি হবে মাঝে মাঝে। উর্মিলা যেন হতাশ হয়ে পড়ে।

কিন্তু সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাও তো পালটে যেতে পারে। উর্মিলার মনে পড়ে তার দাদার আশার বাণী—ভাঙা পারে চরের রাগিণী। একি সেই ভাঙন?

উর্মিলা দ্রুত হেঁটে চলে।

কলকাতা এসে উর্মিলা পাঞ্জাবের ভাঙনের কাহিনী শুনেছে—দম্ভ বীর্য ও অহংকারের কি শোচনীয় সাম্প্রদায়িক পরিণাম—সে মনে মনে খুশী হতে পারি নি। ও যেমন পূর্ব বাঙলার বাঙালীর কলংকের সাক্ষ্য, তেমনি হয়ত ঐ মেয়েটিও পূর্ব পাঞ্জাবের পাঞ্জাবীর গ্লানির আলেখ্য!

হুবহু মিল রয়েছে স্বাধীন দেশের দুটি ভণ্ড বৈরাগীর একতারায়, ভক্ত কি জানে প্রভু যা করায়!

উর্মিলা মনে মনে একটা গভীর সমবেদনা অনুভব ক'রে এগিয়ে যায়।

নীতু ও খোকনের হাত ধরে কিরণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। বাতায়ন পথে দেখা যায় জনমানব শূণ্য দগ্ধ, মুসলিম পল্লীটা। ওদিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে

ভাল লাগে না। সে খানিক পায়চারি করে কক্ষের ভিতর। কিন্তু সেখানেও তো কঠিন স্মৃতি। নিষ্কৃতি নেই এ পরিবেশ থেকে। আবার কি জানি কি সংবাদ নিয়ে আসে উর্মিলা। কিরণের ঘর্মাক্ত সর্ব শরীর আবার ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। সে ঘন ঘন উর্মিলার পথের দিকে তাকায়। যত দেরী হয় ততই তো ভাল। কিন্তু এ ভাবেও তো বেশীক্ষণ কিরণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। যত তীব্র হক, যত কঠোর হক, সে রহস্যের একটা পরিসমাপ্তি চায়।

কিন্তু উর্মিলা তো ফেরে না।

নীতু জিজ্ঞাসা করে, 'মা কোথায় গেল, মামা?'

কিরণ বিরক্ত হয়ে বলে, 'কি জানি।'

খোকন ও নীতু ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিরণ আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার ইচ্ছা করে উর্মিলাকে ডাকতে কিন্তু কেন জানি সাহস হয় না—গলার স্বর গলার ভিতরই আটকে থাকে।

কিছু সময় বাদে কিরণ একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দুঃসাহসে ভর করে সে এগিয়ে যায় খোকন ও নীতুর হাত ধরে।

উর্মিলা নিস্তব্ধ হয়ে একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে দুরু দুরু করে কিরণের প্রাণ। সে শুকনো গলায় প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে, বৌদি?'

হঠাৎ উর্মিলা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয়, 'বজ্রাঘাত হয়েছে। এখন আর প্রশ্ন না করে, তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার ডেকে আন।'

কিরণ এ জবাবের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে কি করবে না করবে কিছু স্থির করতে পারে না। আপনার অজ্ঞাতে বিমূঢ়ের মতই জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

'আবার কেন? তোমার লজ্জা করছে না প্রশ্ন করতে?'

'অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন বৌদি, কি হয়েছে? কিছুই তো বুঝতে পারছি নে আমি।'

'তবে শুনবে, বুঝবে? প্রস্তুত হয়ে নাও।'

'কি বৌদি? কি হয়েছে?'

'তোমরা ঐ মুসলমান মেয়েটির স্তনে দংশন করেছে। দুষ্টক্ষত হয়েছে দাঁতের বিষে—এবার বুঝেছ কিরণ?'

'উঃ কি অসহ্য!' কিরণের বুকে এসে যেন একটা বুলেট লাগে। সে জানালার শিক ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখে অতি কষ্টে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন তার চোখের সামনে ঘুরছে।

কিরণের এ ভাব দেখে এতটুকুও যেন অনুকম্পা হল না উর্মিলা। 'ওকি দাঁড়িয়ে রইলে যে কাপুরুষের মত? যাও ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস একজন—না, তর্ক তুলবে, কে আগে করেছে এবং কে তার পরে জবাব দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।'

অধোমুখে কিরণ বেরিয়ে গেল। 'না বৌদি আমার আর তর্ক করার মুখ নেই।'

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একখানা এ্যাবুলেন্স নিয়ে কিরণ হাজির হল। নিকটে ডাক্তার ছিল না।

উর্মিলা অনেক বুঝিয়ে মেয়েটিকে তুলে দিল গাড়ীতে? সে কি সহজে যেতে রাজী হয়! একজন কি আর একজনের ভাষা সহজে বুঝতে পারে! কিন্তু দরদের নির্ঝরিণী ধারা অনায়াসে উপলব্ধি হয় অপরিচিতার। সে তার মংগলকামিনীর ওপরই যেন নির্ভর করে গাড়ীতে ওঠে। যাওয়ার সময় আলগোছে ওড়না জড়িয়ে, উর্মিলার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে। সে বলতে চায়, উর্মিলা যেন তার খোঁজ খবর নেয়। এ দুনিয়ায় তার তো আপন জন বলে আর কেউ নেই।

গাড়ীখানা চলে গেলে কিরণ জিজ্ঞাসা করে, 'ওর সবাই কি দাংগায় মরেছে বৌদি?'

'তা তো ও সঠিক জানে না।'

'যাক্, আগে ও বেঁচে আসুক, তারপর খোঁজ খবরের চেষ্টা করা যাবে।

'আমি একান্ত অন্তঃকরণে বলি ও যেন বাঁচে না, খোঁজ খবর করে হবে কি? ভাঙা কাঁচ কখনও জোড়া লাগে না—শুধু শুধু খোরাকী হবে খবরের কাগজের, লিষ্টি হবে সরকারের, তাতে কিছু জুড়বে না।'

'বল কি বৌদি! এ গোলমাল কি চিরদিন থাকবে? একদিন উভয় সরকার তাদের ভুল বুঝে অবশ্য এদের স্বস্থানে পৌছে দেবে—দেবে স্ব স্ব গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে।'

দাঁতে দাঁত ঘষে উর্মিলা শুধু মন্তব্য করল, 'মূর্খ!'

কিরণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার যেন সামান্য মূর্খ

শব্দটারই অর্থবোধ হচ্ছে না। সত্য সত্যই ও কথাটা হয়ত সামান্য নয়—বরঞ্চ এত অসামান্য ওর ইংগিত যে তার গভীর প্রদেশ পর্যন্ত কিরণের দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে না। এমন মূর্খকে শুধু মূর্খ ছাড়া আর কি-ই বা বলা চলে।

'কিরণ প্রতিষ্ঠা মানে কি ?'

'তা তো সঠিক জানি নে।'

'কিন্তু বললে তো আবাধে। কাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাও ? এ তো গাছ নয়, দেবালয় নয়—এ যে সর্বকালের সর্বদেশের নারীর ভাবময়ী লজ্জাময়ী আদর্শের ও চৈতন্যের ঐশ্বর্য। হায়রে মূর্খ পুরুষ স্তনে দাঁত বসিয়ে, চাও তাকে আবার প্রতিষ্ঠা করতে ? কি তোমাকে বলব কিরণ, তুমি হও সম্পর্কে দেওর। তোমাদের জন্য বিশেষণ কিম্বা গালাগালি আজ পর্যন্ত বোধহয় কোন অভিধানে লেখা হয়নি। তুমি আমার সুমুখ থেকে চলে যাও। যাও, যাও বলছি।'

কিরণ নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

উর্মিলার সুমুখে কিরণ, ভিতরে মন্নুর কালো ছায়া—সে যেন লোহিত লাভার মত ফুটতে থাকে। তার ফুটন্ত ফেনা যেন আরও ফেনিয়ে তোলে সেই অপরিচিতার সমস্ত গ্লানি। ও নাকি পাঞ্জাব থেকে হাত বদল হতে হতে কলকাতা এসে ঠেকেছে।

কিরণ নীচে নেমে কামিনী ফুল গাছের গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল। সে কোথায় যাচ্ছে ? কেন যাচ্ছে ? রাগ করে, না ভয় পেয়ে ? সে ওদের কার আশ্রয়ে রেখে চলেছে ? সে যদি এত অধীর হয়ে পড়ে তবে চলবে কি করে ? কিন্তু উর্মিলার সুমুখে ফিরে যাওয়ার মত বুকে বল পাচ্ছে না সে।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু ভাবতে লাগল। এ ভাবে যে কত সময় তার কাটল বলা যায় না। সে দেখল যে উর্মিলার তারই সুমুখ দিয়ে ছেলে দুটির হাত ধরে চিরদুঃখিনীর মত বেরিয়ে যাচ্ছে।

কিরণ আর দাঁড়াতে পারে না। তার অন্তরটা দলিত মথিত হয়ে ওঠে। সে ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ায়। 'কোথায় যাচ্ছ বৌদি রাগ করে ?'

'ক্যাম্প।'

'ক্যাম্পে ! মরতে ?' বাষ্পাকুল কণ্ঠে কিরণ বলে, 'না, না আমি তোমাকে কোথায়ও যেতে দেব না—তোমার মাথার ঠিক নেই। তুমি তোমার ও নীতু খোকনের ভাল মন্দ বুঝতে পারছ না।'

'কিন্তু এখানেও তো থাকা অসম্ভব। আমার যে প্রাণ টেকে না ঠাকুরপো— বলত কি করি? আমার জন্য কি তোমার মমতা নেই?' উর্মিলার অতি চড়া স্বর একেবারে নরম পর্দায় নেমে আসে।

কে বলে এ কথা? কিরণ বিস্মিত হয়ে থাকে। উর্মিলার জন্য সত্যই যদি তার মমতা না থাকবে তবে সে এত ব্যাকুল হচ্ছে কেন? মনের ভাব কি কেউ কেবল মুখে বলে বোঝাতে পারে? যা একান্তই অনুভবের বিষয় তা কি কেবল ব্যক্ত করা চলে? কিরণ একটু ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু সে ক্ষুন্নই বা হচ্ছে কার ওপর? উর্মিলার মানসিক অবস্থা এমন নয় যে তার ওপর এখন কোনও অভিমানও করা চলে। অনেক ভেবে চিন্তে কিরণ বলে, 'আচ্ছা বৌদি তোমরা এই গাছটার তলায় একটু বসো, আমি এক্ষুণি ঘুরে আসছি। সে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার কথা একান্তই অবান্তর - ভিন্ন কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কিনা দেখে আসছি।'

কিরণের চোখেও এতদিন সঠিক কিছু ধরা পড়েনি। নিরীহ নির্বিরোধকে মারাও যেমন ক্লীবত্ব তেমনি ক্লীবত্ব দুষ্টকে শাসন দণ্ড পরিচালন করতে দেওয়া— নিত্য প্রশ্রয় এবং খোসামোদ করে তাকে বাড়িয়ে তোলা। উর্মিলা তেমন কিছু শিক্ষিতা নয়। ব্যথা বেদনা ও আঘাতে তার উপলব্ধি তীক্ষ্ণ হয়েছে। সে যে কোণ থেকে দেখছে, ঠিক তেমনি ভাবে, সেই কোণ থেকে কিরণ কখনও দৃষ্টিপাত করে দেখেনি। আজ উচিত তার চোখ খোলা উর্মিলার প্রসাদে।

শত্রু কিছুতেই ক্ষমার্হ নয়—কিন্তু শত্রু ভেবে নিরীহ কিম্বা মিত্রকে আঘাত করাও বীরত্ব নয়।

পয়সা এবং যত্ন থাকলে কিছুই জগতে অমিল নয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কিরণ দুখানা মেটে ঘর ঠিক করে ফিরে এল। ফিরে এসে উর্মিলা ও নীতু খোকনকে নিয়ে গেল। ঘর দুখানা বেশ পরিষ্কার ছিল। উর্মিলা তাড়াতাড়ি রান্নার চেষ্টা দেখতে লাগল। বেলা তো কম হয় নি। একটি ঝি ঠিক করে রেখেছিল কিরণ, সে সব এগিয়ে জুগিয়ে দিতে এল।

খেতে বস'ল উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল কিরণকে, 'ওরা কি সত্যি সত্যি ভাড়া দিয়েছিল তোমাকে ঐ বড় বাড়ীটা?'

'আমি কি তোমার কাছেও মিথ্যা বলছি বৌদি? ওরা আগ্রহ করেই আমাকে ভাড়া দিয়ে বাস তুলে চলে গেছে ঢাকা।'

'তবে তুমি নিজে ওখানে থাকলেই পারতে। জোর জুলুম যদি না করে

থাক তবে আর দোষ কি? আমি আর কদিন! আমি যেখানেই থাকি না কেন তাতে কার বা কি আসে যায়! বুঝলে কিরণ আমার মতামতের বিশেষ কোন মূল্য দিও না।'

'একি কথা! একি অদ্ভুত উদাসীনতা! একটু পূর্বের সে উর্মিলা কোথায়? কোথায় তার যুক্তির প্রখরতা? হঠাৎ নেতিয়ে পড়ল কিসের জন্য? কিরণের এত আয়োজন তবে কি বৃথা হবে? তাব বুকটা হুহু করে উঠল। সে আর কথা না বলে অর্দ্ধভুক্ত উঠতে যাচ্ছিল।

'ওকি?' তাকে হাত ধরে উর্মিলা বসাল।

কিরণের তখনকার অবস্থা না বলাই ভাল। জীবনে সে কারুর জন্যে কিছু করেনি। এই তার প্রথম প্রয়াস—এক অজ্ঞাত কারণে যেন মাটি হতে বসেছে।

'তুমি বড় না আমি বড়, কিরণ?'

'বয়সে আমিই কদিনের বুঝি বড়।'

'দায়িত্বও তাই তোমার বেশী। সর্বদা চিন্তা করছ আমাদের জন্য।'

'তবু তো সুখী করতে পারছিনে। মানুষে চেষ্টা করে আর সব কিছু করতে পারে না। এ সব তো টাকা পয়সার ব্যাপার নয়।'

'তা ঠিক!' একটু যেন হাসল উর্মিলা।

হাসির সংগে সংগে যেন গলে পড়ছে তার রূপ। ক্রমে ক্রমে সুন্দর হচ্ছে উর্মিলা—যেন নির্বাণোন্মুখ দীপশিখা উজ্জ্বল হচ্ছে!

অধিক রাত্রে হঠাৎ উর্মিলার ঘরে প্রবেশ করল কিরণ।

'কে?'

'আমি।' কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল কিরণ। উর্মিলা লক্ষ্য করল বড় যেন একটা উত্তেজিত ভাব—কিরণ বুঝি বা কাঁপছে।

'কি চাও কিরণ?'

'একটা প্রশ্নের উত্তর চাই।'

'কাল সকালেও তো জানতে পারতে।'

'না বৌদি।'

কিরণের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবার। তবে উত্তেজনা আছে পূর্বের মতই।

'আলোটা বাড়িয়ে দেব?'

'তারও দরকার নেই।' কিরণ উর্মিলার কাছে বসল। 'আচ্ছা সব হিন্দু যদি মুসলমান হয়, অথবা সব মুসলমান যদি হিন্দু হয়, তবে কি দাংগা থামবে?'

উর্মিলার সুদৃঢ় জবাব এল, 'না। রূপ নেবে ভিন্ন ভাবে।'

'যদি এক দেশ অন্য দেশ জয় করে?'

'তবু থামবে না। হিন্দু মুনাফা শিকারী এবং মুসলমান মুনাফা শিকারী জাতি বলে দরদ করে না। তারা নানা ভাবে এ সমস্যা জিয়িয়ে রাখবে। সাময়িক নিবৃত্তি, নিবৃত্তি নয়।'

'তবে উপায়?'

'এর জন্য তো এত আকুল হওয়ার কিছু নেই। কাঠি রয়েছে দুটো—একটা জিওন কাঠি, অপরটা মরণ কাঠি। সামান্য চেষ্টাই তো চেনা যায় আসল যেটা।'

'এ সব হেঁয়ালী রেখে সোজা পথ দেখাও।'

'তা তো সুমুখেই পরে রয়েছে—এইবার চোখ খোল, কিছুটা চিন্তা কর। নিজে না চিনলে পরের সাধ্য কি ব্যাখ্যা করে বোঝায়।'

কিরণ ধীরে ধীরে উঠল। কিন্তু এখনও যেন পরিষ্কার কিছু বুঝে গেল না।

(২৭)

দুটো দিন গত হয়েছে।

কিরণের সে উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। এখন ভাবছে অন্য কথা। কি করে উর্মিলার তৃপ্তি বিধান করা যায়। তাকে করে তোলা যায় আনন্দময়ী। কিরণ অফিসে যায়, বাসায় ফেরে, আর ভাবে একই কথা। নানা অসম্ভব স্বপ্ন ভাসে চোখে। গড়ে বালির ঘর শিশুর মত নদীর ধারে বসে।

উর্মিলা একদিন জিজ্ঞাসা করল, 'সেই মেয়েটির কি খোঁজ নিয়েছিলে কিরণ—সেই পাঞ্জাবী মেয়েটির?'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো একেবারে ভুলে গেছি। আজ এক্ষুণি যাব ভাবছি।'

'আফিসের জামা কাপড় তো খোলোনি—এক্ষুণি একেবারে সংবাদটা নিয়ে এসে বিশ্রাম কর না। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে।'

'কিন্তু তুমি যেয়ে করবে কি বৌদি?—অনেক দূর—আর…'

মেয়েটির সংবাদ যে কিরণ ইতিমধ্যে নেয়নি তা নয়। কিন্তু সে দুঃসংবাদট কিছুতেই ঊর্মিলাকে জানাতে পারেনি। এখন কেবলই থতমত খেতে থাকে। সে কপালের ঘাম মোছে বারকয়েক।

'তুমি অমন করছ কেন, দাঁড়িয়ে বা রইলে কেন? তোমার মনের ভাব বুঝতে পারছিনে—দাঁড়াও আমি সংগে যাব।'

'না, না, তোমার তোড়জোড় করতে করতে হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে—প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে।' কিরণ বেরিয়ে যেতে চায়।

সে ঊর্মিলার ধমক খায়। 'দাঁড়াও বলছি।'

'নীতু খোকন!

'তারা ঝি-দিদির কাছে অনায়াসে থাকতে পারবে।'

'কিন্তু তোমার যাওয়া কি ভাল দেখাবে?'

'কিরণ চতুরতা না করে আসল খবরটা বলতো।'

'আসল খবর, আসল খবর সে ভাল আছে।'

'তবে যে এইমাত্র বললে তুমি খোঁজ নেওনি—এত মিথ্যা প্রচারও তোমরা শিখেছ। একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি।'

কিরণ একেবারে কাঠ হয়ে যায় ঊর্মিলার উগ্র মন্তব্যে।

অবশেষে কিরণ আত্মসমর্পণ করে। 'তুমি যেয়ে কি করবে বৌদি, মেয়েটি পাগল হয়েছে। সে এখন আর ও হাসপাতালে নেই।

'কি বললে, কি? আবার বলতো শুনি।'

'পাঞ্জাবী মেয়েটি নাকি পাগল হয়েছে। সে…'

'এই কথা! শুনে সুখী হলাম কিরণ যে সে তার উপলব্ধি হারিয়েছে। আমিও যদি পাগল হতে পারতাম!'

কিরণ অধোমুখে চুপ করে রইল।

ঊর্মিলা অন্য ঘরে চলে গেল। নিত্যকার মত সে আর তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এল না, বা কিরণকে বলল না একটু বিশ্রাম করে মুখ ধুয়ে আসতে। কিরণ অপরিচিতের মত অবহেলায় পড়ে রইল।

ঠিক পরের দিনের ঘটনা বলছি—

সন্ধ্যার একটু আগে ঊর্মিলা গা ধুয়ে চুল বেঁধে এলো। ছেলেদুটোকে ও

সাজাল সুন্দর করে। কিরণকে বলল, 'জামা কাপড় পর, চলো ওদের নিয়ে একটু বেরিয়ে আসি। সেই কবে একবার কলকাতায় এসেছিলাম।'

'কাথায় যাবে ?'

'সিনেমায়।'

'সত্যি !'

কিরণ বিস্মিত হলেও কিছু প্রকাশ করে বলল না। তার মনে হলো চেষ্টা এবং যত্নে অসম্ভবও সম্ভব হয়—ভাঁটার টানের নদীতেও বোধ হয় ফেরে উজান স্রোত, আসে জোয়ার। সে অত্যন্ত পুলকিত হয়ে অগৌণে উঠে দাঁড়াল। জামা গায় দিতে দিতে ভাবতে লাগল কোথায় ভাল ছবি আছে। শীগগির সে বায়স্কোপ দেখেনি বা ওসবের খোঁজ রাখে না। সে ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনল। 'চল বৌদি, চলো।' নীতু ও খোকন এসে ওদের পাশে বসল। গাড়ী ছেড়ে দিল।

একটা সিনেমা এলো।

'এটায় কি ছবি ?'

'ধর্মমূলক—বইখানা খুব উচ্চাংগের।'

'আমার কিন্তু ভালো লাগবে না।'

'তবে ট্যাক্সি চালাও সুমুখে।'

আবার একটা সিনেমার কাছে গাড়ী থামল।

'একখানা জগৎ বিখ্যাত প্রণয় চিত্র দেখানো হচ্ছে এখানে।'

'ও ছবিতেও আমার মন বসবে না আজ।'

'তবে কি দেখতে চাও—কেমন ছবি ?'

'দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের কাহিনী অবলম্বন করে আজ পর্য্যন্ত কোন ছবি কি তৈরী হয়নি ? এখন তো তারই প্রয়োজন কিরণ—অন্তত আমার কাছে। ওরা যে সবাই শহীদ হয়েছে আদর্শের জন্য।'

'তবে চিত্রায় চলো, বৌদি - দেখবে অগ্নিযুগের ইতিহাস। ফাঁসিকাঠে হেসে উঠছে বিপ্লবীরা।'

'ফাঁসিকাঠ ! চলো, চলো।' ঊর্মিলা অদ্ভুত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

যতক্ষণ কিরণ ও ঊর্মিলা প্রেক্ষাগৃহে পাশাপাশি রইল ততক্ষণ কিরণের বেশ আনন্দে ও উত্তেজনায় সময় কাটল। ঊর্মিলা কিন্তু চুপ করেই রইল। রাত্রির অন্ধকার সে যেন উপভোগ করল প্রেক্ষাগৃহের কৃত্রিম অন্ধকারে বসে।

রাস্তায় বেরিয়ে কিরণ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগল ?'

'ভালো।'

কিরণ দুটি সুগন্ধি ফুলের গুচ্ছ কিনল। কিনে উর্মিলার হাতে দিল। সে একটু ইতস্তত করে তা রাখল বুকের ওপর অতি যত্নে কাত করে।

'রজনীগন্ধা ?'

'হ্যাঁ বৌদি।'

'মানুষ যে আঘাতে প্রেমিক হয়, সেই আঘাতেই আবার শহীদ হয়—কি বৈচিত্রময় মানুষের মন ! ছবিখানা হয়েছে বেশ।'

'শুধু কি বৈচিত্রময় বৌদি ! যেন কুহেলী ও অন্তহীন রহস্যের জালে বোনা মানুষের মন। যা প্রত্যক্ষ সত্য বলে মনে হয় তা-ই হয়ত সত্য নয়—আবার হয়ত মিথ্যাও নয় যা ভাবছি আমরা।'

'কি ভাবছ কিরণ ?' দুটি সরল জিজ্ঞাসু দৃষ্টি এসে পড়ে কিরণের মুখের ওপর। 'কি ভাবছ আমি তো বুঝতে পারছিনে ?'

'এমন কিছু না।'

'ইচ্ছা হলে বলতে পার। আজ আমাকে আর সংকোচ কর না। আজ আমি আকাশের মত উদার, বুনো পাখির মত মুক্ত। বড় ভাল লাগছে সব কিছু। মায়ের মত আমার কাছে সমস্ত সন্তাপ জানাবার অধিকার তো রয়েছে।'

রাত্রির ফুটপাথ জুড়ে হাওয়া এল, দমকা কিন্তু হালকা দক্ষিণা বায়ু। কিরণের মস্তকে একবার নেচে কেঁপে উঠল পথের যত বাতি। একি অদ্ভুত উত্তর !

'মা, মা !' কিরণ অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল। সে যেন নিজেকে সামলাতে পারছিল না। একি মর্মান্তিক ছলনা ? না, না. হয়ত নিগূঢ় বেদনার এ এক নির্মম অভিব্যক্তি—নয়ত স্রেফ পাগলামী !

কার পাগলামী ? কিরণের, না উর্মিলার ? কোন দিশাই করতে পারল না কিরণ। উর্মিলার মুখের দিকে চেয়ে দেখল সে—বেশ নিবিড় ভাবেই দেখল। সেখানে এক অপার্থিব গাম্ভীর্য বিরাজ করছে শুধু। সাগরের তল থেকে যেন কোন বুদ্বুদ উঠছে না। একটু উচ্ছ্বাস, একটু বায়ু বিন্দু যেন নির্গত হল নিতান্ত ওপরের জলস্তর ঠেলে। কী রয়েছে গভীরে, কী রয়েছে নিম্নতম অন্তস্তলে তার পরিমাপ করতে যেন সাহসে কুলায় না এই সংসার অনভিজ্ঞ যুবকের। হয়ত কৃষ্ণ

মেঘ, হয়ত বা বিদ্যুৎ—কিরণ বানের মুখে কুটার মত ভেসে যাবে, নয়ত ঝলসে যাবে অসহ্য তেজে। তাই সে চুপ করে থাকে।

ফুটপাথের পাশেই সারি সারি গাছ—গাছের নীচ দিয়ে পায়-চলা পথ। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে অজস্র।

'চল অন্ধকার দিয়ে একটু হাঁটি।'

নীতু ও খোকনের হাত ধরে এগিয়ে এল কিরণ। নীরবে চলতে লাগল ছায়ার মত।

'বুঝলে কিরণ কেন জানি অন্ধকারই আমার ভাল লাগে আজকাল—অন্ধকার, নীরব, নিরবিচ্ছিন্ন, নিঃসাড়।'

'কেন বৌদি? অন্ধকার ভাল লাগার কারণ কি?' এ অবস্থায় হয়ত অন্ধকার ও নির্জনতাই কাম্য ছিল কিরণেরও—কিন্তু উর্মিলার স্বর তো অন-স্বরা, তাই কিরণ দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে প্রশ্ন করল। 'কেন বলত বৌদি?'

'কি আর বলব তোমাকে কিরণ '

উর্মিলা থামল, কিরণ ব্যাকুল হয়ে রইল। বুকে তার দ্রুত স্পন্দন সুরু হয়েছে হৃদ্‌পিণ্ডের। চারিটি প্রাণী কিছুদূর এগিয়ে চলল, সময় কাটল কিছুক্ষণ।

'না থাক, আজ আর নয়, আর একদিন বলব—দিন তো কতই পড়ে রয়েছে …কিন্তু…' উর্মিলা থামল।

'আচ্ছা, সেই বেশ।' আর বিশেষ পীড়াপীড়ি করে না কিরণ। মনের ঔৎসুক্য মনেই চেপে রাখে। ওরা ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে ফেরে।

পথে নীতু ও খোকন বায়না ধরে খেলনার জন্য। কিরণ ওদের পছন্দ মত খেলনা কিনে দেয় অনেকগুলি। হাতী ঘোড়া সাপ রেলগাড়ী ইত্যাদি। একটা তোয়ালে কিনে সেইগুলো একত্রে বাঁধা হয়। তারপর সেই খেলনার পর্বতটা নিয়ে ভাইতে ভাইতে মন কষাকষি হওয়ার জোগাড—কে বয়ে নিয়ে যাবে বাড়ী। নীতু বলে 'আমি'—খোকন বলে 'না, আমি।' উর্মিলা মিষ্টিমুখে মীমাংসা করে দেয়, 'না, নেবে দুজনে আধাআধি পথ ভাগ করে।'

তৃপ্তিতে হাসে উর্মিলা। এ হাসি সজীবতার লক্ষণ বলে আবারও [illegible] করে কিরণ। তাই বাড়ী এসে হাসে বাকী তিনজন কলরব করে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার স্থির গম্ভীর মূর্তি ধারণ করে উর্মিলা। সকলে খেয়ে দেয়ে একে একে শুয়ে পড়ে। উর্মিলার মন এক পথহারা পক্ষিণীর মত অন্ধকারে সেই জনশূন্য মুসলিম বস্তিতে উড়ে চলে।

একটি মানুষ নেই, একটি প্রাণীও জীবিত নেই—ঘরে বাইরে শুধু নিস্তব্ধ আঁধার। কেবল মূক হাহাকার দেয়ালে দেয়ালে, অর্দ্ধদগ্ধ চালের বাতায়। কোথায় শিশু, কোথায়ই বা প্রসূতি—কলকোলাহল কই পান্থশালায়? ঘর্মাক্ত শ্রমিক কই, স্নেহশীলা জননী কই, কোথায়ইবা গেল অপেক্ষমানা মজুরের প্রিয়া? শুধু অসহ্য নীরবতা, ঘোর আঁধার। শেষ ওক্তের নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়নি কেউ, ওজু করার মানুষ কই? যেন দোজকের আঁধার ঘনিয়েছে চারদিকে। এত আলো যে সহরে, সে সহরের একটা বস্তির এমন করে চেরাগ নেভাল কে? গরীব বস্তির চেরাগ?

একটা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উর্মিলা ডাকল, 'কিরণ! কিরণ!'

অস্ফুট আহ্বান—কিবণ জবাব দিল না।

অন্ধকারে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল উর্মিলা।

মুসলমান মরল, হিন্দু মরল, কোরাণ পুড়ল, গীতা ধ্বংস হল, তবু শত্রু ধরা পড়ল না। বড় ব্যথায় চৈতন্য হারাবার উপক্রম হল, উর্মিলার।

এখনও আদর্শের জন্য দু'দলে দিচ্ছে জান কোরবানী···

অন্তরালে বসে হাসছে যেন কারা!

'কিরণ, কিরণ—এখনও তাদের চিনলে না?' অতি ধীরে, অত্যন্ত গুরু বেদনায় প্রশ্ন করল উর্মিলা।

কিন্তু এবারও কিরণ জবাব দিল না।

* * * *

ভোর বেলা কিরণ ঘুম থেকে উঠে ডাকল, 'বৌদি!'

একটা ক্যাম্প তার চোখের সুমুখে ভেঙে তছনছ হয়েছে। হাজার চেষ্টায়ও সে রক্ষা করতে পারেনি মানুষের সম্মান। রোগে ওষুধ, ক্ষুধায় অন্ন, যা তারা দিয়েছে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তবু যদি সে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র সংসারেরও পুনর্বসতি করাতে পারে! পারে একটি মৃতপ্রায় রজনীগন্ধার ঝাড়কে পুনর্বার পুষ্পময়ী করে তুলতে! শুভ্র সুগন্ধি হাসিতে ভরে যাবে তার ঘর।

কিরণ বিছানা ছেড়ে উঠে উর্মিলার ঘরে গিয়ে চমকে পিছিয়ে এল।

সেই ক্যাম্পে বসে যে শাড়ীখানা উর্মিলা পরেছিল, তাইতে লটকে ঝুলছে।

পুলিশ এল, ময়না তদন্তের জন্য লাস চালান হল।

রিপোর্ট বের হল উর্মিলা ছিল অন্তঃস্বত্বা···

পত্র পাওয়া গেল, এ আর কিছু নয় র‍্যাড্‌ক্লিপ বাটোয়ারার ফল। · সত্য সত্যই উর্মিলা দায়ী করেছে সকল অপরাধীর সংগে ঐ শ্বেত বণিকের দলকে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তখন পর্যন্ত আলো জ্বলেনি ঘরে। মামার দুপাশে দুটি আহারা ভাগ্নে বসে। বিধ্বস্ত বস্তিটার কয়েকখানা অর্দ্ধ দগ্ধ ঘর দেখা যাচ্ছিল দূরে, যেন ভাঙা ক্যাম্পেরই আর একটা সংস্করণ।

কিরণ বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'এ হয় না, এ স্বয়ং বিধাতা কিম্বা খোদাও পারে না—একবার ভেঙে তেমনি করে রিলিফ দিয়ে গড়া যায় না।'

কিন্তু আজ সে মনে মনে ক্ষমাও করতে পারে না, যারা যারা এ পাপের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সভ্যতার শত্রুদের বিরুদ্ধে একটা হুতাশন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে তার অন্তরে। পরদিন সে ইস্তফা দেয় চাকরীতে।

ভাঙছে, শুধু ভাঙছে ··

এ ভাঙন কেবল পূর্ব বাঙলার ভাঙন নয়, ভাঙন সমগ্র পাঞ্জাবের—সূক্ষ্ম হিসেব করলে বোঝা যায় এ ক্রন্দন সমগ্র বিশ্বের। এ ক্রন্দনের জন্য দায়ী কারা, কিরণ আজ তা ধরে ফেলে অনায়াসে।

আর কুসুমপুরের পাগলা বৈদ্য পরাণ ভাবছে—অভিজ্ঞ চিকিৎসক বুঝিবা লক্ষণ দেখেছে নব-জীবনের। একি শুধু ভাঙন? মহাধ্বংসের মাঝখানে বসে, সে আজ স্নেহ মায়া ও সেবা দিয়ে গড়ে তুলছে এক সুমহান ঐক্য। উর্বশীর শ্মশানে বসে সে উচ্চারণ করছে মহা ওজস্বিনী মিলন মন্ত্র। ধীরে গড়ছে আবার এক সভ্যতা—দীন দরিদ্র হিন্দু মুসলমানের সখ্যতা।

আর কিরণের মনেও কেন জানি দুরাশা জন্মেছে: সে যখন সুস্পষ্ট ভাবেই শত্রুদের চিনেছে, তখন এ তুচ্ছ জীবনপাত করেও আঘাত হানবে দুর্বার।

এ তো শুধু ভাঙনের ইতিবৃত্ত নয়—মর্মান্তিক বেদনার! রয়েছে গড়নের চুড়ান্ত অবকাশ। কী রক্তিমাভাস সে দেখতে পাচ্ছে সারা দুনিয়ার এখানে ওখানে? কী ইংগিত দিয়ে গেছে উর্মিলা?

পথ কিরণ আজ চিনেছে ঠিক, এখন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই মোটে। সে গড়বে আবার নতুন সংহতি—চাই সারা ভারতের হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের সমবেত প্রস্তুতি।

দুনিয়া জোড়া প্রলয় কল্লোলের ভিতর যেন দেখা যাচ্ছে সুদৃঢ় গণ জাগরণের বসুমতী।